কিশোর আনন্দ ১৪

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

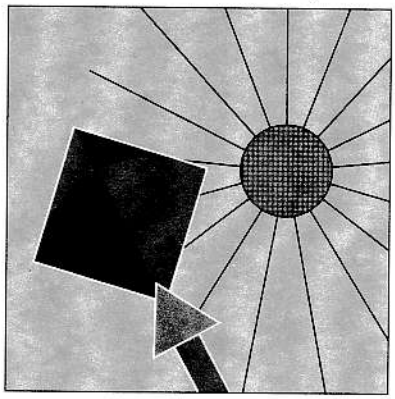

কিশোর আনন্দ ১৪

আলোকিত মানুষ চাই

কিশোর আনন্দ ১৪

সম্পাদনা ॥ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

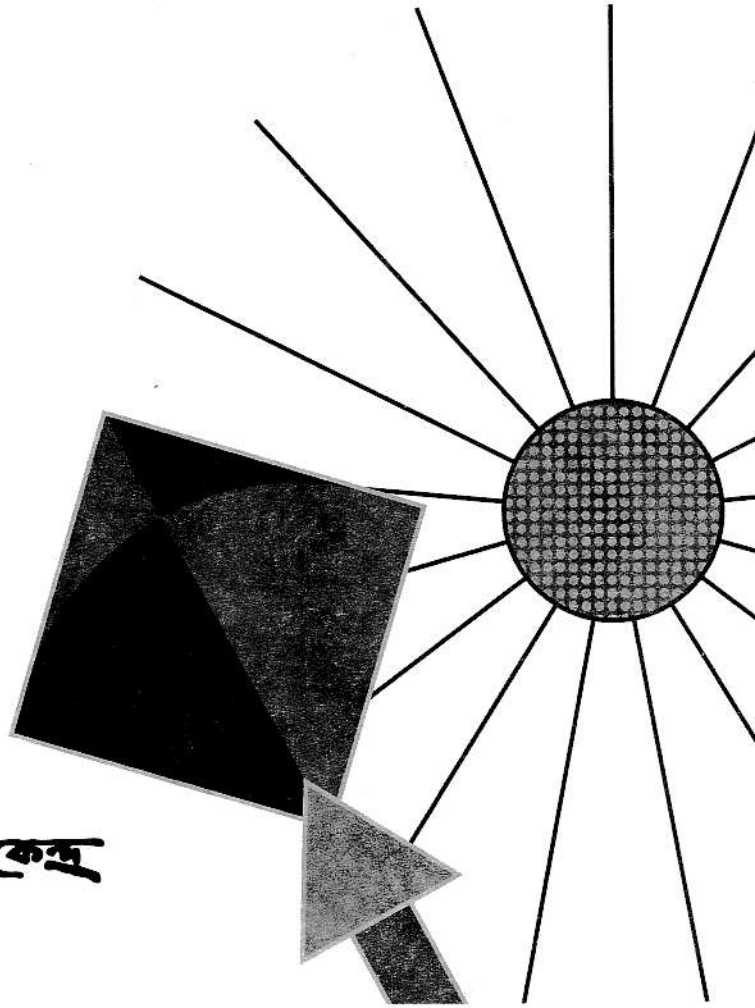

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩১১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আলি

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১৫ জানুয়ারি ২০০৯

পঞ্চম সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

অলঙ্করণ
শেখ আফজান

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0310-X

KISHORE ANONDO [Vol. 14]
Children's magazine. Edited by Abdullah Abu Sayeed
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price Tk. 200.00 only

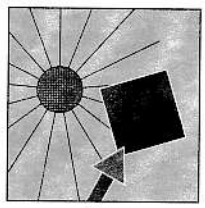

ভূমিকা

তোমরা, আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা, যাতে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য তোমাদের মন ও বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে সারা দেশে ঐ চেষ্টা করে আসছি। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তোমাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি নানারকম আনন্দময় উপন্যাস, মজাদার ভ্রমণকাহিনী, মহৎ মানুষদের জীবনী, রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও আরও নানা ধরনের বই—এমন সব বই যা পড়লে তোমাদের মন অনুভূতিময় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানের উচ্চতর জগতে প্রবেশের জন্য তোমরা উন্মুখ ও যোগ্য হবে।

কিন্তু এসব বই পড়ার পাশাপাশি মানব-সভ্যতার সেই সব বিষয় ও তথ্যও তো তোমাদের জানতে হবে যেগুলো জানলে তোমরা সুঅবহিত আধুনিক বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশ করা হল সে জন্যেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'আসন্ন' নামে আমরা তোমাদের জন্য যে উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকাটি বের করি তার লেখাগুলো নিয়েই এই 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন ছেলে বা মেয়ের যা কিছু জেনে বড় হওয়া উচিত তার অধিকাংশ তথ্যই তোমরা পাবে এই কিশোর আনন্দে। বিশ থেকে পঁচিশ খণ্ডে কিশোর আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। এর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবজগতের অসংখ্য তথ্য তো তোমরা পাবেই সেইসঙ্গে পাবে অনেক অনবদ্য গল্প, কবিতা, কুইজ, চুটকি, স্মরণীয় বাণী, এমনি আরও অনেক রমণীয় ও উপভোগ্য লেখা।

আমরা আশা করি যারা এই বইয়ের সবগুলো সংখ্যা মন দিয়ে পড়বে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা একটা মোটামুটি ধারণা পাবে।

এ বইয়ের সব লেখাই অত্যন্ত সুলিখিত ও উপভোগ্য। তোমাদের জন্য ভালো ভালো লেখকদের যেসব অনন্য লেখা তাঁদের বই ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে ঐ সব বই ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাগুলো পড়ে তোমরা আনন্দ পেলে আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কেবল কিশোর-তরুণরা নয়, আমাদের ধারণা সব বয়সের সবরকম মানুষই 'কিশোর আনন্দ' একইভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কিশোর আনন্দ ১৪

সূ চি প ত্র

কবিতা / ছড়া

জাফর ও বান্দা ॥ কবিশেখর কালিদাস রায় ৯
শখ শুধু ভোজনে ॥ আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন ২৯
সবল দুর্বল ॥ শেখ হবিবর রহমান ৪৩
সবার আমি ছাত্র ॥ সুনির্মল বসু ৮৭
ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৮
চোপড়ের কথা ॥ ফররুখ আহমদ ১৩৫

গল্প

সুভা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১
মোহসিন ভাই ॥ মুহম্মদ জাফর ইকবাল ২৩
নিমকহারাম ॥ মিরজা আবদুল হাই ৫০
ভিয়েতনামের রূপকথা : সোনার পাহাড় ৭২
ব্যক্তিত্ব কাকে বলে! ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ৯২
সাহেব ডাকাত দেশী ডাকাত ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১১২
মৃত্যুচক্র ॥ মার্ক টোয়েন ১১৭
অশ্বশাবক ॥ মিখাইল শলোখভ ১৪১

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ

শরীর এক রহস্যময় দুর্গ ॥ ডা. শুভাগত চৌধুরী ৭৯

প্রবন্ধ

আমাদের লোকশিল্প ॥ কামরুল হাসান ১৭
গোয়েন্দা কীভাবে অপরাধী ধরে ৩০
ছবিতে প্রতিবাদ ॥ রফিকুন নবী ৫৪
পশুরাও পশু পোষে ৫৮
অনেকদিন আগে ॥ আলী ইমাম ৬৩
স্বপ্নের স্কুল : নিজের কাজ নিজে ॥ শঙ্খ ঘোষ ৮৯
লা জিওকোন্ডো ॥ খায়রুল আলম সবুজ ১১০
শেষ পেশোয়ার অন্তিম ১২৯
আকবর বাদশার খাওয়া ॥ কুমারেশ ঘোষ ১৩৭
স্বপ্নরাজ্য ১৪৯

জীবনী

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন : দক্ষ হাতে যিনি সামলেছেন বিজ্ঞান ও রাজনীতি ৩৭
বেগম রোকেয়া ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ৯৬

বিলিভ ইট অর নট

দুঃসাহসী জেল পলাতক ১৩৩

অভিযান / ভ্রমণ

নীলনদের উৎসের খোঁজে স্পেক ৯৯

খেলাধুলা

টেবিল টেনিস ৪৪

বিবিধ

যোদ্ধা পণ্ডিত ১০
বনরুই ২১
অমর গ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি' ২২
অল্পকথার কাহিনী ৪০
কাঠবেড়ালি ৪১
সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকায় ৪২
এডিসনের এক্সপেরিমেন্ট ॥ মোহাম্মদ জহিরুল হক ৪৮
সবচেয়ে বড় অভিধান ৪৯
পাখির দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর কেন? ৭৮
আমলকী ৮৬
অক্টোপাস কাঁকড়া খেতে ভালোবাসে ১০২
বিদ্যাসাগরের হাসিঠাট্টা ১০৩
ইউনিফর্ম ১০৯
জিরাফের ঘুমোনোর রেকর্ড মাত্র বারো মিনিট ১১৬
সাগরের পানির রঙ কী? ১২৭
ভিতু বীর সমাচার ১৪০

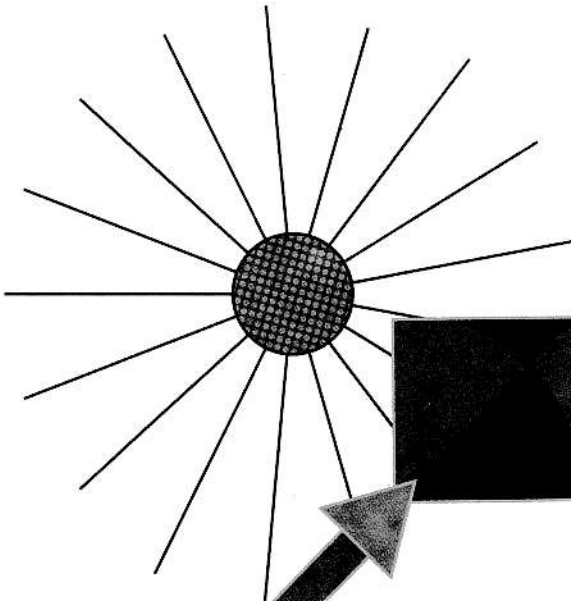

কবিশেখর কালিদাস রায়

জাফর ও বান্দা

দাতার প্রধান জাফর সদাই দান করে দীনজনে,
তাহার সমান দাতা নেই আর এ-ধারণা তার মনে।
একদা সহসা বুস্তানে তার সান্ধ্য-ভ্রমণ-কালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে আছে আলবালে।
দিবস-শেষের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
দিল একে একে কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর—"ওরে ও নফর, সারাদিন উপবাসী,
দিবস-শেষের খানা তোর, তাও কুকুরেই দিলি হাসি?"
চমকি বান্দা জোড়-হাতে কয়,—"মরদ হয়েছি ভবে,
আজিকে নসিবে না হয় রসদ, কালি পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে, ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা!"
কহিল জাফর আঁখি-ছলছল,—"আমি আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দেমাক করিলি চূর্ণ, ছিঁড়ে দিলি মোহপাশ।
পীরের কল্‌মা মোরে দিলি তুই, দে'রে কোল, বুকে আয়,
তুই দানাদার, দরাজদস্ত এই দীন-দুনিয়ায়।
দৌলতখানা খুলে দেছে যেবা, দাতা কই বটে তারে,—
সেই ত্যাগীবীর, বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
ওরে ক্রীতদাস, দিলাম খালাস,—গোলামির অবসান,
এই বাগিচার মালিক হইয়া দীল খুলে কর্ দান।"

যোদ্ধা পণ্ডিত

ফ্রান্সের রাজা শার্লেমেনের কিছু গোপন রহস্য ছিল। তিনি লিখতে পারতেন না। তবে লেখা শেখার খুব চেষ্টা করতেন। নিয়মিত যাতে লেখার অভ্যেস করতে পারেন সেজন্য প্রতি রাতেই শিয়রের কাছে কলম ও কাগজ রাখতেন। প্রতিবারই যুদ্ধে যাবার সময় তিনি কলম ও কাগজ সাথে নিতে ভুলতেন না কিন্তু লিখতে তিনি কখনোই পারেননি।

শার্লেমেনের বাবা পেপিন ছিলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা। আজ যাকে আমরা ফরাসি বা ফ্রান্স বলে জানি ফ্রাঙ্করা সেই দেশের মানুষ। শার্লেমেন বাবার প্রাসাদেই বড় হয়েছেন। রাজা পেপিনের জীবনের প্রধান কাজই ছিল আরবদের অগ্রযাত্রা রোধ করা। আরবরা তখন প্রায় ইউরোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঠেকাতে না পারলে হয়তো তারা গোটা ইউরোপের কর্তৃত্ব করবে। সে কারণেই শার্লেমেনের শৈশব যুদ্ধবিদ্যা শিখতে-শিখতেই কেটেছে। লেখাপড়ার কোনো সময়ই পাননি।

বাবার সাথে একত্রিত হয়ে শার্লেমেন আরবদের ঠেকিয়েছে এবং ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজে ফ্রাঙ্কদের রাজা হলেন। শার্লেমেন ছিলেন সুঠামদেহী লম্বা চওড়া অত্যন্ত সুদর্শন এক শক্তিমান পুরুষ। তার শত্রুরাই তার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত।

শার্লেমেন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। আরবদের অনুপ্রবেশ থেকে তিনি খ্রিস্টীয় ইউরোপকে রক্ষা করেছেন। ৮০০ সালে শার্লেমেনই খ্রিস্টান ইউরোপের ধর্মীয় সম্রাটে পরিণত হন। তিনি বিচক্ষণ এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। শিল্পী-সাহিত্যিক কবিদের সাহচর্য তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের কথা তিনি মন দিয়ে শুনতেন। তার রাজদরবার ছিল আশেন। 'আশেন'-এর বর্তমান নাম জার্মানি। আশেন তখন জ্ঞানী পণ্ডিতদের শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থল। শার্লেমেন তার রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেছিলেন যাতে করে শিশুকিশোররা হিশাব শিখতে পারে, লিখতে ও পড়তে পারে। আসলে তার জীবনে যেটা সম্ভব হয়নি সেটাই তিনি অন্যের মাঝে দেখতে চেয়েছিলেন। আজকের পৃথিবীতে জার্মানদের অবস্থানের জন্য শার্লেমেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভা

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে। তাহার দুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমতো অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপ তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ-কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলে। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন; কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন—কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে

নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন; কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় পড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতার অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু, কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্‌বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর—অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মানুষের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়া-ঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে, যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমতি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং

একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতা পরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী-একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল; কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপরে বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরের যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যক তেমনি গ্রামে দুই-চারিটি অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজে-কর্মে আমাদের অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ—ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, 'তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।'

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রুপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে—কে বসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না? তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া

তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমাপ্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া যৌবনের রহস্যে পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থমথম করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারাগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, এক-ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছভাত খায়... এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'চলো, কলিকাতায় চলো।'

বিদেশযাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা-বশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক জন্তুর মতো তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী-একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, 'কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস আমাদের ভুলিস নে।'

বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না।

বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপটপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে পুষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ।'

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে; পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধুসঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মা-বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর

তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন্দ নহে।'

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন ইহার হৃদয় আছে, এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, 'যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে।' শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ-মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারদিকে চায়—ভাষা পায় না—যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

কামরুল হাসান

আমাদের লোকশিল্প

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে-জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হল এখানকার কুটিরশিল্প। একসময়ে ঘর-গৃহস্থালির নিত্যব্যবহারের প্রায় সব পণ্যদ্রব্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হত। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ-ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

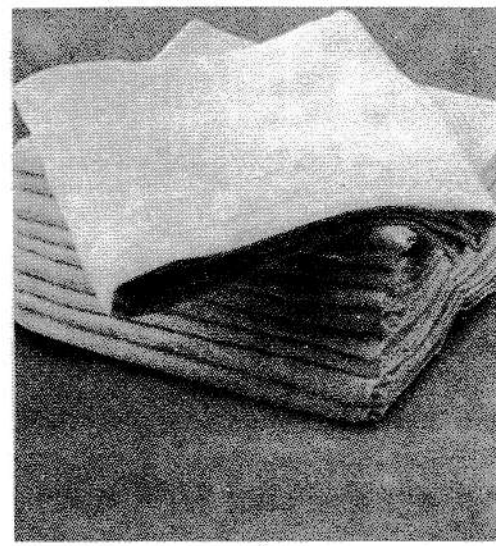

মসলিন

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো একসময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এককালে দুনিয়াজুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সুক্ষ্ম সূতা দিয়ে বোনা হত যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েকশো গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। শুধু কারিগরি দক্ষতায় নয়, এ-ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পীমন থাকাও প্রয়োজন।

আজ সেই মসলিন নেই। তবে মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

এমনি আর-একটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এটি হল নকশি-কাঁথা। একসময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশি-কাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। এক-একটি সাধারণ আকারের নকশি-কাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছ মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশি-কাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচিত্র নকশা-তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পাড়াপড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক-একটি কাঁথা সেলাই কত গল্প, কত হাসি, কত কান্নার মধ্য দিয়ে শেষ হত তা বলা যায় না।

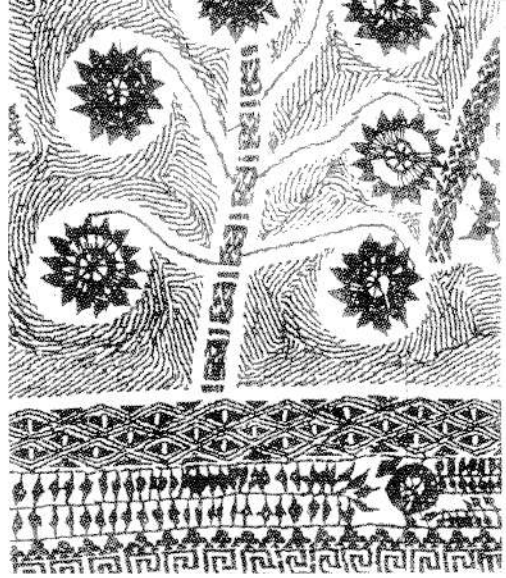

নকশিকাঁথা

শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রঙ-বেরঙের নকশার জন্যই নকশি-কাঁথা বলা হয় না, বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাঁথা। আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে; তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, শাহজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ-এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু।

ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্তচালিত তাঁতে এসব সুতায় যে-কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশী কাপড় বর্জন করে দেশী কাপড় ব্যবহারের যে-আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রঙ ও বুননকৌশল—সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আরও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো

মাটির পুতুল

পালিশ করা হয়। এ-ধরনের বাসনে নানারকম ফুল-পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা ও পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহার হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এ-দেশে বহুযুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু-সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারাবছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সবকিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায়, তা এ-দেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

প্রতীকধর্মী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরি বিদ্যা এবং শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায় তা অভাবনীয়। কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ আজকাল দেখা না-গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ-দেশে একসময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট-পালঙ্ক, খুঁটি-দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ-ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের নৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব-পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে-ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচিত্র নকশা, রঙ এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে-নিদর্শন চোখে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যারা এগুলো তৈরি করেন তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্তর ঝুলিয়ে রাখার জন্য তৈরি এ-কথা সকলেই জানে। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে, যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া শোলা-শিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে। কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশে ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশী পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু চোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়-মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশীদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে-দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে-তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

হাস্যকৌতুক

দুই বন্ধু গ্রামে বেড়াতে এসে গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখল, আমগাছে পাকা পাকা আম ঝুলে আছে।

১ম বন্ধু : চল্ আমরাও আমের মতো ঐ গাছে ঝুলে থাকি।

২য় বন্ধু : ঠিক আছে, চল্।

দুই বন্ধু আমগাছে উঠে ঝুলে থাকল।

হঠাৎ পোকার কামড় খেয়ে ১ম বন্ধু নিচে পড়ে গেল।

২য় বন্ধু : বন্ধু তুমি পড়ে গেলে?

১ম বন্ধু : আমি যে পেকে গেছি।

বনরুই

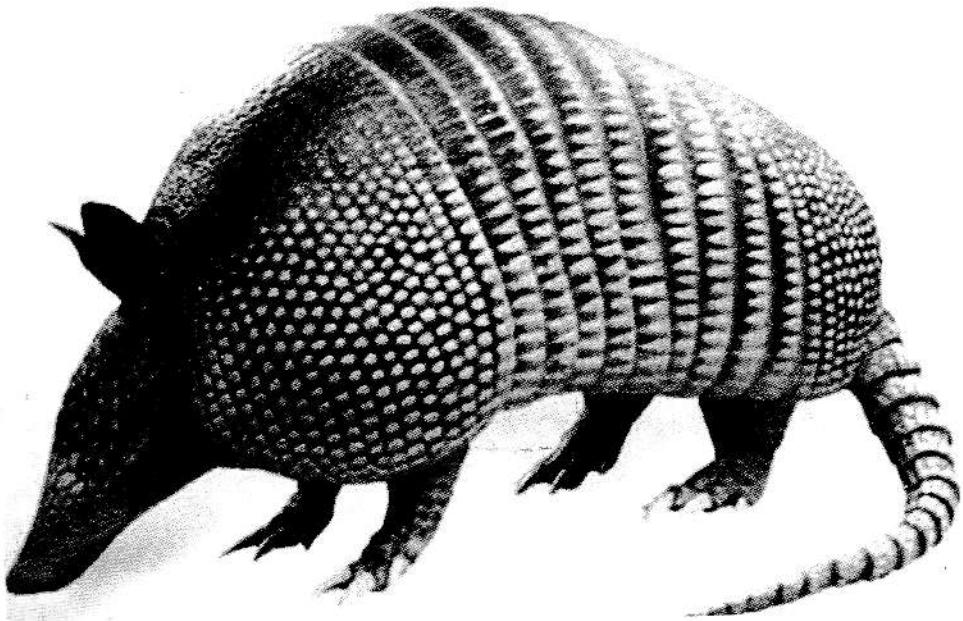

বনরুই নামটা শুনেই কেমন আজগুবি মনে হচ্ছে, তাই না? বনে আবার রুই এল কী করে? আসলে তা নয়। এ প্রাণীর কিছু অংশ দেখতে রুইমাছের মতো বলেই হয়তো এর নাম বনরুই। রাস্তার পাশে যারা কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করে তাদের কাছে এর খোলস রয়েছে।

বনরুই আদতে একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারার অন্যতম প্রাণী হচ্ছে বনরুই।

মাঝারি আকৃতির এই জীবটি দৈর্ঘ্যে এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পা বেশ খাটো। লেজ লম্বা। গায়ের আবরণটা রুই-কাতলের আঁশের মতো। কিন্তু গঠনপ্রণালীতে দুটো আঁশ সম্পূর্ণ আলাদা। আঁশের ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ লোম থাকে। প্রায় গোটা শরীরটাই শক্ত আঁশে টালির ছাদের মতো বিন্যস্ত থাকে। এরা অত্যন্ত লাজুক ও স্পর্শকাতর প্রাণী। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এ আঁশগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের লেজ লম্বা। লেজ দিয়ে কোনোকিছুকে আঁকড়ে ধরতে পারে। শত্রুর উপস্থিতি টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে বনরুই মাথাটা পেটের মধ্যে নিয়ে তার উপর দিয়ে লেজটিকে টেনে পিঠের উপর শক্ত করে সেঁটে নিয়ে একটি চমৎকার কুণ্ডলী তৈরি করবে। এ কুণ্ডলী দিয়ে বল খেললেও এর প্যাঁচ ছাড়ানো যাবে না। এভাবেই এরা শত্রুর মোকাবেলা করে।

এদের সবচেয়ে দীর্ঘ অঙ্গ হল জিভ। মুখ থেকে ৪০ সে.মি. দূরের পিঁপড়া ধরে খেতে পারে। এরা কালো পিঁপড়া, গাছে বাসা-বাঁধা লাল পিঁপড়ার ডিম ও বাচ্চা এবং উইপোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। বনরুই এদের স্থানীয় নাম। পিঁপড়া খায় বলে এদের 'অ্যান্ট ইটার'ও বলা হয়। এরা দিনের বেলা

গর্তে লুকিয়ে থাকে বলে আমাদের সাথে দেখা হয় কম। পায়ের তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে চমৎকারভাবে নিজেদের থাকার গর্ত তৈরি করে নেয়।

এরা সাধারণত ১০/১২ বছর পর্যন্ত বাঁচে। ওজনে সর্বোচ্চ ২/৩ কেজি হতে পারে।

এদের দাঁত নেই। নিচের চোয়াল একেবারে পাতলা। ফালির মতো। আঠালো জিহ্বা দিয়ে শিকার ধরে খায়। প্রয়োজনে বিশেষ পেশির সাহায্যে এরা নাক ও কানের ছিদ্র বন্ধ করে রাখতে পারে। মানুষের বর্বরতার কারণে বর্তমানে এরা বিরল প্রজাতির তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

ইংরেজি নাম Pangolin
বৈজ্ঞানিক নাম *Chaeto Phractus*

অমর গ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি'

গ্রন্থের নামকরণ করে থাকেন লেখকেরাই। কিন্তু পৃথিবীর বিখ্যাততম গ্রন্থগুলির একটির লেখকের দেওয়া নাম পাঠকেরা পালটিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির মূল নাম ছিল 'কমেডি'। দান্তের দেওয়া এই নামেই গ্রন্থটি প্রথম দুশো বছর চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাকবি দান্তের মৃত্যুর দুশো বছর পরে দেখা গেল কমেডির আগে ডিভাইন শব্দটি বসে গেছে। এ নাম দান্তের দেওয়া নয়। তাঁর প্রতি স্বর্গীয় শ্রদ্ধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নামে তাঁর পাঠকেরা কমেডিকে অভিষিক্ত করেছেন। সেই থেকে এই অমর গ্রন্থ পৃথিবীতে 'ডিভাইন কমেডি' নামেই পরিচিত।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মোহসিন ভাই

আসলে একজনের জীবনের মজার ঘটনা অন্যজনের কাছে মজার নাও লাগতে পারে। সত্যিকারের মজার ঘটনায় কাউকে-না-কাউকে বোকা বানাতে হয়, লজ্জা পেতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়, সেটা কি মজার বলে মনে হবে সবার কাছে? কিন্তু তোমরা যেহেতু জিজ্ঞেস করেছ, চেষ্টা করে দেখি।

আমরা যখন আমেরিকা থাকতাম তখন সব বন্ধুবান্ধব মিলে গাড়ি ভাড়া করে একবার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা সবাই ছাত্র, পয়সাকড়ি বলতে গেলে কিছুই নেই। কাজেই বাজেট খুবই সীমিত, কিন্তু তাই বলে মজা কম হয়নি। আমাদের সাথে যারা গিয়েছে সবাই আমাদের সমবয়সী, একজন ছাড়া—তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কীভাবে কীভাবে গ্রিনকার্ড ম্যানেজ করে এই দেশে চলে এসেছেন। ভদ্রলোক একটু বয়স্ক—আমরা তাকে মোহসিন ভাই বলে ডাকি (আসল নামটা ইচ্ছে করে দিচ্ছি না—হঠাৎ করে তার চোখে এই বইটা পড়লে আমার ওপর রাগ হতে পারেন সেজন্যে!)

আমাদের তখন যে বয়স তখন সবকিছু ভালো লাগে—কোনো ঝামেলা হলেও আনন্দে দাঁত বের করে হেসে বলি : 'কী মজা হচ্ছে, তাই না?' মোহসিন ভাইয়ের অভ্যাস ঠিক উল্টো, তিনি সবকিছুতে বিরক্ত হন। ব্যাপারটা আরো একটু জটিল, কারণ তিনি আবার একটু সাম্প্রদায়িক টাইপের।

আমাদের সাথে পশ্চিমবাংলার বন্ধুবান্ধবরাও গিয়েছে, অকারণেই একটু পরে পরে তিনি তাদের ওপরেও খেপে ওঠেন!

আমাদের ইয়েলোস্টোন ভ্রমণে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে মোহসিন ভাই আমাদের নার্ভে উঠে গেলেন। আমরা আর উপায় না-দেখে একটা গোপন মিটিং ডেকেছি। মিটিংয়ের এজেন্ডা, কীভাবে মোহসিন ভাইকে একটু টাইট করা যায়। এ ধরনের কাজে আমার 'অভিজ্ঞতা' এবং 'সৃজনশীলতা' অন্য সবার থেকে বেশি, কাজেই আমি বললাম : 'ভয় দেখাতে হবে।'

'কিসের ভয়?'

'ভালুকের'।

আনন্দে সবার চোখ গোলআলুর মতো হয়ে উঠল। ইয়েলোস্টোন গ্রিজলি ভালুকের জন্য বিখ্যাত। এখানে এসে যদি কাউকে ভালুকের ভয় না দেখিয়ে ফিরে যাই তাহলে আনন্দের অর্ধেকটাই মাটি। সাথে সাথে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হল। একজনকে ভয় দেখাতে হলে তাকে হঠাৎ করে সেটি করে ফেলতে হয় না, ধাপে ধাপে নাটকের মতো করে চূড়ান্ত মুহূর্তে নিয়ে যেতে হয়। কাজেই সন্ধেবেলা থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল। সবার জন্যে ঢালাও খিচুড়ি রান্না করা হয়েছে। খিচুড়ি খাবার পর অম্লান নামে একজনকে দায়িত্ব দেয়া হল খিচুড়ির ডেকচি পরিষ্কার করে আনার জন্য। সে কিছুক্ষণের মাঝেই ডেকচি পরিষ্কার করে ফিরে এসেছে। আমি মোহসিন ভাইকে শুনিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'ঠিক করে পরিষ্কার করেছ তো?'

অম্লান জোরে জোরে মাথা নাড়ল : 'একেবারে ঠিকঠাক'।

'আধখাওয়া খিচুড়ি-মিচুড়ি ফেলেছ কোথায়?'

অম্লান অম্লানবদনে বলল : 'এই তো জঙ্গলের মাঝে।'

আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে যে, সে এই উত্তরটা দেবে। আমি আঁতকে ওঠার ভান করে বললাম : 'সর্বনাশ! করেছ কী?'

অম্লান বলল : 'কেন? কী হয়েছে?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম : 'তুমি দ্যাখো নাই, একটু পরে পরে নোটিশ দিয়ে রেখেছে যেখানে-সেখানে খাবার ফেলবে না? এটা ভালুকের এলাকা। খাবারের গন্ধে ভালুক চলে আসবে।'

অম্লান চোখ বড় বড় করে বলল : 'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। এটা তুমি কী করলে? এখন যদি রাতে ভালুক আসে?'

অম্লান হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা : 'আসবে না।'

মোহসিন ভাই সবচেয়ে বিরক্ত হলেন, বললেন : 'তোমার সাথে টেলিফোনে বলেছে যে, আসবে না?'

অম্লান অম্লানবদনে গালিটা হজম করল। মোহসিন ভাই আমাকে বললেন : 'দেখেছ এই বোকা ছেলের কারবার? এদের মাথায় কোনো বুদ্ধি নাই।'

আমি বললাম : 'বুদ্ধি না থাকলে ফিজিক্সে পিএইচডি করছে কেমন করে?'

'সেটা হয়তো করছে। কিন্তু আসল বুদ্ধি নেই। এজন্য পশ্চিমবাংলায় ওদের বলে ঘটি। ওদেরকে সাথে নিয়ে আসাই উচিত না।'

আমি কিছু বললাম না, অন্য সবার দিকে চোখ টিপে দিলাম। নাটকের প্রথম অংশ ভালোভাবে শেষ হয়েছে। রাত্রিবেলা সবাই তাঁবুর ভেতরে শুয়েছি, তখন দ্বিতীয় অংশ শুরু হল। আমাদের তাঁবুতে আমি, মোহসিন ভাই এবং অম্লান—তিন ব্যাচেলর। অম্লান এবং মোহসিন ভাই খাঁটি ব্যাচেলর, আমি সাময়িক, আমার স্ত্রী গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গিয়েছে।

অন্যেরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ছোট ছোট তাঁবুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমিয়েছে। সব তাঁবুর ভেতরে বাতি নিভে গেছে, সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে গুটিশুটি মেরে ঢুকে গেছে।

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে রাত নেমে এসেছে। চারিদিকে অন্ধকার, সুনসান নীরবতা। গাছের পাতায় শিরশির বাতাসের শব্দ। অন্য যে-কোনো দিন হলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ত—আজকে কারো চোখে ঘুম নেই। সবাই মজা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের তাঁবুতে আমরাও স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে গেছি। মোহসিন ভাই জগৎ-সংসারের সবার ওপর বিরক্তি প্রকাশ শেষ করে সবাইকে একচোট গালাগাল করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিয়েছেন। আমি তখন হঠাৎ উঠে বসলাম। মোহসিন ভাই বললেন : 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম : 'পিশাব করতে হবে।'

'এখন?'

আমি বললাম : 'এখন ধরলে আমি কী করব?'

আমি স্লিপিং ব্যাগ থেকে তাঁবুর জিপ খুলে তাঁবু থেকে বের হলাম। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু নাটকে যার জন্যে যে-দৃশ্য দেয়া হয়েছে সেইটা তো তাকে শেষ করতে হবে। আমি হেঁটে হেঁটে খানিকটা দূরে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর ছুটতে ছুটতে এসে কোনোমতে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁবুর জিপার লাগানোর চেষ্টা করতে থাকি। মোহসিন ভাই লাফ দিয়ে উঠে বললেন : 'কী হয়েছে?'

আমি ভয়ে কথা বলতে পারি না। কোনোমতে বললাম : 'কিছু না।'

'কিছু না মানে?'

'মনে হয় কিছু না।'

'সেটার মানে কী?'

আমি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি : 'মানে আমি জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে মাত্র ইয়ে করার চেষ্টা করছি। তখন হঠাৎ—'

মোহসিন ভাই ততক্ষণে উঠে বসেছেন, শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন : 'হঠাৎ কী?'

'মনে হল কালো মতন কী যেন দাঁড়িয়ে আছে।'

'কালো মতন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?'

'ঐতো জঙ্গলের কাছে।'

'যেখানে অম্লান খিচুড়ি ফেলেছে?'

'মনে হয়—'

মোহসিন ভাই অন্ধকারে অম্লানের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা বিজলি ঝাড়লেন : 'এইজন্য বোকা মানুষদের নিয়ে কোথাও যেতে হয় না। এখন যদি কিছু হয়?'

আমি বললাম, 'কিছু হবে না। চিন্তা করবেন না। আমার চোখের ভুলও তো হতে পারে।'

মোহসিন ভাই গজগজ করতে করতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকলেন এবং ঠিক দশ মিনিট পরে আমি পাশের তাঁবুর জিপ খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। সেটাতে মাহবুব থাকে, আমাদের দুষ্টু-শিরোমণি এবং এই ধরনের ঘটনায় তার ভূমিকা সবসময়েই অনবদ্য। সবেমাত্র বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিবাহিত মানুষসুলভ গাম্ভীর্য এখনো শুরু হয়নি। শুরু হবে সেরকম কোনো নিশানাও নেই।

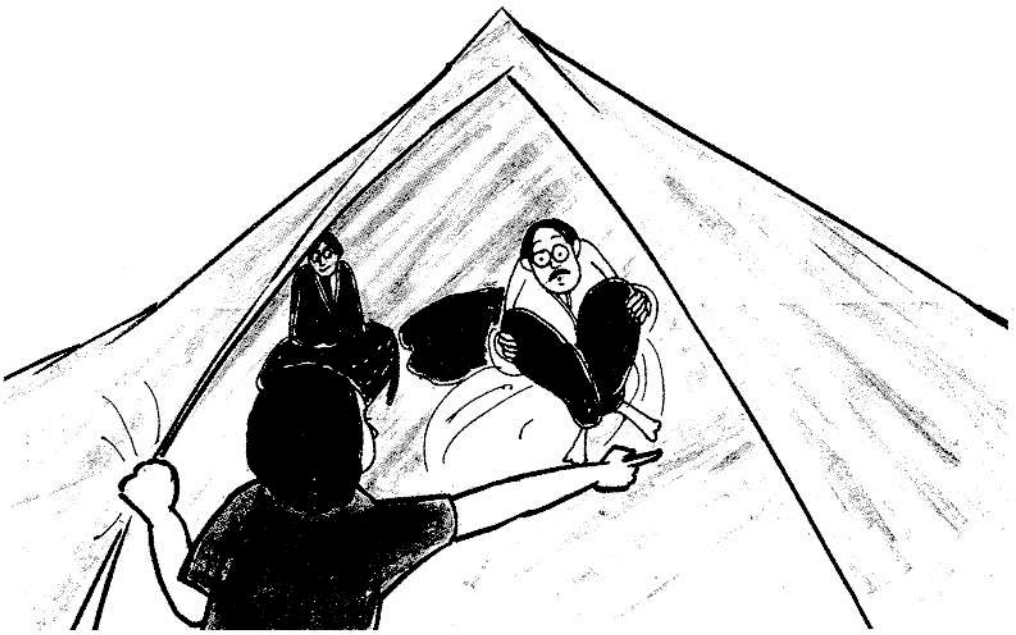

আমার ছুটে আসার ব্যাপারটি একটা কিউ এবং এই কিউয়ের ঠিক দশ মিনিট পর, নাটকের বাকি অংশটুকু সমাপ্ত করার দায়িত্ব মাহবুবের। আমি কান খাড়া করে রেখেছিলাম বলে তাঁবুর জিপ খোলার শব্দ শুনেছি। মোহসিন ভাই কিছু শোনেননি। আমি কান পেতে এবারে শুনতে পেলাম, মাহবুব নিঃশব্দে তাঁবু থেকে বের হয়েছে। একটু পরে অবশ্য সবাই তার পদশব্দ শুনতে পেল। সে অনেক দূর থেকে মাটিতে দুম দুম করে পা ফেলে হেঁটে আসছে। কোনো মানুষের পায়ের শব্দ এরকম হবার কথা নয়, মোহসিন ভাই তাই লাফিয়ে উঠে বসলেন।

আমি বললাম : 'কী হয়েছে?'

'শব্দ শুনছ না?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম : 'কিসের শব্দ?'

'পায়ের শব্দ। মনে হয় হরিণ।'

এই এলাকায় বড় বড় হরিণ থাকে, মোহসিন ভাই আশা করছেন পায়ের শব্দ সেই হরিণের। কিন্তু আমরা হরিণকে দিয়ে ভয় দেখানোর পরিকল্পনা করিনি, আরো বড় জিনিসের পরিকল্পনা করেছি। কিছুক্ষণের মাঝে পদশব্দ খুব কাছে চলে এল, আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম পাশের গাছে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে। তার ভয়াবহ শব্দে মোহসিন ভাই চমকে উঠে ফিসফিস করে বললেন : 'বিয়ার! গ্রিজলি বিয়ার!'

ভালুকের সবচেয়ে বড় প্রজাতি সম্ভবত গ্রিজলি ভালুক। তাঁবুর কাছে এসে গ্রিজলি ভালুক যদি গাছে খামচাখামচি করে তাহলে ভয় পাওয়ারই কথা। মোহসিন ভাই ভালোই ভয় পেলেন—তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না। কিন্তু নাটকের তখন আরও কিছু বাকি রয়েছে, হঠাৎ করে গ্রিজলি বিয়ার আমাদের তাঁবুটা বেছে নিয়ে সেটাতে আঁচড় কাটতে শুরু করল, তাঁবুর ভেতরে ভয়াবহ শব্দ। মোহসিন ভাই আতঙ্কে প্রায় হার্টফেল করে ফেলেন সেরকম অবস্থা। হাসির চোটে আমাদের বারোটা বেজে যাচ্ছে এবং আমি অনেক কষ্টে হাসি আটকে রাখলেও অম্লান দাঁত বের করে হাসতে শুরু করেছে।

তখন একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মোহসিন ভাই ভয়ে কী করবেন বুঝতে না-পেরে সিগারেট-লাইটারটা জ্বালিয়ে দিলেন এবং সেখানে স্পষ্ট দেখা গেল অম্লান দাঁত বের করে হাসছে!

কিন্তু ঠিক কী কারণে জানি না, মোহসিন ভাই অম্লানের হাসিটা ঠিক খেয়াল করলেন না। গ্রিজলি বিয়ার তখন তাঁবুটাকে ধরে দোলাতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে সেটা ছিঁড়েখুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যাবে। মোহসিন ভাই আবার সিগারেট-লাইটার নিভিয়ে ভয়ে কাতর হয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন : 'তো তোমরা ভ-ভয় পেয়ো না। আ-আমি আছি।'

তিনি থেকে কী করবেন সেটা বোঝা না-গেলেও আমাদের অভয় দেয়ার ব্যাপারটি দেখে আমার নিজেকে একটু অপরাধী মনে হল—আমরাই তাকে ভয় দেখাচ্ছি আর উল্টো তিনিই আমাদের সাহস দিচ্ছেন! যাই হোক, গ্রিজলি ভালুক আরো খানিকক্ষণ আমাদের তাঁবুটি ঝাকাঝাকি করে পা দাপিয়ে চলে গেল। অন্যান্য তাঁবু থেকেও হৈচৈ হচ্ছে—কী হচ্ছে সবাই জানতে চাচ্ছে। অত্যন্ত কাঁচা অভিনয় কিন্তু মোহসিন ভাই ধরতে পারলেন না। তিনি ভয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন : 'সাবধান, বিয়ার এট লার্জ!' অর্থাৎ 'সাবধান, ভালুক বের হয়েছে।'

যাই হোক, উত্তেজনা একটু কমল এবং অনেক হৈচৈ করে শেষপর্যন্ত একসময়ে আমরা ঘুমিয়ে গেলাম।

মোহসিন ভাই ঘুমাতে পারলেন কিনা জানি না, কারণ সকালে তাকে দেখে চেনা যায় না। চোখ গর্তের ভেতরে ঢুকে গেছে, মাথার চুল উস্কখুস্ক, বয়স মনে হয় দশ বছর বেড়ে গেছে। আমাকে ডেকে ফিসফিস করে বলল : 'বুঝলে, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। গতরাতে যা ভয় পেয়েছি সেটি আর বলার মতো না। সেভেন্টি ওয়ানে আমার এক ফুপা ছিল রাজাকার। একদিন ফুপার সাথে বসে আছি তখন দুইজন মুক্তিবাহিনী এসে আমার চোখের সামনে ফুপাকে গুলি করে মেরে ফেলল। তখন একদিন ভয় পেয়েছিলাম। আর গতরাতে ভয় পেলাম।'

আমি বললাম, 'ভয় তো পাওয়ার কথাই! একটি গ্রিজলি বিয়ার তাঁবু অ্যাটাক করে ফেলে—এটা কি সোজা কথা!' মোহসিন ভাই গলা নামিয়ে বললেন, 'আমি আর কী ভয় পেয়েছি? ভয় পেয়েছিল কিন্তু অম্লান! আমি লাইটার জ্বালিয়ে দেখি ভয়ের চোটে তার সব দাঁত বের হয়ে আছে! এইভাবে—

তিনি নিজের দাঁত বের করে দেখিয়ে মাথা নেড়ে বললেন : 'ভীতুর ডিম। পশ্চিমবাংলার মানুষ হচ্ছে এরকম ভীতু। এইজন্য এদেরকে বলে ঘটি!'

আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। একটু পরে মোহসিন ভাই একটু অন্যদিকে গেছেন, তখন সবাইকে ডেকে দ্রুত আমি একটা মিটিং করলাম, বললাম : 'দ্যাখো, যতটুকু ভয় দেখিয়েছি, মোহসিন ভাই তার থেকে একশো গুণ বেশি ভয় পেয়ে গেছেন। একটু মনে হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আরেকটু হলে মোহসিন ভাইয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত, আর আমরা মানুষ-খুনের মামলায় পড়ে যেতাম।' অন্যদের সেটা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। তারা আনন্দে হা হা করে হাসতে লাগল। আমি বললাম : 'সবাই প্রতিজ্ঞা করো, বেঁচে থাকতে তোমরা কেউ কখনো মোহসিন ভাইকে এই ঘটনার কথা বলবে না।'

সবাই প্রতিজ্ঞা করল। সবাই মোহসিন ভাইকে যমের মতো ভয় পায়, কাজেই এই ঘটনার কথা বলার মতো সাহস এমনিতেই কারও নেই। আমরা আরো কয়েকদিন ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে ছিলাম, এই সময়টাতে মোহসিন ভাইকে নিয়ে আর কোনো সমস্যা হল না, তিনি এমন কাবু হয়ে থাকলেন যে, আমাদের কাউকে আর কোনো যন্ত্রণা দিলেন না।

এটা হচ্ছে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের একটা মজার গল্প। যারা এই ষড়যন্ত্রের মাঝে ছিল না তারা এর মাঝে মজা খুঁজে পাবে কিনা জানি না। তবে এই ধরনের মজার গল্প আমাদের পরিবারে অনেক

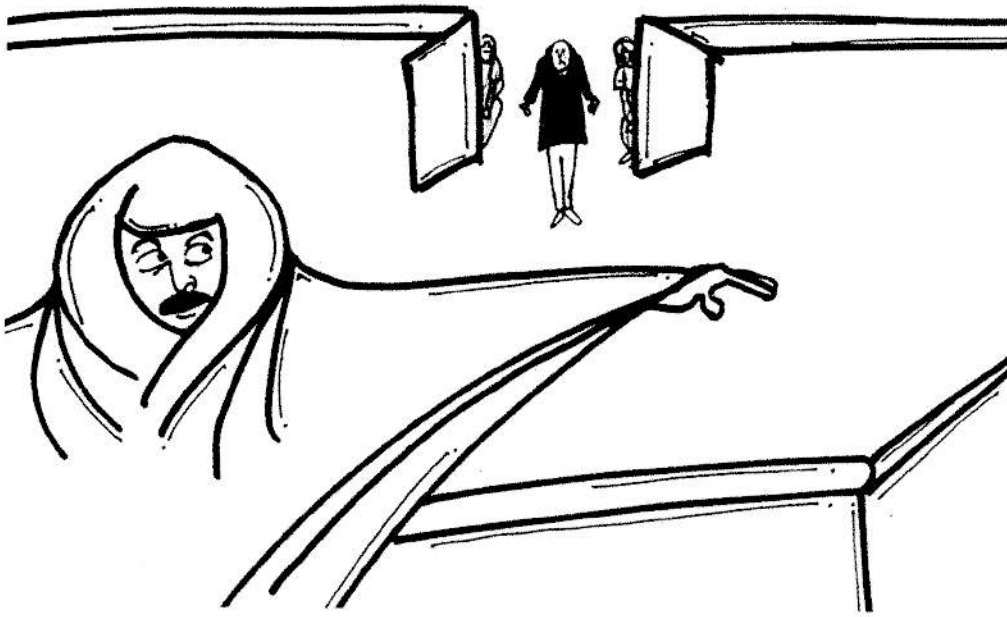

আছে। আমরা যখন ছোট তখন একবার বাড়ি থেকে কিছু আত্মীয়স্বজন আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছে। বাড়ি থেকে কেউ এলেই তারা সেকেন্ড শো সিনেমা দেখতে যায়, কাজেই তারাও গিয়েছে। আমার বাবা বললেন : 'আয় এদের ভয় দেখাই!'

তারপর আমার বাবা হাত উপরে তুলে সারা শরীরে সাদা শাড়ি পেঁচিয়ে শাকচুন্নী হয়ে বাসার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে এসে সেই লোকজন এই শাকচুন্নী দেখে ভয়ে যে গগনবিদারী চিৎকার দিয়েছিল তার কোনো তুলনা নাই!

কাজেই আমরা সব ভাইবোন খুব ছোট থাকতেই আমাদের বাবার কাছে শিখে গিয়েছি যে মানুষকে ভয় দেখানোর মতো মজা আর কিছুতে নেই!

আমি যখন কলেজে পড়ি, কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে কুমিল্লায় আমাদের বাসায় গিয়েছি, আমার বড়ভাই হুমায়ূন আহমেদ আমার অন্যান্য ভাইবোনদের নিয়ে আমাদের যা একটা ভূতের ভয় দেখিয়েছিল যে, আমরা সবাই প্রায় সারাজীবনের জন্য ভীতু হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক পরে আবিষ্কার করেছি এটা তামাশা।

আমাদের পরিবারের ভাইবোন সবার মাঝে এরকম মজা করার অসংখ্য গল্প আছে! যাদেরকে নিয়ে করা হয়েছে—তারা মজা পায় না, অন্যেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। তোমরা ছোট একটা মজার গল্প শুনতে চেয়েছিলে, এটা মনে হয় একটু বেশি লম্বাই হয়ে গেছে! এখন থামা যাক। কি বলো?

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

শখ শুধু ভোজনে

আর কোনো শখ নেই
শখ শুধু ভোজনে
দিন দিন তাই তার
উন্নতি ওজনে।
ভাত খায় হাঁড়ি হাঁড়ি
সের সের দুগ্ধ,
কাবাবের খোশবুতে
একেবারে মুগ্ধ।

চমচম পান্তুয়া
সন্দেশ মণ্ডা,
গপাগপ খেতে পারে
দশ-বিশ গণ্ডা।
চিংড়ির কাটলেট
পটলের দোরমা
এক শ্বাসে নিঃশেষ
বিরিয়ানি কোরমা।
তবু খায় ঔষধ
করে খুব চেষ্টা
কেমনে যে বাড়াবে সে
খিদে আর তেষ্টা।

গোয়েন্দা কীভাবে অপরাধী ধরে

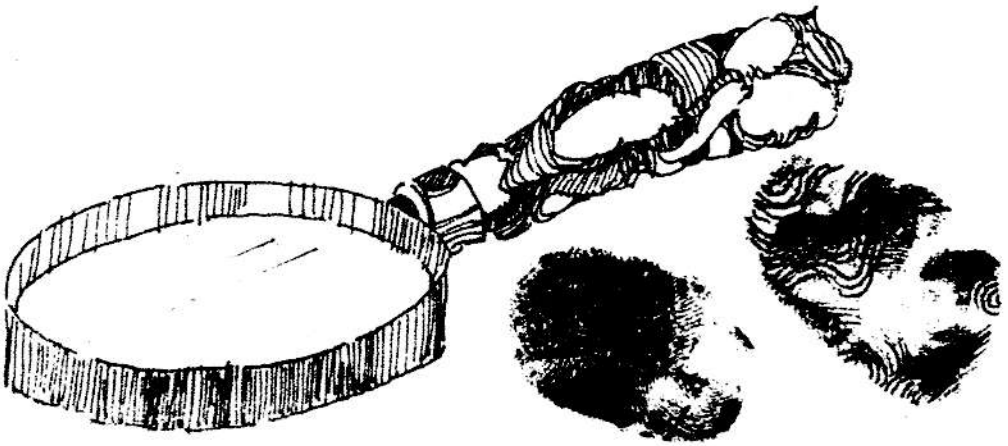

অনেকগুলো সন্দেহভাজন মানুষের ভেতর থেকে কেবলমাত্র সামান্য কিছু সূত্র অবলম্বন করে গোয়েন্দা কীভাবে প্রকৃত অপরাধীকে চিনে বের করেন?

অপরাধ সংঘটিত হবার পরে হাতে লৌহকুণ্ডলী পরবার জন্যে, অপরাধী সবসময়ে অকুস্থলে বসে থাকে, এমন ঘটনা বড় একটা দেখি না, এরকম আশা করাও উচিত নয়।

নগররক্ষক ঘটনাস্থলে আসার আগেই অপরাধী পলাতক। তবু তো দোষী ধরা পড়ে!

ডিটেকটিভ গল্পে-উপন্যাসে বা বাস্তবে যেখানেই হোক না কেন, বরাবর দেখা যায় যে, সন্দেহভাজন কয়েকজন ব্যক্তির ভেতর থেকে গোয়েন্দা অপরাধীকে খুঁজে বের করেন।

কীভাবে?

নিঃসন্দেহে গাণিতিক যুক্তি সাজিয়ে।

পুলিশের ফাইলে এরকম কত ঘটনা আছে, বলে তা শেষ করা যাবে না। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি—অজস্র রোমহর্ষক ঘটনায় ফাইলের পাতা লাল হয়ে রয়েছে। পুলিশের বড়কর্তার মাথা খারাপ, গোয়েন্দাদের মুখ গম্ভীর। তবু তো শেষপর্যন্ত অপরাধী ধরা পড়ে।

ছোট একটা ঘটনার কথা বলা যাক।

ঘটনাটা খুনের। দুপুরবেলা। গ্রীষ্মকাল। চারদিক এমনিতেই নির্জন, তার ওপর অঞ্চলটি আবার অভিজাত। ফলে নির্জনতাটা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পক্ষে আরও অনুকূল। এই সময়ে এক নৃশংস

খুন। কে বা কারা একটা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল কৌশল করে। গৃহে তখন কেবলমাত্র ছিলেন বাড়ির তরুণ মালিকের একমাত্র তরুণী বধূ। তিনি নিহত হলেন নৃশংসভাবে। বিশিষ্ট পল্লীর ব্যাপার বলে পুলিশ সক্রিয় হল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু খুনি অদৃশ্য। কীভাবে এগোনো যায়? সূত্রের সন্ধানে ঝানু গোয়েন্দারা চতুর্দিকে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। না, ঠিক খুনি কে, তা বোঝা গেল না বটে, তবে পারিপার্শ্বিক সব দিক বিবেচনা করে ঝানু গোয়েন্দা তিনজন দাগী অপরাধীকে সন্দেহ করলেন। পরিচিত নাম না বলে ক, খ, গ দিয়ে এদের চিহ্নিত করি। সত্যিই কি এদের মধ্যে কেউ অপরাধী? পুরানো পুলিশ রিপোর্ট দেখলেন গোয়েন্দা। তা ছাড়া অবিশ্রাম জেরাতেও জট আরও একটু আলগা হল। গোয়েন্দা তিনটে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন :

১। ক খ গ ছাড়া কেউই খুনের ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত নয়।

২। ক কখনোই কম করে একজন সহযোগী না নিয়ে কোনো অঘটনে লিপ্ত হয় না।

এবং তৃতীয় সিদ্ধান্তটি হল :

৩। গ নির্দোষ—এই খুনের ঘটনার সঙ্গে সে কোনো সময়েই কোনোভাবে জড়িত ছিল না।

শুধু তৃতীয় সিদ্ধান্তটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে ক খ গ-এর মধ্যে গ-কে বাদ দেওয়ায় সন্দেহভাজনের সংখ্যা সীমিত থাকছে শুধু ক আর খ—এই দু'জনের মধ্যে।

এবার ক আর খ সম্পর্কে গোয়েন্দারা কীভাবে চিন্তা করবেন? কোন রাস্তা ধরে তাঁরা এগোবেন? যদি ঘটনাস্থলে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে এমন একটি বিবরণ পাওয়া যেত—ওই সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে একজনকে বা দু'জনকে, তাহলে মনে হয় গোয়েন্দাদের কাজ আরও একটু সহজ হয়ে যেত।

ঘটনাটির সঙ্গে দু'জন যুক্ত থাকলে ক আর খ দু'জনেই অপরাধী—তাতে সন্দেহ থাকছে না। প্রথম সূত্রের মধ্যেও সে কথা আছে। ক কখনো কম করে একজন সহযোগী সঙ্গে না নিয়ে কোনো অঘটনে লিপ্ত হয় না। তাহলে ক অপরাধে লিপ্ত হলে এক্ষেত্রে খ থাকবেই।

শুধু ক অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, পাশে সহযোগী কেউ নেই, এ হতেই পারে না।

কিন্তু অপরাধী যদি একজন মাত্র হয়—তাহলে? কাকে অপরাধী হিসেবে শনাক্ত করবেন গোয়েন্দারা—ক-কে, না খ-কে?

একক অপরাধী—সুতরাং সহজ যুক্তিতেই এখানে অপরাধী খ, ক নয়।

তাহলে যে-কোনো ক্ষেত্রেই খ অপরাধের সঙ্গে লিপ্ত থাকছেই—সে অপরাধ একজনকে দিয়েই সংঘটিত হোক বা দু'জনকে দিয়ে। ক সে-অপরাধে নাও থাকতে পারে।

এক্ষেত্রে খুনিকে ধরার জন্যে গোয়েন্দাদের তেমন করে মাথা ঘামাতেই হয়নি। গোয়েন্দারা পারিপার্শ্বিক থেকে যেসব সূত্র পেলেন, সেইসব সূত্রকে ঠিকমতো সাজিয়ে অনেকগুলো সন্দেহভাজন ব্যক্তির ভেতর থেকে বিশ্লেষণ ও বর্জন করে অপরাধীকে ঠিক জেনে ফেলেন। যুক্তিনির্ভর এ জানায় ভুল হওয়ার আশঙ্কা নেই কোথাও।

তেমনভাবে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না, গোয়েন্দা বিভাগের ফাইল থেকে এমন আর একটা কেসের কথা বলি।

শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি বিরাট গহনার দোকান থেকে কয়েক লক্ষ টাকার গহনা ডাকাতি হয়ে যায়। দোকানের সবক'টি জানালা ভেঙে ডাকাতেরা দোকানের মধ্যে ঢোকে রাত্রিবেলা। আশেপাশে কয়েকটি ব্যাংক আছে এবং সরকারি অফিসও। সেখানে অবশ্য নাইট-গার্ড থাকে।

কিন্তু তারা কেউ কিছু বুঝতে পারেনি।

অপরাধীর ফেলে-যাওয়া বিভিন্ন আলামতের পরীক্ষা চলছে

যথাসময়ে সংবাদপত্রের শিরোনামে এই সংবাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইদানীংকালে এ-ধরনের এতবড় ডাকাতি শহরে আর সংঘটিত হয়নি এবং যথারীতি এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে গোয়েন্দারা তৎপর।

সে তৎপরতার ফল ফললো দু'চার দিনের মধ্যে। এইরকম অপরাধের সঙ্গে লিপ্ত থাকতে পারে এমন তিনজন দাগী আসামিকে গোয়েন্দারা সন্দেহ করলেন। সত্যি কথা বলতে কি, গোয়েন্দাদের তৎপরতাকে প্রশংসা করতে হয়। জেরায় জেরায় জানা গেল, এই তিনজন ছাড়া আর কেউই ডাকাতির ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু এই ডাকাতিতে কি তিনজনই যুক্ত ছিল?

গোয়েন্দারা অবশ্য আরও একটা খবর পেলেন, ডাকাতেরা এসেছিল গাড়ি করে এবং কালো অ্যামবাসাডারে চড়ে। ডাকাতির সঙ্গে তিনটি সন্দেহভাজন দাগী আসামি ছাড়া আর কেউই যখন যুক্ত নয়, তখন এদের মধ্যে নিশ্চয় কেউ গাড়িটি চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তিনজনেই কি গাড়ি চালাতে জানে? গোয়েন্দারা এ-প্রশ্নেরও একটা উত্তর পেলেন। এবং সে উত্তরটি নেতিবাচক। দেখা গেল, এদের মধ্যে একজন গাড়ি চালাতে পারে না।

বিভিন্ন সূত্রকে ঠিকমতো সাজানোর জন্যে তিন দাগী আসামিকে ক খ গ নাম যুক্ত করা যাক। প্রথম দুটি সূত্র এইরকম :

১। ক খ গ ছাড়া আর কেউ এই ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়।

২। খ গাড়ি চালাতে জানে না।

আরও একটি সূত্র গোয়েন্দারা বের করলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এটি।

৩। গ ক-কে সহযোগী হিসেবে না নিয়ে কখনোই কোনো ডাকাতির কাজে লিপ্ত হয় না (তার অর্থ এই নয় যে, আর কেউ ডাকাতিটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে না।)

এইসব সূত্র থেকে গোয়েন্দারা একটি কথা সুস্পষ্টভাবে জানতে চান, ক দোষী না নির্দোষ?

তিনজন সন্দেহভাজন মানুষ, কয়েকটি সূত্র এবং এর থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রথম খুনের ঘটনার মতো এই ডাকাতির ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। খ-কে অবলম্বন করে যুক্তিকে বিন্যাস করা যাক।

ধরা যাক, খ নিরপরাধ। তাহলে ক আর গ-এর মধ্যে কেউ-না-কেউ অপরাধী হবেই। কারণ বাইরের আর কেউই যে এই অপরাধে লিপ্ত হয়নি, সে সিদ্ধান্তে গোয়েন্দারা পৌঁছেছেন। এক্ষেত্রে ক অপরাধী হতে পারে। যদি ক না হয়, তাহলে গ বটেই। তা না হলে ক আর গ দু'জনে মিলে এই ডাকাতিটি করে থাকতে পারে।

কিন্তু খ নিরপরাধ হলে ক অপরাধী না নিরপরাধ তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। এবারে তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। গ অন্ততপক্ষে ক'কে সহযোগী হিসেবে না নিয়ে কোনো অপরাধে লিপ্ত হয় না। তাহলে গ অপরাধী হলে ক-ও অপরাধী। আর গ যদি অপরাধী না হয়? খ নিরপরাধ হওয়ার বেলায় সেক্ষেত্রে ক তো অপরাধী থাকছেই। সুতরাং খ নিরপরাধ হলে যে-কোনোভাবেই হোক, ক অপরাধীই।

এখন খ যদি নিজেই ডাকাতির ঘটনাটির সঙ্গে লিপ্ত থাকে! তখনও কি ক অপরাধী? না-কি তখন ক নিরপরাধ?

দ্বিতীয় সূত্র থেকে এটুকু জানা যায় যে, খ গাড়ি চালাতে জানে না। তাহলে তার সঙ্গে কেউ-না-কেউ থাকবেই সহযোগী হিসেবে। এক্ষেত্রে ক বা গ-কে অপরাধী হতেই হবে বা দুজনই থাকবে খ-এর সঙ্গে। আবার সেই পূর্বের যুক্তি। ক অপরাধী হলে তো সে অপরাধী থাকছেই আর গ অপরাধী হলেও ক অপরাধী। এবারেও তবে ক অপরাধী। সুতরাং বিশ্লেষণে দেখা গেল, খ-কে নিরপরাধ বা অপরাধী যাই ধরি না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই ক অপরাধী। তাহলে এই ডাকাতির ঘটনায় অপরাধীকে শনাক্তকরণে আর বাধা থাকছে কোথায়?

বিভিন্ন সূত্রকে ঠিকমতো সাজিয়ে যুক্তির পারম্পর্যে অপরাধী ধরবার আরও অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে পুলিশের ডায়েরিতে।

পরের ঘটনাটি ব্যাংক-ডাকাতির এক রোমহর্ষক ঘটনা। আমাদের মন থেকে এ ঘটনার স্মৃতি বোধ হয় এখনও মুছে যায়নি। শহরের কর্মচঞ্চল এক অংশে এই ব্যাংক। ভরদুপুরে এই ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা লুট এবং ক্যাশিয়ার খুন।

গোয়েন্দারা এবারেও সন্দেহভাজন তিনজনকে ধরে আনলেন। এদের সবাই যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এমন নাও হতে পারে। তবে ব্যাংক-ডাকাতিটি সম্পর্কে ধৃত এই তিনজনের মধ্যেই প্রকৃত অপরাধী যে আছে, সে-বিষয়ে গোয়েন্দারা নিশ্চিত।

সব বিবেচনা করে গোয়েন্দারা অবশ্য কয়েকটি সূত্র পেলেন। সূত্রগুলো পরপর সাজিয়ে যাচ্ছি (আগে সন্দেহভাজন তিনজনকে ক, খ, গ নামে চিহ্নিত করে নিই) :

১। যদি ক দোষী হয় এবং খ নির্দোষ, তাহলে গ দোষী।

২। গ কখনো কাউকে সহযোগী হিসেবে না নিয়ে কোনো অঘটনে লিপ্ত হয় না।

৩। ক কখনো গ-কে নিয়ে এ-ধরনের কোনো কাজে নামে না।

৪। ক, খ, গ ছাড়া আর কেউই এ ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এদের মধ্যে কমপক্ষে একজন অপরাধী।

ক, খ, গ-এর মধ্যে একজনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষে উপরের সূত্রগুলো কি যথেষ্ট?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নয়। কিন্তু বিশ্লেষণে এবং যুক্তি দিয়ে আমরা সহজেই একজন অপরাধীকে নিঃসংশয়ে বের করে ফেলতে পারি। কে সেই অপরাধী?

প্রথমে ধরে নেওয়া যাক, খ নির্দোষ। এ অবস্থায় ক যদি অপরাধী হয়, তাহলে গ অপরাধী হবেই— সূত্র ১ সেই কথাই বলছে। অর্থাৎ এই ডাকাতির সঙ্গে ক এবং গ জড়িত বা দু'জনে মিলে এই ডাকাতিটি করেছে। কিন্তু সূত্র ৩-এর দিকে তাকালেই দেখতে পাব ক কখনো গ-এর সঙ্গে মিলে কাজ করে না। তাহলে খ নির্দোষ হলে ক অপরাধী হতেই পারে না। কিন্তু সূত্র ২-এর দিকে লক্ষ করলে দেখব, গ কখনো একা কাজ করে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, গোড়ায় যে খ-কে নির্দোষ ধরেছি, ভুল হয়েছে সেখানেই। খ নির্দোষ নয়। খ-ই আসলে অপরাধী।

গোয়েন্দারা বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অপরাধী ধরবার সময়ে নানাভাবে সূত্রগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেন। এর আগেরবার বিশ্লেষণ শুরু করা হয়েছিল, খ-কে নির্দোষ ধরে নিয়ে। এবারে প্রথমে ধরে নিই ক অপরাধী। তাহলে খ আর গ-এর অবস্থাটা কী? দু'জনেই কি নিরপরাধ? সূত্র ১-এর দিকে তাকানো যাক। ক অপরাধী এবং খ নির্দোষ হলে গ অপরাধী অর্থাৎ ক-এর সঙ্গে গ থাকছে এবং খ যদি নির্দোষ না হয়ে অপরাধী হয়, তাহলে ক-এর সঙ্গে তো খ আছেই। অর্থাৎ যে-কোনোভাবেই হোক, ক-এর সঙ্গে হয় খ না হয় গ থাকছেই। কোনো সহযোগী না নিয়ে ক ডাকাতিতে নামছে না। কিন্তু ৩ নম্বর সূত্র বলে, গ কখনো ক-এর সহযোগী নয়। তাহলে ক-এর সহযোগী খ। অর্থাৎ ক অপরাধী হলে খ-ও অপরাধী।

কিন্তু ক-কে অপরাধী না ধরে প্রথমে ধরে নিই, গ অপরাধী। তাহলে গ-এর একজন সহযোগী থাকবেই। ২ নম্বর সূত্র থেকে সেটুকু সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। এই সহযোগীটি কে? ক না খ? কিন্তু ৩ নম্বর সূত্র থেকে বোঝা যায়, ক আর গ তো মিলেমিশে চলে না। সুতরাং সহযোগী ক নয়, খ। অর্থাৎ সেই আবার খ অপরাধী।

তাহলে এই ডাকাতির নায়ক যে খ, এ নিয়ে আর কি কোনো সন্দেহ থাকে?

এবার এমন একটা ঘটনার কথা বলি যাতে সন্দেহের বশে গোয়েন্দার নজরবন্দি হল চারজন। ঘটনাটি ডাকাতির। অকুস্থল শহরের উত্তরাঞ্চল। যে চারজন পুলিশের নজরবন্দি হল তাদের নাম দেওয়া যাক ক খ গ ঘ। জেরার ফলে গোয়েন্দারা কিছু কিছু তথ্যও পেলেন। এই চারজনের মধ্যে একজন তো অপরাধী বটেই এবং এর বাইরে আর কেউই ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না।

এ ছাড়াও আরও কিছু সূত্র পেলেন গোয়েন্দারা এবং সেসব সূত্র প্রকৃত অপরাধীকে ধরবার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রগুলো সাজিয়ে দিই :

১। ক নিশ্চয়ই নির্দোষ।

২। যদি খ দোষী হয়, তাহলে এর ঠিক একজনই সহযোগী ছিল।

৩। যদি গ দোষী হয়, তাহলে তার ঠিক দুইজনই সহযোগী ছিল।

যে চারজন সন্দেহভাজনকে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে ঘ মারাত্মক। পুলিশ রিপোর্টও তার খুব খারাপ। গোয়েন্দারও সবচেয়ে বেশি নজর তার উপর। সম্ভবত সে অপরাধী। কিন্তু হাতে যেসব সূত্র আছে তা দিয়ে কি তাকে ধরা যাবে?

গোয়েন্দার চিন্তা-ভাবনা শুরু ২ আর ৩ নম্বর সূত্রের দিকে তাকিয়ে। ২ নম্বর সূত্রে খ অপরাধী হলে সবশুদ্ধ দু'জনই ডাকাতির ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত। ৩ নম্বর সূত্রে অপরাধী গ। তখন তিনজন সর্বমোট এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাহলে ২ এবং ৩—এই দুটি সূত্র একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। হয় ২ ঠিক, না হলে ৩।২ আর ৩ একসঙ্গে ঠিক না-হওয়ার অর্থ খ এবং গ দুইজনের একসঙ্গে অপরাধী হওয়া অসম্ভব। খ আর গ-এর একজন নিশ্চয়ই নিরপরাধ। আবার ১ নম্বর সূত্রে আছে ক নিরপরাধ। তাহলে ক খ গ ঘ—এই চারজনের মধ্যে চারজন তো অপরাধী হতেই পারে না, তিনজনও নয়। খুব বেশি হলে দু'জন। তাহলে কে বা কোন্ দু'জন অপরাধী? ৩ নম্বর সূত্র অনুসারে গ অপরাধী হলে তার সঠিক দুজন সহযোগী থাকবেই অর্থাৎ সবশুদ্ধ অপরাধীর সংখ্যা ৩। কিন্তু দু'জনের বেশি তো অপরাধী হতেই পারে না। সুতরাং গ অপরাধী নয়। বিশ্লেষণে এখন পর্যন্ত যা দাঁড়াল তাতে ক এবং গ সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ পড়ল। রইল কেবল খ এবং ঘ। এখন যদি কেবল একজন অপরাধী হয়, তাহলে সে অপরাধী হয় খ, না হয় ঘ। দু'জন হলে আর তো কোনো সমস্যাই থাকছে না। গোয়েন্দারা চিন্তিত কিন্তু ঘ-কে নিয়ে। খ অপরাধী হলে তার একজন সহযোগী থাকবেই। সে সহযোগী ঘ হতে বাধ্য। আর খ যদি অপরাধী নাও হয় তাহলেও ঘ অপরাধী। কারণ ডাকাতি তো হয়েছেই এবং তাতে ক, খ, গ, ঘ ছাড়া বাইরের আর কেউই নেই। ইতিমধ্যে জানাও গেছে ক এবং গ নিরপরাধ। তাহলে বাকি থাকছে ঘ-ই। গোয়েন্দাদের অনুমানই সত্যি হল এক্ষেত্রে।

মনে পড়ে, শহরের এক বড় দোকানে একবার এক রাহাজানির ঘটনা ঘটে। প্রায় বিনা-বাধায় তিরিশ হাজার টাকা লুট হয়ে গেল। একেবারে সকাল দশটা সাড়ে দশটার ঘটনা! শহরের শিল্পাঞ্চল, রাস্তা-ঘাটে লোকজন আছে। পুলিশ-ফাঁড়িও ঘটনাস্থল থেকে দূরে নয়। বিচিত্র ব্যাপার! সেখানেও খবর পৌঁছল অনেক দেরিতে। গুলি চললো না, ছোরার আঘাতে কেউ আহত হল না।

গোয়েন্দারা এসে সব দিক ভালো করে দেখলেন। দোকানের মালিকের বক্তব্য শুনলেন। কিছুক্ষণ হল তিনি দোকান খুলেছেন। তিনজন মাত্র কর্মচারী, তাঁরাও একে একে এসে পড়েছেন। কাজ-কর্ম শুরু হওয়ার মুখে। এমন সময়ে একজন, তাকে তিনি দেখতে পাননি, নিশ্চয়ই দোকানের কোনো কর্মচারীই হবে, পেছন থেকে এসে তাঁর চোখ বেঁধে ফেলল। তারপর মুখ বাঁধল, হাত-পাও বাঁধল পিছমোড়া করে। অতি দ্রুত, একসঙ্গে একাধিক জনই হবে মনে হয়—নিশ্চয়ই তিনি কর্মচারী।

তারপর ঘাড়ে রদ্দা, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। এই একটু আগে জ্ঞান হতে দেখলুম, হাত-পায়ের বাঁধন খোলা, কর্মচারী হিসেবে মনিবকে ওইটুকু দয়া করেছে কিন্তু আয়রন সেফ থেকে তিরিশ হাজার টাকা উধাও। ভাবলুম, তিন ব্যাটাও ভেগেছে। কিন্তু বাছাধনেরা পালায় কোথায়, ওদের নাড়ি-নক্ষত্র সব আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গেটে তালা দিয়ে আপনাদের টেলিফোন করেছি। অনুগ্রহ করে আমার টাকাটা উদ্ধার করে দিন।" দোকানের মালিক আছড়ে পড়ল।

গোয়েন্দারা ওই তিন কর্মচারীকে ধরে নিয়ে গেলেন। ওদের নাম দেওয়া যাক ক, খ আর গ। নিশ্চয় এরা তিনজন মিলেই এমন কাণ্ডটা করে থাকবে। কয়েকটি সূত্রও পাওয়া গেল ওদের জেরা করে। সূত্রগুলি সাজিয়ে দিচ্ছি :

১। ক, খ এবং গ তিনজনই দোকানে ছিল সেই সময়ে এবং ওই তিনজন ছাড়া আর কেউ দোকানে আসেনি গোয়েন্দারা পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত।

২। ক যদি দোষী হয়, তাহলে তার একজন মাত্রই সহযোগী থাকবে এবং আর কেউ নয়।

৩। খ নির্দোষ হলে গ-ও তাই।

৪। যদি সঠিক দু'জন দোষী হয়, তাহলে ক তাদের মধ্যে একজন।

৫। যদি গ নির্দোষ হয়, তাহলে খ-ও তাই।

এই পাঁচটি সূত্র অবলম্বন করে গোয়েন্দারা কোন সিদ্ধান্তে আসবেন?

প্রথমে সূত্রগুলোর দিকে একটু তাকিয়ে দেখা যাক।

মনে করি, ক অপরাধী। তাহলে সূত্র ২ অনুসারে তার একজন মাত্রই সহযোগী থাকবে। এখন খ আর গ-এর মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই ক-এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু খ দোষী হলে গ নির্দোষ—সূত্র ৫-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে এ বক্তব্য মেলে না। আবার গ দোষী হলে খ নির্দোষ—সূত্র ৩-এর এ বিরুদ্ধাচরণ করে। সুতরাং খ আর গ হয় দু'জনেই নির্দোষ, না হলে দু'জনেই অপরাধী। এক্ষেত্রে ক অপরাধী হতে পারে না। সে নির্দোষ।

যদি খ আর গ দু'জনেই অপরাধী হয়, তাহলে তারা দু'জনই মাত্র অপরাধী। কারণ ক প্রতিপন্ন হয়েছে নির্দোষ। কিন্তু সূত্র ৪-এ আছে, অপরাধী যদি দু'জন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ক একজন। এখানেও পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত আসছে। সুতরাং খ আর গ দু'জনেই অপরাধী নয়। নিশ্চয় দু'জনেই নির্দোষ হবে।

শেষপর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম?

খ এবং গ নিরপরাধ এবং ক-ও নিরপরাধ। রাহাজানিতে কেউ তাহলে যুক্ত ছিল না।

দোকানের মালিক তিনজন কর্মচারীর কারোর প্রতিই খুশি ছিলেন না। এইরকম একটা মামলায় ফাঁসাতে পারলে তিনটে লোকের সাজাও হয়, নিজেও মুক্ত হন। তিনজন কর্মচারীকে আটকে রেখে গোয়েন্দাদের কাছে গল্পটা ফাঁদলেন তিনি।

কিন্তু যুক্তির বিচারে গোয়েন্দারা তাঁর চালাকি ধরে ফেললেন। তিন কর্মচারী বেকসুর খালাস।

এইরকম ভাবে যুক্তির বিন্যাসে কত যে রহস্যের সমাধান করা সম্ভব বলে তা শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানোন্নত যুগেও বাহুবলের প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু সর্বাগ্রে চাই বুদ্ধিবল। যুক্তির জোরে এই শক্তিই রহস্যের কিনারা করে দেয় শেষপর্যন্ত।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

দক্ষ হাতে যিনি সামলেছেন বিজ্ঞান ও রাজনীতি

মধ্য তিরিশের এক যুবক ঘোড়ায় চড়ে ছুটছেন এক ঘূর্ণিঝড়ের পেছনে। একসময় ঝড়ের মধ্যেই দৌড়াচ্ছে তাঁর ঘোড়া। এ কি খেলা, না অ্যাডভেঞ্চার? আসলে ঝড়ের সঙ্গে চলতে-চলতে তিনি জানবার চেষ্টা করছেন ঝড়ের রহস্যময় গতিপ্রকৃতি। এ হল আঠারো শতকের চতুর্থ দশকে কোনো একটি দিনের ঘটনা।

ঘটনাস্থল আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহর। যুবকটির নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি সেই বিরল বিজ্ঞানীদের একজন, যাঁরা আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহায় জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। আকাশের বিদ্যুৎ নামিয়ে আনার পরীক্ষায় তেমনই ঝুঁকি নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন, যে পরীক্ষার জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত।

একাধারে পদার্থবিদ, আবহবিদ, সমুদ্রবিজ্ঞানী, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। ১৭০৬ সালের ১৭ জানুয়ারি আমেরিকার বোস্টন শহরে বেঞ্জামিনের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী। সাবান আর মোমবাতি তৈরির কুটিরশিল্প চালাতেন। ১৭টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বৃহৎ পরিবার। বেঞ্জামিন ছিলেন দশম সন্তান।

বিজ্ঞান নিয়ে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে বেঞ্জামিন যখন পড়াশোনা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ৩০। বিদ্যুৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ৪০ বছর বয়সে। এর কয়েক বছর পরেই ১৭৫২ সালে আকাশের বিদ্যুৎ ধরতে ঘুড়ি উড়ানোর দুঃসাহসিক পরীক্ষাটি করেছিলেন বেঞ্জামিন।

তখনও পর্যন্ত আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘে কীভাবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়, কেনই বা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ আগুনের রেখায় সাপের মতো মেঘের বুক চিরে এদিক-ওদিকে ছুটে বেড়ায়, হঠাৎ-হঠাৎ নেমে আসে মাটিতে—তার সঠিক কারণ জানা ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ তৈরির উপায় অবশ্য তার অনেক

আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে সেটা ছিল 'স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি' বা স্থিরবিদ্যুৎ। বিশেষ-বিশেষ বস্তুর পারস্পরিক ঘর্ষণে তা উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছিল। 'কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি' অর্থাৎ চলবিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয় আঠারো শতকে। ইংরেজ বিজ্ঞানী স্টিফেন গ্রে এবং ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস দু ফে প্রথম দেখান যে, স্থিরবিদ্যুৎ একটি ধাতব তারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করা যায়। আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম হাতেনাতে প্রমাণ করেন, পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ আর আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘে সৃষ্ট বিদ্যুৎ আসলে এক এবং উপযুক্ত মাধ্যমের ভেতর দিয়ে তা প্রবাহিত হয়।

ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ কীভাবে ধরেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন? আপাতভাবে পরীক্ষাটি সহজ, কিন্তু এর পরিকল্পনায় অসাধারণ উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় মেলে। ঘুড়িটি তৈরি হয়েছিল সিল্কের কাপড় দিয়ে। পাতলা হালকা কাঠের ক্রশের ওপর কাপড়টি টানটান করে বিছিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ঘুড়ির চারটি কোণে। ঘুড়ির মাথায় ফ্রাঙ্কলিন বসিয়ে দিয়েছিলেন ফুটখানেক লম্বা একটি ধাতব তার। সিল্কের ঘুড়ি বিদ্যুতের অপরিবাহী, কিন্তু ধাতব তার সুপরিবাহী, যা সহজেই আকাশের বিদ্যুৎ আকর্ষণ করবে। এবার ওই বিদ্যুৎ নিচে নামিয়ে আনা হবে কী করে? ফ্রাঙ্কলিন এজন্য ব্যবহার করলেন লিনেন-এর সুতো, কিন্তু জলে ভিজিয়ে নিয়ে। কারণ জলে ভেজা লিনেন বিদ্যুৎ পরিবহন করে। এরপর লিনেনের সুতোর নিচের প্রান্তে জুড়ে দিলেন খানিকটা শুকনো সিল্কের ফিতে আর দুই সুতোর সংযোগস্থলে বেঁধে দিলেন একটি লোহার চাবি। ঘুড়ি উড়ানোর সময় ফ্রাঙ্কলিন ধরে থাকলেন সিল্কের ফিতে। শুকনো সিল্ক বিদ্যুতের অপরিবাহী বলে তড়িৎস্পৃষ্ট হওয়ার ভয় রইল না। তবু সাবধানের মার নেই। সুতরাং এক গ্রীষ্মের ঘন মেঘে ঢাকা আকাশে ফ্রাঙ্কলিন তাঁর ঘুড়িটি উড়ালেন কাঠের তৈরি একটি শেডের নিচে দাঁড়িয়ে, আকাশের বিদ্যুৎ যাতে সরাসরি তাঁর মাথায় এসে না পড়ে। ঘুড়ি উড়ছে, বজ্রগর্ভ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ক্ষরিত বিদ্যুৎ ভেজা লিনেনের সুতো বেয়ে এসে যে চাবিতে হাজির হয়েছে, তার হাতেনাতে প্রমাণ পেলেন ফ্রাঙ্কলিন। একটি আঙুলের গাঁট চাবির একেবারে কাছে নিয়ে যেতেই চাবি থেকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ধেয়ে এল আঙুলে। বৈদ্যুতিক 'শক' অনুভব করলেন ফ্রাঙ্কলিন। পরে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'ওই চকিত ঝাঁকুনি তাঁর শরীরে যে আনন্দের শিহরণ তুলেছিল, তেমনটি আর কখনও অনুভব করেননি।'

ওই পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ঘর্ষণে যেভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, আকাশেও মেঘের বুকে তড়িৎ সৃষ্টি হয় সেভাবেই। আর দুই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, কখনও-বা ওই মেঘ আর ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণে সৃষ্টি হয় স্ফুলিঙ্গের, যাকে আমরা বলি বিদ্যুচ্চমক। ওই বিদ্যুৎ যখন আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসার সময় কোনো গাছ, উঁচু বাড়ি বা মানুষকে স্পর্শ করে, তখনই ধ্বংস বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আমরা তাকে বলি বজ্রপাত। বিজ্ঞানী পরে আকাশে বিদ্যুৎ সৃষ্টির সঠিক কার্যকারণ আবিষ্কার করেছেন। জলকণাদের পারস্পরিক ঘর্ষণ এবং জলকণা ও ঊর্ধ্বগামী বাতাসের সংঘর্ষে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, তার শক্তি লক্ষ লক্ষ ভোল্ট, যার একটি ছোবলেই মৃত্যু। ফ্রাঙ্কলিনের কপাল ভালো, তাঁর ঘুড়ির মাথায় সরাসরি বিদ্যুৎ আঘাত করেনি, ঘুড়ির সঙ্গে লাগানো ধাতব তার কেবল বাতাসে ক্ষরিত বিদ্যুৎ ধরেছিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আকাশে সৃষ্ট বিদ্যুতের প্রকৃতি আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি, বড় বড় ইমারতকে কীভাবে বজ্রপাত থেকে বাঁচানো যায়, তার উপায়ও উদ্ভাবন করেছিলেন। এর নাম 'লাইটনিং কন্ডাক্টর' বা বজ্রগ্রাহক। খুবই সহজ-সরল একটি ব্যবস্থা। উঁচু বাড়ি, গির্জা বা মন্দিরের মাথায় পরিবাহী ধাতুর তৈরি একটি ছুঁচালো রড বসিয়ে, মাটির সঙ্গে তারের মাধ্যমে সেটি জুড়ে

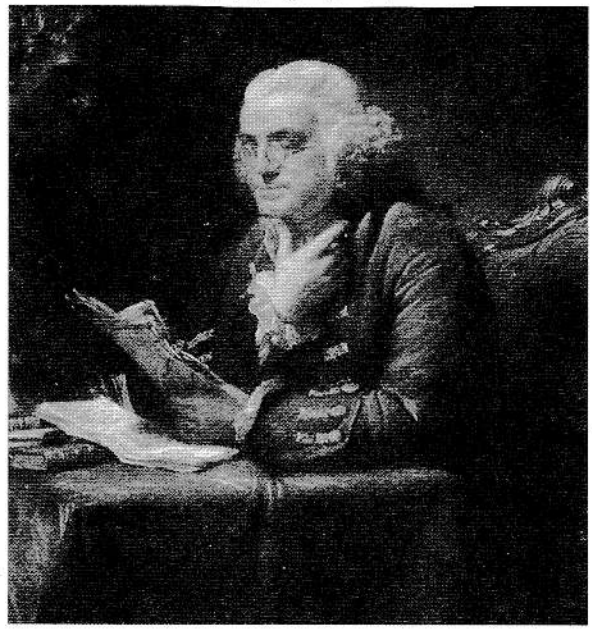

দেওয়া। তা হলে বিদ্যুৎ বা বজ্র সব আগে ওই রডকে ছুঁয়ে সরাসরি 'আর্থ' হয়ে যাবে অর্থাৎ মাটিতে চলে যাবে, বেঁচে যাবে ইমারত। ফ্রাঙ্কলিন যখন প্রথম এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তখন অনেকেই সেটা ভালো চোখে দেখেনি। তাদের যুক্তি ছিল, বজ্রপাতে কারও মৃত্যু বা কোনো বস্তু ধ্বংস হলে বুঝতে হবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা, বজ্রকে আটকানোর অর্থ সেই ইচ্ছায় বাধা দেওয়া। তবে বজ্রগ্রাহকের কার্যকারিতা দেখে ধীরে-ধীরে মানুষের সন্দেহ দূর হয়।

ফ্রাঙ্কলিন ১৭৬০ সালে প্রথম ফিলাডেলফিয়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে একটি কার্যকর বজ্রগ্রাহক বসিয়েছিলেন। ১৭৮২ সালের মধ্যেই স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী ফিলাডেলফিয়ার সমস্ত সরকারি ভবনে ওই গ্রাহক বসানো হয়। ফরাসি দূতাবাসে তা লাগানো হয়নি। সে-বছরই ওই দূতাবাসে বাজ পড়ে এবং একজন অফিসারের মৃত্যু ঘটে। তখন বাড়িটিতে তড়িঘড়ি করে বজ্রগ্রাহক বসানো হয়। এভাবেই ফ্রাঙ্কলিনের পদ্ধতি স্বীকৃতি পায়। ১৭৬৯ সালে লন্ডনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবনকে বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল যার শীর্ষে রাখা হয়েছিল বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে।

আকাশের বিদ্যুৎ নিয়ে ওই পরীক্ষা ফ্রাঙ্কলিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার একমাত্র পরিচয় নয়। 'পজিটিভ' বা ধনাত্মক এবং 'নেগেটিভ' বা ঋণাত্মক বিদ্যুতের ধারণা তিনিই প্রথম দেন। ফ্রাঙ্কলিন চশমার 'বাইফোকাল লেন্স' উদ্ভাবন করেছিলেন। আগে দূরের এবং কাছের জিনিস দেখার জন্য আলাদা-আলাদা চশমা ব্যবহার করতে হত। বাইফোকাল লেন্সে একটা কাচের মধ্যেই ওপরে-নিচে দু'রকম দেখার ব্যবস্থা আছে। ফ্রাঙ্কলিন ঘর গরম করার বিশেষ স্টোভও তৈরি করেছিলেন। তাতে জ্বালানি এমনভাবে সাজানো থাকত যে, প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ জ্বালানি ব্যবহার করে পাওয়া যেত দ্বিগুণ তাপ। সমুদ্রস্রোত, আবহাওয়া, কৃষি এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তিনি গবেষণা করেছেন। 'গালফ স্ট্রিম' বা উপসাগরীয় স্রোতের প্রথম চার্ট তৈরি করেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন, ভালো বাতাস চলাচল করে না এমন ঘরে রোগ ছড়ায় খুব তাড়াতাড়ি। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, অম্লযুক্ত মাটিতে চুন দিলে অম্লতা-দোষ চলে যায়।

লেখালেখি এবং মুদ্রণ-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার সূত্রে ছাপাখানায় সিসের বিষক্রিয়া নিয়েও গবেষণা করেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। ছাপার কাজে সিসের তৈরি অক্ষর ব্যবহার করা হত। এখনও এর প্রচলন আছে বহু জায়গায়। সিসের বিষক্রিয়া নিয়ে ফ্রাঙ্কলিনের গবেষণাপত্র আজও প্রাসঙ্গিক।

পেনসিলভানিয়ায় প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার জন্য নানা সম্মানেও ভূষিত হয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, যার অন্যতম লন্ডন রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ। আমেরিকা তখনও ব্রিটিশ উপনিবেশ। কলোনির একজন মানুষের পক্ষে এই সম্মান পাওয়া সত্যিই বিরল ঘটনা। এতেই শেষ নয়। রাজনীতি ও কূটনীতিবিদ হিসেবেও ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন একেবারে প্রথম সারিতে। ১৭৬৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অন্যতম স্বাক্ষরকারী ফ্রাঙ্কলিন। সবচেয়ে বড় কথা, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর কোনো উদ্ভাবনার 'পেটেন্ট' নেননি। তিনি চেয়েছিলেন সকলে ইচ্ছেমতো এর সুফল ভোগ করুক। বিজ্ঞানকে অর্থকরী কাজে লাগানোর কোনো বাসনাই তাঁর ছিল না।

১৭৯০ সালের ১৭ এপ্রিল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির জীবনাবসান হয়।

অল্পকথার কাহিনী

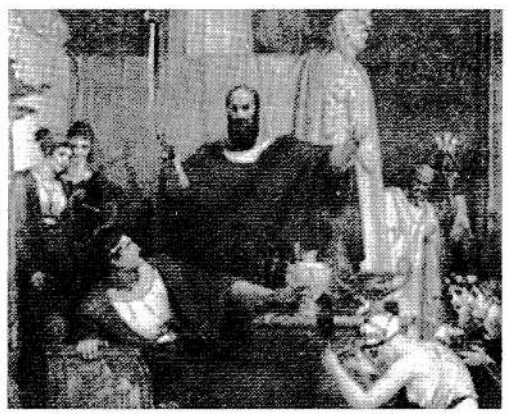

সিরাকুসার (গ্রিস) দুর্দান্ত রাজা দিওনুসিওস-এর কবিতা লেখার অত্যন্ত শখ ছিল বটে, কিন্তু ভালো কবিতা মোটেই তিনি লিখতে পারতেন না। একবার বিখ্যাত কবি ফিলিকসিনস তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করায় দিওনুসিওস তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিছুদিন পরে কি মনে করে তিনি ফিলিকসিনসকে জেল থেকে মুক্ত করে আনেন এবং তাঁর কাছে কতকগুলি কবিতা পাঠ করেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কবিতাগুলি শোনার পর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে ফিলিকসিনস উঠে পড়েন সে স্থান থেকে।

'কি ব্যাপার, হঠাৎ উঠে চললে কোথায়? সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করেন দিওনুসিওস। আবার জেলের দিকেই। উত্তর আসে ফিলিকসিনস-এর কাছ থেকে।

কাঠবেড়ালি

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
বেড়াল বাচ্চা কুকুর-ছানা? তাও?—

বিদ্রোহী কবির এ কাঠবেড়ালিকে অনেকেই জানে। কিন্তু প্রকৃতির কাঠবেড়ালিকে কি সবাই চেনে! মনে হয় না। কারণ সব গাছেই কাঠবেড়ালি থাকে না। আর এরা ক্রমশ আমাদের আশপাশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে কিছু কিছু বাদামি রঙের কাঠবেড়ালি দেখা যায়। লম্বায় ৬-৭ ইঞ্চি। লেজটা শরীরের সমান লম্বা। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায়ও এদের দেখা মেলে।

আমাদের দেশের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া ইত্যাদি এলাকায় ডোরা কাঠবেড়ালি আছে। এদের একটি তিন-ডোরা এবং অন্যটি পাঁচ-ডোরা কাঠবেড়ালি। যশোরের কেশবপুর ও নওয়াপাড়ার আম এবং নারকেল বাগানে এদের দেখা যায়। দুপুরে এদের ডাকে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম হয়। এরা সহজে পোষ মানে না। গোলাকার কোনো ছোট জিনিশ বা ফলমূল নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। সারাদিন ছুটোছুটি করা এদের অভ্যাস। ঘরের টিনের চালে রীতিমতো ঝড় তুলতে পারে। মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। গাছের উপর অগোছালো বিরাট বাসা বানায়। একে ইংরেজিতে বলে 'ড্রে'।

ছোট কাঠবেড়ালি ছাড়াও বড় ধরনের কাঠবেড়ালি রয়েছে। এরা সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মিশ্র চিরসবুজ বনে বসবাস করে। এরা ডালের অগ্রভাগে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিয়ে চলে যায়। লম্বায় এরা ১৫ ইঞ্চি এবং ২৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লেজ। প্রায় পুরো শরীরটা কালো।

কাঠবেড়ালির আরেকটি প্রজাতি রয়েছে। এদের উড়ন্ত কাঠবেড়ালি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাদুড় ছাড়া অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী উড়তে পারে না। উড়ন্ত কাঠবেড়ালিরা আসলে উড়ে না। এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যাবার সময় বাতাসে অনেকক্ষণ ভেসে থাকতে পারে। তখন মনে হয় উড়ে যাচ্ছে। এদের হাত-পাগুলো যখন ছড়িয়ে দেয় তখন মনে হয় পাখায় ভর করেছে। এদের বসবাস চট্টগ্রাম এলাকায়। তবে রাতে চলাফেরা করে বলে দেখা যায় কম।

সব কাঠবেড়ালি জোড়ায় থাকতে পছন্দ করে। বড়রা গাছের মগডালে মস্তবড় বাসা বানায়। ফল-পাতা এদের প্রধান খাদ্য হলেও এরা আরো অনেক কিছু খায়।

ইংরেজি নাম—Squirrel

বৈজ্ঞানিক নাম—*Callosciurus pygerythrus*

সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকায়

সূর্যের নামে একটি পরিচিত ফুলের নাম সূর্যমুখী। এই ফুল যেন সবসময় সূর্যের দিকেই তাকিয়ে থাকে। একবারে ফোটা ফুলে এ ব্যাপার দেখা না গেলেও শীর্ষ কুঁড়িতে এটা নজরে আসে। সূর্যমুখী ফুলের কুঁড়ি ভোর না হতেই পূর্বদিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সে সূর্যপ্রণাম করবে। সূর্য ওঠার পরে সে সূর্যের আকাশপথের দিকে মুখটাকে ওপরে তোলে। মাঝদুপুরে কুঁড়ি ঊর্ধ্বপানে চেয়ে থাকে। বিকেলে কুঁড়ির মুখ আবার পশ্চিমদিকে। এভাবেই সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ রেখে সূর্যমুখীর কুঁড়ি পূর্ব থেকে পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সূর্যমুখীর কুঁড়ি কেন এভাবে সারাদিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে? সূর্যমুখীর এইধরনের ব্যবহারের ব্যাখ্যা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে অজানা ছিল। শেষে দীর্ঘ পরীক্ষানিরীক্ষার পরে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারের এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রাণীদের মতো গাছেরও সবরকমের কাজকর্মই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গাছের অঙ্গের বৃদ্ধির জন্যেও একধরনের হরমোন দরকার। কুঁড়ির শেষ যে পাতা থাকে, এই হরমোন তার ভেতরে তৈরি হয়। এবং তৈরি হওয়ার পরে তা ফুলের বোঁটায় চলে আসে। এখন যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উল্টোদিকে হরমোন বেশি জমা হয়। এবং সেইদিকেই কাণ্ডের বৃদ্ধি হয় বেশি করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বেশি চাপের জন্য কুঁড়ি উল্টোদিকে মুখ করে থাকে। অর্থাৎ সকালবেলায় পূর্বদিকে সূর্য উঠলে ফুলের ডাঁটির পশ্চিমদিকটায় বেশি বাড় হয়। ফলে কুঁড়ির মুখ তখন পূর্বদিকে। বিকেলে ঠিক এর উল্টোটা ঘটে।

পরিণত ফুলে ডাঁটির কোষগুলোও পরিণত হওয়ায় হরমোন আর তেমন কাজ করতে পারে না। ফলে পরিণত সূর্যমুখী ফুলে এই ধরনের ব্যবহার দেখা যায় না। সূর্যমুখীর কুঁড়িতেই এই ব্যাপারটা নজরে আসে।

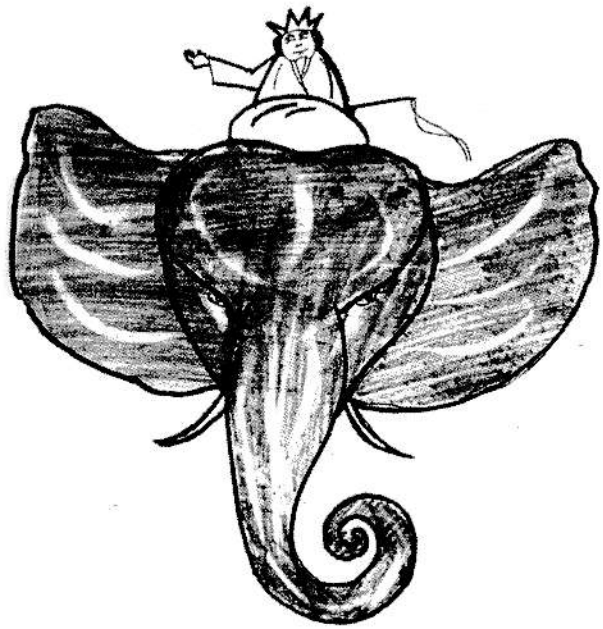

শেখ হবিবর রহমান

সবল দুর্বল

বল হতে বুদ্ধি বড়।
বুদ্ধি নাই বল আছে—
কী তাহার পরিণাম—
শিখিবে হাতির কাছে—
অতিকায়, অতিবল—
ঘটে বুদ্ধিমাত্র নাই,
দুর্বল মানব তার
প্রভু হইয়াছে তাই।

টেবিল টেনিস

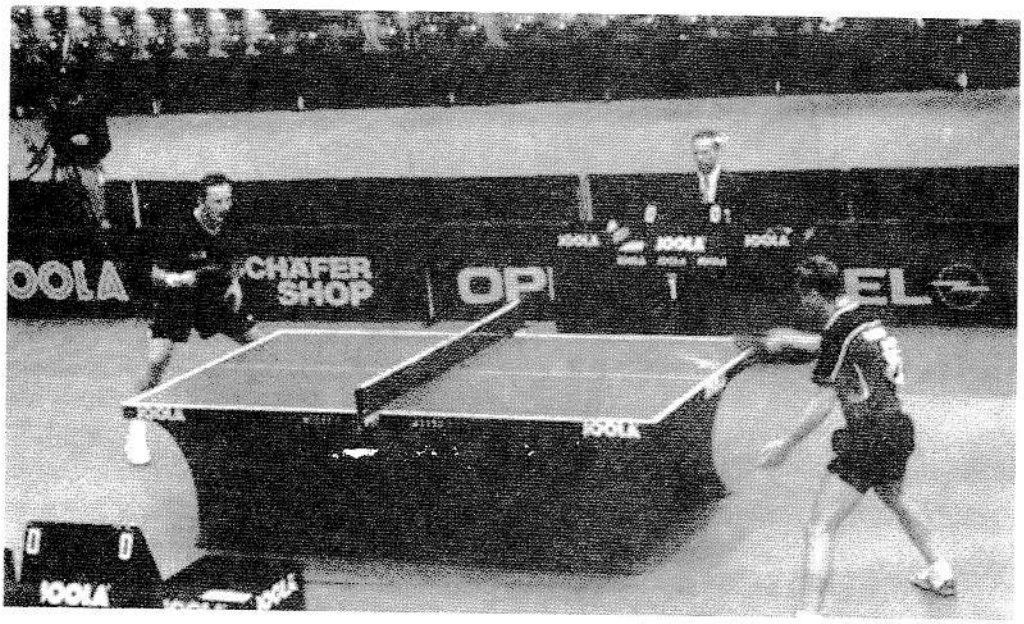

টেবিলের মাপ : দৈর্ঘ্য ৯ ফু. (২৭.৪ মি.)
প্রস্থ ৫ ফু. (১৫.২৫ মি.)

মাটি থেকে টেবিলের উপরিভাগের উচ্চতা ২ ফু. ৬ ই. (৭৬ সে. মি.)

টেবিলের রঙ হবে গাঢ় সবুজ, চারপাশের ধার বা প্রান্ত ৩/৪ ই. (২ সে. মি.) চওড়া সাদা দাগে চিহ্নিত থাকবে। টেবিলের মাঝামাঝি একটি ৬ ফু. (১৮৩ সে. মি.) দীর্ঘ জাল আড়াআড়িভাবে ওটাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করবে; তাকে বলা হয় কোর্ট। টেবিল থেকে জালের উচ্চতা হবে ৬ ই. বা ১৫.২৫ সে.মি.। জালের তলদেশ টেবিল স্পর্শ করবে। জাল হবে গাঢ় সবুজ, ওপরটা সাদা পট্টিতে জড়ানো। কোর্টের মাঝামাঝি ওপর থেকে নিচে একটি সরু ৩ মি. মি. (১/৮ ই.) রেখা টেনে ডান আর বাম দুটো কোর্টে ভাগ করতে হয়। (সার্ভার এবং রিসিভারের কোর্ট—ডাবলস খেলার জন্য)।

টেবিল টেনিসের বল সাদা সেলুলয়েড দিয়ে তৈরি হয়। বলের পরিধি হবে ৩৭.২ এবং ৩৮.২ মিলিমিটারের মধ্যে (১.৪৬-১.৫ ই.), ওজন ৩৭-৩৯ গ্রেন (২.৪-২.৫৩ গ্রা.)। ব্যাটের ওজন ৬-৭ আ. (প্রায় ১৭০-২০০ গ্রা.)। জাপানিরা আরো হালকা ব্যাট ব্যবহার করে—৪ আ. (১১৫ গ্রা.)। হাতলের অগ্রভাগ গোলাকার অংশের ব্যাস হবে ৫-৬ ১/২ ই. (প্রায় ১২৫-১৬৫ মি. মি.), এবং ৩/১৬ থেকে ৩/৮ ই. পুরু (প্রায় ৫-৯.৫ মি. মি.), হাতলটা এমন হবে যাতে সহজভাবে করতল দিয়ে ধরা যায়। ব্যাটের দু'পাশ হবে কাঠের সমান ঘনত্ব এবং সমতল। ফুসকুড়িযুক্ত রবার দিয়ে দু'পাশ মোড়া

থাকতে পারে, কিন্তু তাদের ঘনত্ব ২ মিলিমিটারের বেশি হলে চলবে না। আবার গোলাকার অংশের বাইরের স্তর ফুসকুড়িযুক্ত রবার দিয়ে হতে পারে এবং ভেতরের স্তর স্পঞ্জ (বা সেলুলার যুক্ত) রবারের যাকে বলা হয় 'স্যান্ডউইচ' ব্যাট। এই দুটো স্তরের মোট ঘনত্ব ৪ মি. মিটারের বেশি হবে না।

টেবিল টেনিসের খেলার মীমাংসা হয় পয়েন্টে। প্রথম যে খেলোয়াড় একুশ পয়েন্টে পৌঁছায় সেই জয়ী হয়। তবে দু'জনেই কুড়ি পয়েন্টে পৌঁছুলে বা 'ডিউস' হলে যে আগে আরও দুই পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে সেই জিতে যায়, অর্থাৎ বিজয়ীকে বিজিত থেকে দু'পয়েন্ট এগিয়ে থাকতে হবে।

খেলোয়াড়দের কোন জন কোন দিক নেবে এবং কে আগে সার্ভ করবে তার মীমাংসা হয় টস করে। সব সময় ডানদিকের কোর্ট থেকে সার্ভ করতে হয়। একজন পাঁচবার সার্ভ করার পর এবং প্রত্যেকটি পাঁচ পয়েন্টের পর সার্ভিস বদল হয়। পাঁচ পয়েন্ট একজনেরই হতে হবে এমন কথা নেই, দু'জনের মোট পয়েন্ট পাঁচ হলেই সার্ভিস বদল হবে (যেমন একজনের তিন, অন্যজনের দুই)। টেবিল টেনিসে যে সার্ভ করে তার পয়েন্ট হবে যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিকমতো বল ফেরত পাঠাতে না পারে; কিন্তু সার্ভার যদি ঠিকমতো সার্ভ করতে না পারে, কিংবা টেবিলের বাইরে পাঠায়, তবে পয়েন্ট পাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ রিসিভার—টেনিসের মতো। এভাবেই দু'জনের পয়েন্ট বাড়তে থাকে। দু'জনেরই যদি কুড়ি হয়, তবে প্রতি পয়েন্টের পর সার্ভিস বদল করতে হয়। প্রতি গেমের পর সার্ভিস এবং দিক বদল করার নিয়ম। শেষ গেমের সময় দশ পয়েন্টের পর দিক বদলাতে হয়।

সিঙ্গেলস খেলায় সার্ভার টেবিলের মাঝামাঝি কিংবা যে-কোনো জায়গা থেকে সার্ভ করতে পারে এবং টেবিলের যে-কোনো জায়গায় ফেলতে পারে। পাঁচটি সার্ভিসের পর তার প্রতিপক্ষ ওই একই নিয়মে সার্ভ শুরু করবে।

ডাবলসের খেলায় সার্ভার প্রথমে সার্ভ করবে এবং রিসিভার ঠিকমতো ফেরত পাঠাবে। এবার কিন্তু সেই বলটা ফেরত পাঠাবে সার্ভারের সহযোগী বা 'পার্টনার' এবং সে বল খেলবে রিসিভারের পার্টনার। এই নিয়মে ডাবলসে পার্টনারদের পালা করে খেলতে হয়। ডাবলসে সবসময় সার্ভ করতে হয় ডানদিকের কোর্ট থেকে।

ডাবলসের খেলায় ১/৮ ইঞ্চি চওড়া একটা রেখা মাঝ বরাবর, সাইড লাইনে সমান্তরালভাবে টেনে, খেলার সীমানাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হয়। এই রেখাকে বলে সেন্টার লাইন।

সার্ভ করার সময় বল হাতের তালুতে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সবাই দেখতে পায়। তারপর সেটা শূন্যে ছুড়ে মারতে হবে। বল হাতে ঘুরিয়ে বা স্পিন করিয়ে মারা চলবে না। কিন্তু ব্যাট টেবিলে প্রান্তিক রেখার পেছনে থাকবে। সার্ভ করার পর বল সার্ভারের কোর্টে ড্রপ পড়ে জালের ওপর দিয়ে রিসিভারের কোর্টে একবার ড্রপ পড়ার পর সেটাকে ফেরত পাঠাবার সময় নিজের কোর্টে আর বল ড্রপ ফেলবে না, জালের ওপর দিয়ে সরাসরি বিপক্ষের কোর্টে ফেলবে এবং সার্ভারও ওই নিয়মে আবার বল খেলবে। তখন যে-কোনো কোর্টে বল ফেরত পাঠানো যায়।

ডাবলসের খেলার বল প্রথমে সার্ভারের নিজের খোপকাটা কোর্টে ড্রপ পড়বে (তার দিকের সেন্টার লাইনেও পড়তে পারে), তারপর তার ঠিক কোনাকুনি উল্টোদিকে দাঁড়ানো খেলোয়াড়ের কোর্টের খোপে ড্রপ পড়া চাই। সেটা রিসিভারেরও ডানদিকের কোর্ট।

সার্ভার বল মারতে গিয়ে যদি ব্যাটে বল না করতে পারে তবে সে পয়েন্ট হারায়, কারণ তার হাত থেকে বল পড়া মাত্র খেলা শুরু হয়ে গেছে ধরে নেয়া হয়।

সার্ভিসের সময় বল জালের ওপর দিকটা স্পর্শ করে বিপরীত কোর্টে পড়লে 'লেট' হয়, এবং ওই বল আবার খেলা হয়। টেবিল টেনিসে সার্ভিসের সময় একটি ফল্টের অর্থ হল একটি পয়েন্ট নষ্ট।

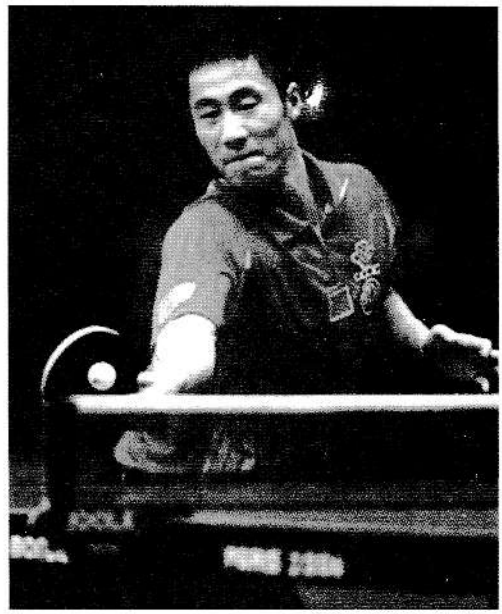

ব্যাট সাধারণত দু'ভাবে ধরা চলে—এক. 'পেন গ্রিপ', দুই. 'হ্যান্ডশেক গ্রিপ'। 'পেন গ্রিপ' প্রথা এশীয় দেশগুলোতেই বেশি প্রচলিত। এ ছাড়া খেলোয়াড়ের সুবিধামতো ব্যাট গ্রিপ করার বাধা নেই। বল মারার সময় হাতের গ্রিপে লাগলে পয়েন্ট হারাতে হয়।

টেবিল টেনিসে ভলি মারার নিয়ম নেই এবং বল নিজের কোর্টে দ্বিতীয়বার ড্রপ পড়ার আগেই খেলা চাই। বল মারার সময় দু'বার ব্যাটে লাগানো চলবে না। খেলার সময় ব্যাট কিংবা পোশাকের কোনো অংশ জাল স্পর্শ করলে এক পয়েন্ট হারাতে হয়। বল টেবিলে পড়ে লাফিয়ে ওঠার আগে যদি কোনো খেলোয়াড়ের গায়ে লাগে তবে সে এক পয়েন্ট হারায়।

বল সার্ভ হয়ে যাবার পর, খেলা চলাকালে, এমনভাবে মারতে হবে যে, বল জালের ওপর দিয়ে সোজা বিপক্ষের কোর্টে পড়ে। নিজের কোর্টে তখন ড্রপ পড়া চলবে না। সে-সময় জালের ওপরদিকটা স্পর্শ করে বল বিপক্ষের কোর্টে পড়লে, সঠিক মার হয়েছে ধরতে হবে।

বল মারার সময় অন্য হাত টেবিল স্পর্শ করলে এক পয়েন্ট নষ্ট হয়। ডাবলস খেলায় যে নিয়মে পার্টনারদের খেলার কথা আগে বলা হয়েছে, অর্থাৎ বল যার মারার কথা, সে না-মেরে তার সহযোগী খেলোয়াড় মারলে এক পয়েন্ট নষ্ট হয়।

সাধারণত তিন গেমে একটি ম্যাচের মীমাংসা হয়ে থাকে, তবে পাঁচ গেম পর্যন্ত খেলার রীতি আছে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমের মাঝে খেলোয়াড়রা পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিতে পারে।

ডাবলস খেলায় যারা আগে সার্ভ করার সুযোগ পায়, তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয় প্রথম পাঁচটা সার্ভিস কে করবে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রাও ঠিক করে নেয় ওই সার্ভিস ফেরাবার দায়িত্ব কে নেবে। দ্বিতীয় পাঁচটা সার্ভিস করার সুযোগ পায়, যে প্রথম পাঁচটা সার্ভিস করার সুযোগ পায়, যে প্রথম পাঁচটা সার্ভিস রিসিভ করেছিল সে এবং প্রথমে যে সার্ভ করেছিল তার পার্টনারের ওপর ভার পড়ে সেই বল ফেরত পাঠাবার ফলে তাকে তার পার্টনারের সঙ্গে ঘর বদল করে নিতে হয়। তৃতীয়

পাঁচটা সার্ভিস করার দায়িত্ব পায় প্রথম সার্ভারের পার্টনার এবং সেই সার্ভিসের মুখোমুখি হয় প্রথম যে রিসিভার হয়েছিল তার পার্টনার সে তার পার্টনারের অর্থাৎ ঠিক আগের খেলাতেই যে ছিল রিসিভার এবং সেই সার্ভিসের মুখোমুখি হতে হয় প্রথম যে সার্ভ করেছিল তাকে। ফলে সে তার পার্টনারের সঙ্গে ঘর বদল করে নেয়। দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পাঁচটা সার্ভিস থেকে যারা বল ফেরত পাঠাচ্ছে, শুধু তারাই পার্টনারের সঙ্গে কোর্ট চেঞ্জ বা ঘর বদল করে। পঞ্চম পাঁচটা সার্ভিস প্রথম পাঁচটা সার্ভিসের পুনরাবৃত্তি এবং পরবর্তী খেলায়ও তার পরের খেলাগুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ডাবলসের খেলায় প্রতি গেমের পর এবং শেষ খেলার অর্ধে (১০ পয়েন্ট) সাইড বদল হয়।

সিঙ্গেলস খেলায় প্রতি পাঁচ পয়েন্টের পর রিসিভার হয় সার্ভার আর সার্ভার রিসিভার।

যদি কোনো খেলোয়াড় ভুল করে বল সার্ভ বা রিসিভ করে তবে ভুল ধরা পড়া মাত্র খেলা থামিয়ে তাকে সঠিক অবস্থায় এনে খেলার ধারা বজায় রাখতে হবে। তবে ভুল ধরা পড়ার আগে যে পয়েন্ট হয়েছিল তা বাতিল হয় না।

হাঙ্গেরির ভিক্টর ভার্না পাঁচবার বিশ্ববিজয়ী হয়েছিলেন, তাকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা হয়।

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দেয়া হয় সোয়েথলিঙ কাপ—লন্ টেনিসের ডেভিস কাপের সমমর্যাদা। ১৯২৬ সালে লন্ডনে এই প্রতিযোগিতার শুরু। পাঁচজনের তালিকা থেকে দলপতিকে তিনজনকে বেছে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দলে তিনজন খেলোয়াড় খেলবে। প্রত্যেক দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে অপর দলের প্রত্যেকের মুখোমুখি হতে হবে। তিনটি করে গেম এবং নয়টি ম্যাচ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে। হাঙ্গেরি অন্তত বারোবার এই কাপ বিজয়ী হয়েছে।

বর্তমানে টেবিল টেনিসে চীন ও সুইডেনের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে।

হাস্যকৌতুক

এব্রাহাম লিংকন তখন তরুণ উকিল। একদিন একই জজের ঘরে তাঁকে দুটো কেস করতে হল, এবং দুটোতেই ছিল একই আইনের প্রসঙ্গ। লিংকন সকালে বিবাদীপক্ষে অনবদ্য ভাষায় অকাট্য যুক্তি দিয়ে মামলা জিতলেন। বিকেলে তিনি হাজির হলেন বাদীপক্ষে এবং সকলের যুক্তির বিপরীতে সওয়াল করতে লাগলেন।

হাকিম মৃদু হেসে জানতে চাইলেন তাঁর মত পাল্টানোর কারণ! লিংক বললেন, "স্যার, সকালে আমি ভুল করে থাকতে পারি, কিন্তু আমার এখনকার যুক্তিগুলো নির্ভুল।"

মোহাম্মদ জহিরুল হক

এডিসনের এক্সপেরিমেন্ট

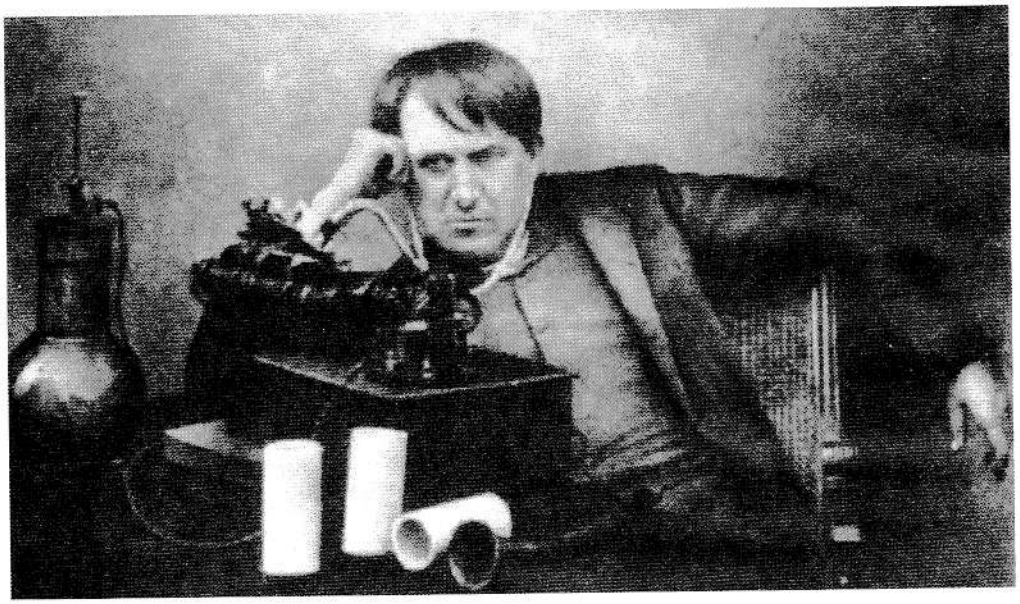

হাঁস অথবা মুরগির বাচ্চাগুলো যখন ডিম থেকে ফোটে, তখন বেশ সুন্দর দেখা যায়। বাচ্চাগুলো বড়দের তেমন আকর্ষণ না করলেও ছোটদের দৃষ্টি এড়ায় না। ছোটরা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে এবং বারে বারে প্রশ্ন করতে চায়, কেমন করে ডিম থেকে এমন সুন্দর বাচ্চাগুলো হল? সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে চায় না যে, ডিম থেকে এত সুন্দর বাচ্চা হতে পারে। আবার কেউবা সত্যি ডিম থেকে বাচ্চা হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তোমাদের ঠিক এমনি একজন বালকের কথা বলব, যে ডিম থেকে সত্যি বাচ্চা হয় কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য ডিমের উপর বসে তা দিয়েছিল।

ছয় বছর বয়সের আমেরিকার এক বালক। নাম টমাস আলভা এডিসন। আল নামেই সে বেশি পরিচিত। একদিন বালক আল বইয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বারান্দায় বসেছিল। হঠাৎ কতগুলো ছোট মুরগির বাচ্চা তার চোখে পড়ল। দৌড়ে সে বাচ্চাগুলোর কাছে গেল এবং হাতে নিয়ে ভালোভাবে পরখ করতে লাগল। কোনো আগন্তুক যেমন আগ্রার তাজমহল দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, বালকেরও তেমনি মনে হল। এমন সুন্দর জিনিস যেন আল কোনোদিন দেখেনি। তাই

মায়ের কাছে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাচ্চাগুলো কোথা থেকে আনলে মা?' মা উত্তর দিল, 'কেন? এইগুলো ডিম থেকে হয়েছে, দেখিসনি, খামারবাড়ির ঘরের এককোণে মুরগিটি বসে ডিমে তা দিচ্ছিল। আর তা থেকেই এই বাচ্চাগুলো হয়েছে।'

ছোট বালক এডিসন। মায়ের কথাগুলো বালকের মনে গাঁথা হয়ে রইল। কিন্তু কথাগুলো বালকের কোমল হৃদয় সহজে গ্রহণ করতে পারল না। ডিম থেকে এত সুন্দর বাচ্চা হতে পারে? এ কী করে সম্ভব! কিন্তু মাকে সে বিশ্বাস করে, জানে মা কোনোদিন মিথ্যা বলে না। হঠাৎ বালক বলে উঠল 'এত ভাবছি কেন? এটা আমি তো সহজেই প্রমাণ করতে পারি।' ডিম থেকে সত্যি বাচ্চা হয় কিনা তা এবার প্রমাণ করে দেখবে এডিসন। তাই সে ডিম কুড়াবার কাজে লেগে গেল।

পরদিন সকালবেলা। আল এডিসন কিছু খড় একত্র করে খামারবাড়ির সেই ঘরের এককোণে ডিমগুলো রাখল। তারপর চুপ করে সেগুলোর ওপর বসে পড়ল।

সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল এল। বালক কিন্তু এখনো বসে আছে। এদিকে বাড়ির সবাই তাকে খুঁজে পাগলপ্রায় হয়ে কাঁদছে। তারপর হঠাৎ বাড়ির চাকর, কী যেন কী কাজে, সেই ঘরে ঢুকে দেখে, আল এক কোণে আপন মনে বসে আছে। 'এ কী আল! তুমি এখানে কী করছ? তোমাকে খুঁজে আমরা হয়রান।' এই বলে চাকর আলের হাত ধরে আলের বাসার কাছে নিয়ে গেল। চাকর যখন আলকে হাত ধরে তার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন যদি তোমরা কেউ আলের প্যান্টের পিছনের দিকটা দেখতে, তবে অবশ্যই আমার কথাগুলো সত্য বলে মেনে নিতে। কারণ ডিমগুলো আলের ওজন সহ্য করতে না পেরে ভেঙে ওর প্যান্টের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল।

'কী করছিলে?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যুত্তরে আল বলল, 'ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে চেয়েছিলাম।' বাবার প্রশ্নের উত্তর শেষ করেই, আল বাবাকে পুনরায় প্রশ্ন করল, 'রাজহাঁস যখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটাতে পারে, তখন আমি কেন পারব না, বাবা।' আশ্চর্য! ছোট বালকের এই প্রশ্নের জবাব তার বাবা কোনোদিন দিতে পারেননি। এই ব্যর্থ এক্সপেরিমেন্টই ঐ বালকটির একমাত্র এক্সপেরিমেন্ট ছিল না। অসংখ্য এক্সপেরিমেন্ট সে করেছিল—তার সারাটি জীবন ধরে। টমাস আলভা এডিসনের এইসব এক্সপেরিমেন্টের ফলশ্রুতি আজকের গ্রামোফোন, বিজলি বাতি, চলচ্চিত্র—আরো কত কী! ডিমে তা দিতে ব্যর্থ হওয়া এই ছেলেটি মোট ১২৬টি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে সর্বকালের একজন সেরা উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

সবচেয়ে বড় অভিধান

সারা দুনিয়ায় যেসব অভিধান বেরিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিকশনারি হচ্ছে ১২ খণ্ডে সমাপ্ত 'দি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি'। এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫ হাজার ৪৮৭। এতে শব্দ আছে ৪১ লক্ষ ৪ হাজার ৮২৫টি। এতে ছবির সংখ্যা মোট ২০০ আর অক্ষর আছে ২৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯ হাজার ৫৮৯টি।

মিরজা আবদুল হাই

নিমকহারাম

হাজার-এগারোশো বছরেরও বেশিদিনের কথা। আমিরুল মোমিনিন আল-মুতাসিমবিল্লাহ, তখন বাগদাদের খলিফা।

ধনে-জনে, জ্ঞানে-গরিমায় বাগদাদের নামডাক তখন সারা দুনিয়ায়। শিক্ষাদীক্ষার প্রাণকেন্দ্র তখন বাগদাদ। অমূল্য আর দুষ্প্রাপ্য বইপত্রে ঠাসা অনেক গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি ছিল সেখানে। অনেক দূর থেকে শিক্ষার্থী আসত জ্ঞান আহরণের জন্য। খলিফাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহের প্রমাণ এইসব লাইব্রেরি। শত শত বছরের পুরোনো পুস্তকের মণিকোঠা।

খলিফা মুতাসিমবিল্লাহ শুধু বিদ্যাচর্চাই করতেন না, তিনি ছিলেন প্রজা-অন্ত প্রাণ। প্রজার দুঃখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। কেমন প্রজাদরদী ছিলেন তিনি, আসল গল্প বলার আগে, তাই একটু শোনো।

একদিন রাজকীয় শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন খলিফা। পরনে মূল্যবান পোশাক। রাস্তার লোকজন সরে গিয়ে শোভাযাত্রার পথ করে দিচ্ছে। এমনি সময় এক থুরথুরে বুড়ো পড়ে গেল রাস্তা থেকে

একেবারে নালায়। সে ছিল এক গাধার উপর। গাধাশুদ্ধই পড়ে গেল সে। খলিফা চক্ষের পলকে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন। ঝাঁপ দিলেন নালায়। রাজকীয় পোশাক পানিতে-কাদায় লেপটে একসা। সেই অবস্থাতেই তিনি বুকে জড়িয়ে তুলে আনলেন সেই বুড়োকে।

এমন যে খলিফা, তাঁর উজির ছিলেন বেজায় ধুরন্ধর। নাম ছিল তার আহমদ। উজির হয়ে তিনি অনেক বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন। এত টাকাপয়সা কামিয়েছিলেন যে, তিনি রাজরাজড়াদের মতো চলাফেরা করতেন।

মুসলমানদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় : সুন্নি আর শিয়া। খলিফা মুতাসিমবিল্লাহ ছিলেন সুন্নি। আর উজির আহমদ শিয়া। সুন্নিরা ছিল আহমদের দু'চোখের বিষ। কীভাবে সুন্নিদের উৎখাত করা যায়, এই ছিল তার দিনরাতের চিন্তা। খলিফা যেহেতু সুন্নি, সেহেতু তিনিও তার জানের দুশমন। অত্যন্ত চতুর ছিলেন আহমদ। ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পেত না তার মনোভাব। এইজন্যেই তিনি মন্ত্রী হতে পেরেছিলেন।

খলিফা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, তিনি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছেন।

দিন যায়। খলিফা শান্তিতেই আছেন। আর আছে রাজ্যের প্রজারা। শুধু শান্তি নেই উজির আহমদের। কী করে সুন্নি খলিফাকে সরিয়ে তিনি নিজে বাদশাহ সেজে বসবেন, দিনরাত শুধু সেই চিন্তা। কেবল মনে মনে প্যাঁচ কষেন। কিন্তু সুযোগ তো চাই। সেই সুযোগ জোটে না। কিন্তু কথায় আছে না, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। হঠাৎ এক সুযোগ পেয়ে গেলেন উজির।

কার্ক নামে একটা জায়গায় শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। ধর্ম নিয়ে টানাটানি। শিয়ারা বলে, আমরা ভালো; সুন্নিরা বলে, তারা। শেষপর্যন্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বেশকিছু শিয়া সুন্নিদের হাতে নাজেহাল হল। এবার লাফিয়ে উঠলেন কুচক্রী আহমদ। ধুয়া তুললেন, দেশে শান্তি নেই। বিচার-আচার নেই। বাগদাদের জানমাল বেওয়ারিশ।

তারপর তিনি যোগাযোগ করলেন হালাকু খানের সঙ্গে। যাযাবর মঙ্গোল-সরদার হালাকু খান। অমিত বিক্রমশালী। তাঁর ভয়ে শিশুরা মায়ের বুকে মুখ লুকোয়। তাঁর অধীনে প্রচুর পদাতিক সৈন্য। রাজ্যবিস্তারের লোভ তাঁর আগুনের মতো।

হালাকু খানকে উজির আহমদ বললেন, এই তো সুযোগ। দেশে বিশৃঙ্খলা। এই মুহূর্তে বাগদাদ আক্রমণ করুন। কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আছি আপনার পেছনে। সব সুযোগ-সুবিধা আমিই করে দেব।

মঙ্গোল-সৈন্য অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগদাদের ওপর।

আমিরুল মোমিনিন আল-মুতাসিমবিল্লাহ এসব ভাবতেই পারেননি। চিন্তার সময় নেই। মান-ইজ্জত, রাজত্ব—সবকিছু তাঁর সুতোয় ঝুলছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করলেন খলিফা। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দুই দলে। হাজার হাজার বাগদাদি সেপাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিল। মঙ্গোলরাও মারা গেল অনেক। বাগদাদের পতন হল। বন্দি হলেন খলিফা। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের আর সবাইও। নির্দয়, রাজ্যলোভী মঙ্গোল-সরদারের হুকুমে তলোয়ারের মুখে প্রাণ দিলেন খলিফা আর তাঁর পরিবার-পরিজন।

যাযাবর মঙ্গোলদের কাছে বই-পুস্তকের মূল্য কী? সব গ্রন্থাগার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

উজির আহমদের আনন্দ ধরে না। বাদশাহির খোয়াবে তিনি মশগুল। মঙ্গোল-সরদার তাঁকে বাগদাদের বাদশাহি দেবেন না, এটা ঠিক জানেন আহমদ। তবে হ্যাঁ, বাগদাদের গভর্নরের পদটি পাওয়া থেকে আহমদকে ঠেকায় কে? এত করলেন আহমদ! কত বুদ্ধির খেলা খেললেন।

খলিফাকে সরাতে কত না প্যাঁচ কষলেন। এমনকি, নিজের শহর বাগদাদকে পর্যন্ত ধ্বংস করলেন। এর উপযুক্ত মূল্য নিশ্চয়ই দেবেন বুদ্ধিমান হালাকু খান। গভর্নর আর খলিফা, পার্থক্যটা তেমন আর বেশি কী? দোর্দণ্ডপ্রতাপে তিনিই তো রাজ্য চালাবেন। সুন্নিদের পীড়ন করতে কেউ তাকে বাধা দেবে না। উজির হিসাবে তো পদে পদে বাধা ছিল। ইচ্ছামাফিক কিছু করতে পারতেন না। খলিফা ছিলেন অন্তরায়। এখন গভর্নর হলে কে তাঁকে বাধা দেবে? যাযাবর হালাকু খান রাজ্যবিস্তারের নেশায় এদিক-সেদিক ঘুরবেন। তার অত সব তলিয়ে দেখবার সময় কোথায়? উজির আহমদ বিশ্বাস করেন, হালাকু খান উপকারীর উপকার কখনো ভুলবেন না। বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই করতে পারবেন না মঙ্গোল-সরদার।

দিনের-পর-দিন যাচ্ছে। তাঁর চোখের সামনে বাগদাদের অমানুষিক ধ্বংসলীলা হল। সবই দেখেছেন আহমদ আর সবসময় ভেবেছেন, এই বুঝি তাঁকে ডেকে পাঠালেন হালাকু খান। তাঁকে ডেকে নিয়ে সমাদরে বসিয়ে বলছেন, "মহানুভব উজির আহমদ সাহেব, আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তা জীবনেও ভুলব না। এই নিন বাগদাদের শাসনভার। আজ থেকে আপনি গভর্নর।"

সকালের সূর্য সন্ধ্যায় অস্ত যায়। রাত ভোর হয়ে ফযরের আযান পড়ে। আহমদের কাছে এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-এক বছর। হালাকু খানের ডাক আর আসে না।

শেষপর্যন্ত বৃথা হল না আহমদের প্রহরগোনা। ডাক একদিন সত্যিই এল। এক মঙ্গোল-প্রহরী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল আহমদের প্রাসাদে। খুশিতে বুকে তুফান উঠেছে উজির আহমদের : "কী সংবাদ, প্রহরী?" আহমদ জানতে চাইলেন।

"বাদশাহ হালাকু খান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। বিশেষ প্রয়োজনে। আমার সঙ্গেই যেতে বলেছেন।" প্রহরী জানাল।

আহমদ সমাদর করে তাকে বসালেন। বললেন : "তুমি অপেক্ষা করো। আমি এখনি আসছি।" ভেতরে চলে গেলেন উজির আহমদ।

রাজসকাশে যেতে হবে নিজের অতি-আকাঙ্ক্ষিত পদ গ্রহণ করতে। সবচেয়ে মূল্যবান পোশাক পরলেন আহমদ। মাথায় জরির তাজ। পায়ে কিংখাবের জুতো। গায়ে ঝলমলিয়ে উঠল মণিমাণিক্য-খচিত মখমলের চোগা-চাপকান। গায়ে লাগানো অতি মূল্যবান আতরের খুশবুতে চারদিক সুরভিত হয়ে গেল।

সবচেয়ে তেজি আর সুন্দর ঘোড়াটাকে সাজাতে হুকুম দিলেন আহমদ। ঘোড়ায় উঠবার আগে হালাকু খানের প্রহরীকে মুঠো ভরে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন : "মঙ্গোল জোয়ান, এই নাও তোমার বখশিশ।"

বেচারা প্রহরী কিছুই জানে না। বখশিশ পেয়ে বলল, "উজির সাহেবের শতবছর পরমায়ু হোক।"

তাঁবুর ভেতর বসে আছেন যাযাবর সরদার হালাকু খান।

আহমদ কুর্নিশ করে দাঁড়ালেন তার সামনে। গুরুগম্ভীর স্বরে হালাকু খান প্রশ্ন করলেন : "উজির সাহেব, আপনার তো অনেক ধন-সম্পদ আর মান-প্রতিপত্তি। কবে থেকে আপনার এত উন্নতি? আগে তো আপনার এত ধন-দৌলত ছিল না।"

আহমদ খুশি হয়ে জবাব দিলেন : "জাঁহাপনা, এই অধমের যা-কিছু বিষয়-সম্পত্তি, মান-ইজ্জত, সব খলিফা আল-মুতাসিমবিল্লাহর সময় থেকে।"

হালাকু খান মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন : "উজির সাহেব, আপনি তো আমার অধীনে চাকরি করতে চান?"

আনন্দে গদগদ আহমদ জবাব দিলেন : "জি, জাঁহাপনা। অধীন হুজুরের নেকনজরপ্রার্থী।"

: আপনি বাগদাদের গভর্নরের পদ চান?—হালাকু খান প্রশ্ন করলেন।

: জি, জাঁহাপনা। আপনি সব জানেন।

খুশিতে উপচে-ওঠা স্বরে জবাব দিলেন আহমদ।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন হালাকু খান। তাঁবু নিঃশব্দ। আহমদ বুকের ভেতর নিজের স্ফূর্তির টিপটিপ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। হঠাৎ গমগম করে উঠল হালাকু খানের কণ্ঠ : "তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি নিমকহারাম। নিমকহারামের স্থান আমার কাছে নেই। অ্যাই, কে আছিস?"

তাঁবুর বাইরে থেকে দু'জন মঙ্গোল-সেপাই ভেতরে ঢুকল। হাতে খোলা তলোয়ার। কুর্নিশ করে দাঁড়াল তাঁরা।

হালাকু খান হুকুম দিলেন : "এই নিমকহারামকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যা। একেবারে কাছে যে-গাছটা পাবি, তাতে ঝুলিয়ে তলোয়ারের এক কোপে একে কোতল করবি। বুঝলি?"

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন আহমদ। মঙ্গোল-সেপাই দু'জন আহমদের হাতদুটো দু'পাশ থেকে বগলদাবা করে নিল। তারপর পড়ন্ত শরীরটাকে টেনে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল। কোন গাছটা সবচেয়ে কাছে পড়ে, সেইটাই তখন তাদের একমাত্র চিন্তা।

রফিকুন নবী

ছবিতে প্রতিবাদ

যারা ছবি আঁকেন তাদের আমরা বলি চিত্রকর। সহজ করে বলা হয় চিত্রশিল্পী। সবাই সাধারণভাবে শিল্পীদের সম্বন্ধে জানে যে, তাঁরা সুন্দরের চর্চা করেন। সুন্দর ছবি আঁকেন। সাধারণ সব দৃশ্য, কিংবা ঘটনা অথবা শুধুই রঙ-তুলির ছোঁয়ায় অপূর্ব সব ছবি হয়ে যায়।

কিন্তু সবসময় যে সুন্দর জিনিসকে নিয়েই তারা ছবি আঁকেন তা নয়। তাঁরা যা মন চায় তাই আঁকেন। যা ভালো লাগে তাকেই ছবির বিষয় করে ফেলেন। সুন্দর অট্টালিকা যেমন আঁকেন, তেমনি ভাঙা-ঝরঝরে কুঁড়েঘরও আঁকেন। সুন্দর পাখিও যেমন আঁকতে ভালো লাগে, তেমনি আবার কুৎসিত কোনো জন্তুও এঁকে ফেলেন। ফরসা মানুষও যেমন তাঁদের ছবির বিষয়, তেমনি কালো মানুষও। তাঁদের কাছে সবাই সমান। সবাই এক।

খুবই শান্তিপ্রিয় লোক এই শিল্পীরা। কিন্তু প্রয়োজনে এরা ফুঁসে ওঠেন। ভীষণ রাগী মানুষ হয়ে যান। তবে তা কিন্তু স্বভাবে নয়, তার প্রকাশটি থাকে ছবিতে। মানুষের কষ্ট দেখলে; অত্যাচার, নিপীড়ন দেখলে; যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখলে; রাজনীতি খেলায় জনগণকে ঠকাতে দেখলে কিংবা জাতিতে-জাতিতে হানাহানি, মারামারি এসব দেখলে তাঁরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তখন তাঁদের ছবিতে রাগীভাব ফুটে ওঠে।

এরকম ব্যাপারটি কিন্তু শিল্পীদের আজকের নয়। বহুকাল আগে থেকেই তাঁদের এরকম স্বভাবটি চলে আসছে। আদিকালে মিশরে যখন ফারাওরা সাধারণ মানুষকে চাবুক মেরে-মেরে প্রাসাদ, ধর্মশালা আর পিরামিড বানাত—তখনও শিল্পীরা এসব পছন্দ করতেন না। তাঁদের ছবিতে এসবকে তুলে ধরতেন। সেসব ছবি দেখে আমরা আজকে, এতকাল পরও জানতে পারি, কী দারুণ অত্যাচারিত হয়ে ফারাওদের শখের জিনিস বানাতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে! এই রকমের অনেক ব্যাপার যুগে যুগে শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে তুলে ধরে সেসব সময়ের কথা বলে গেছেন। তাঁদের প্রতিবাদের কথা জানিয়ে গেছেন।

মধ্যযুগে ইউরোপের ডাচশিল্পী ইউরোনিমাস বচ সে-সময়ের ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে তৈরি সমাজের নানা ধরনের গরমিলকে ব্যঙ্গ করে ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ছবির রকম এবং ভাবে উৎসাহিত হয়ে

পরবর্তীকালে আরও বহু শিল্পী এরকম ছবি আঁকতে শুরু করেন। এদের মধ্যে সবচাইতে যিনি সাহসী সব কাণ্ড করেছিলেন ছবির মধ্যে, তাঁর নাম পিটার ব্রুখেল। সামাজিক কুসংস্কার, রাজনীতিবিদদের অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদিকে বিষয় করে এবং এসবকে ব্যঙ্গ করে ছবি এঁকেছিলেন তিনি। তখনকার আমলে এসব নিয়ে ছবি আঁকা কল্পনাই করা যেত না। কিন্তু তিনি এবং, তাঁর মতো অনেকেই এইসব দুঃসাহসী কাজ করেছিলেন। খেটে-খাওয়া মানুষকে সাহস যুগিয়েছিলেন।

এদের বেশকিছুকাল পরে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও একজন শিল্পী এরকমের সামাজিক নানা ধরনের অন্যায় আর কুসংস্কারকে সমালোচনা করে ছবি এঁকেছিলেন, তাঁর নাম ফ্রান্সিসকো গোইয়া। তিনি ছিলেন স্পেনের বাসিন্দা। পার্শ্ববর্তী দেশ ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন যখন স্পেন দখল করলেন তখন শিল্পী গোইয়া ফরাসি বাহিনীর কুকীর্তি অর্থাৎ নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা, নির্যাতন এসবকে নিয়ে নির্ভীক সব ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

একালে দেশে-বিদেশে শিল্পীদের এ-ধরনের কর্মকাণ্ড তো অঢেল। স্পেনের পাবলো পিকাসোর কথাই ধরা যাক। তাঁর 'গোয়ার্নিকা' সেই রকমেরই একটি শিল্পকর্ম। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় স্বৈরাচারীদের হাতে নিপীড়িত জনগণের দুর্দশাকে দুনিয়ার কাছে তুলে ধরতে তিনি এই ছবি এঁকেছিলেন। এই ছবি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে হলেও সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হয়। শিল্পীদের এ-ধরনের কাজের আর কাজ করার স্বভাবের এত দৃষ্টান্ত আছে যে, তা বলে শেষ করা যায় না।

শুধু বিদেশেই নয়, আমাদের শিল্পীদেরও এইরকম কাজ রয়েছে। এই ধরনের কাজের অভ্যাস রয়েছে।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি এঁকে সারাবিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন—এ-কথা কে না জানে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন এই ব্যাপারটি ঘটেছিল তখন ইংরেজরা এ-দেশ শাসন করত। তারা চক্রান্ত করে আমাদের দেশে একটা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। সারাদেশে হাহাকার। দেশের আনাচে-কানাচে শয়ে শয়ে ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার না-পেয়ে মরছে। দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে একমুঠো ভাতের আশায়। কিন্তু কোথাও খাবার নেই।

এদিকে, এই সুযোগ বড় ব্যবসায়ীদের, বড়লোকদের ভীষণ মজা! তাদের অঢেল পয়সা। সেই বলে তারা ভূরিভোজ ঠিকই চালিয়ে যেত আর উচ্ছিষ্ট ফেলত ডাস্টবিনে। তখন খেতে-না-পাওয়া মানুষের এমনই খারাপ অবস্থা যে, সেইসব উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার জন্যে তাদের ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে, কাকের সাথে লড়াই করতে হত।

জয়নুল আবেদিনের শিল্পীমন এসব দেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বের মানুষকে জানান দিতে এসবকে নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। এসব ছবি কিন্তু কোনো সৌন্দর্যকে তুলে ধরার মতো ব্যাপার

ছিল না। দক্ষ হাতে, তুলির শক্তিশালী রেখায় তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন এইসব দৃশ্যকে। আসলে ছবিগুলোতে উপস্থিত করেছিলেন প্রতিবাদের ভাষা। সেই ভাষা কাজ দিয়েছিল। বিশ্বময় খবরের কাগজে তা প্রকাশিত হয়েছিল। আর সেইসঙ্গে ইংরেজদের, তাদের দোসরদের আসল চেহারাটা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় সবাই চিনতে পেরেছিল।

এ তো হল শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ঘটনা। এরকমের ঘটনা আরও অনেক, অন্য ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা আছে যাতে আমাদের শিল্পীরা তাদের রঙ-তুলি নিয়ে শামিল হয়েছিলেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের অন্যান্য শিল্পীরাও এই ধরনের প্রতিবাদী ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন সময়ে, নানা প্রয়োজনে।

১৯৫২-তে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল, তা তো জানোই। তাতে সালাম, বরকত, রফিকসহ বহু ছাত্র মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী বছরগুলোতে তখনকার তরুণ শিল্পীরা ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, কার্টুনসহ চিত্রকলার বিভিন্ন দিকে তুলে ধরেছিলেন তখনকার খুনি সরকারের চেহারাটিকে। এই কাজে শিল্পী এমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম, মর্তুজা বশীর, রশীদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, কাইয়ুম চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পী ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের আগে ষাট দশকে নানা আন্দোলন যখন ক্রমশ স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে এগুচ্ছিল, তখনও কিন্তু শিল্পীরা বসে থাকেননি। স্বৈরাচারী পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন তাদের রঙ-তুলির সাহায্যে। এ সময় প্রায় সব শিল্পীই দেশকে, বাংলা ভাষাকে, বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচাবার আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। তখন শুধু ব্যানার, ফেস্টুন আর কার্টুনেই নয়, প্রতিবাদী সব ছবি এঁকে সেসবের প্রদর্শনী করে নবান্ন-উৎসব পালন করেছিলেন তারা। তাতে চাওয়া-পাওয়ার কথা নিয়ে, দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিয়ে অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন সবাই।

সে-সময় কিন্তু ব্যাপারটি কম বিপদের ছিল না। পাকিস্তানি সরকারের অত্যাচার-নিপীড়নের তখন সীমা ছিল না। জুলুম করত। শিল্পীরা এসবকে তুচ্ছ মনে করে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের এইসব ছবি নিয়ে। এমনি করে তাঁরা 'কালবৈশাখী' নামেও একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। তাছাড়া শহীদ মিনারকে ঘিরে ওই সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের দালালদের বিরুদ্ধে শিল্পীদের নানাধরনের কর্মকাণ্ড তো ছিলই।

কী ঝুঁকি নিয়েই না তখন এসব কাজ করতে হত! পুলিশের ভয়, মিলিটারির ভয়, পশ্চিমাদের সহচর দালালদের ভয়কে উপেক্ষা করে এসব করতে হত তখন। একাত্তরে যখন স্বাধিকার আন্দোলন চলছিল পাকিস্তানিরা সেই আন্দোলনকে বানচাল করতে একের-পর-এক মিছিলের উপর গুলি করে বাঙালিদের হত্যা করেছিল। তখন চারুকলা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং দেশের শিল্পবৃন্দ 'স্বাধিকার নয়, স্বাধীনতা' এই কথা বলেছিলেন সবার আগে। শুধু তাই নয়, তাদের অস্ত্র অর্থাৎ ছবি, ব্যানার, ফেস্টুনে এ-কথা লিখে এবং এঁকে মিছিল বের করেছিলেন। সেই মিছিলে শামিল হয়েছিলেন পরে সর্বস্তরের মানুষ। এবং মিছিলটি ক্রমশ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে গিয়েছিল। এরপরই ২৫ মার্চ রাতে শুরু হয়েছিল পাকিস্তানিদের হত্যাকাণ্ড। ইয়াহিয়া খানের বর্বরবাহিনী মেতে উঠেছিল বাঙালি-নিধনে। সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছিল যুদ্ধ।

এই জানোয়ারদের

হত্যা করতে হবে

শিল্পী কামরুল হাসান এ-সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান কুচক্রী ইয়াহিয়া খানের চেহারা এঁকেছিলেন ব্যঙ্গ করে। রক্তচোষা একটি ভয়াবহ জন্তুর আদল এঁকেছিলেন ছবিটিতে। আর লিখে দিয়েছিলেন : 'এই জন্তুটিকে হত্যা করো।'

ছবিটি এমনভাবে আঁকা যে, চেহারাটিতে শুধু ইয়াহিয়া খানই নয়, সারা পশ্চিমা মিলিটারিদের আর পশ্চিমা শাসকদের নরখাদক চেহারাই যেন প্রকাশ পেয়েছিল। সেই ব্যঙ্গচিত্রের পোস্টারটি সারা দুনিয়ায় পাকিস্তানিদের মুখোশ খুলে আসল রূপটিকে চিনিয়ে দিয়েছিল বেশি করে।

শিল্পী কামরুল হাসান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন, ছবি এঁকে গেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে জাতীয় কবিতা উৎসবের অনুষ্ঠানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ হওয়ার আগের মুহূর্তেও তিনি একটি প্রতিবাদী ছবি এঁকেছিলেন, যেটি দেশের নিপীড়িত জনগণের জন্যে তাঁর শেষ উপহার হয়ে আছে। এবং তাঁর নামও সবার মনে গেঁথে আছে শুধু একজন মানুষ-দরদী নয়, একজন সচেতন শিল্পী হিসেবেও।

আসল কথা কি জানো? ছবি মানুষকে আকর্ষণ করে, কাছে টানে। একটি লেখা যতক্ষণ কেউ পড়তে না পারছে, ততক্ষণ কারো বোঝার উপায় নেই যে, তাতে কী লেখা আছে। প্রতিবাদের কথা থাকলেও তা জানা যায় না যদি তা কেউ পড়তে না-জানে বা কেউ পড়ে না-শোনায়। কিন্তু ছবি? ছবির ভাষা ভিন্ন। ছবি দেখার ব্যাপার। ছবি দিয়ে যদি কোনো সংবাদ জানবার ব্যাপার থাকে তো তা তেমন করে আঁকলেই সবাই বুঝে ফেলে। যাঁরা আঁকতে জানেন, তাঁদের জন্য এটা এক দারুণ সুযোগ। আর প্রতিবাদের ঘটনা থাকলে প্রয়োজনে শিল্পীরা সেই প্রয়োজনটি নিতে ছাড়েন না। রঙ, তুলি আর ক্যানভাসকে করেন অস্ত্র। সেই অস্ত্রে সৃষ্টি হয় একেকটি প্রতিবাদী চিত্র। মানুষকে উজ্জীবিত করে, আন্দোলিত করে, আলোড়িত করে। এমনি করে একেক জন শিল্পী জয়নুল, কামরুল এবং পিকাসোর মতো স্মরণীয় আর আদরণীয় হয়ে যান।

পশুরাও পশু পোষে

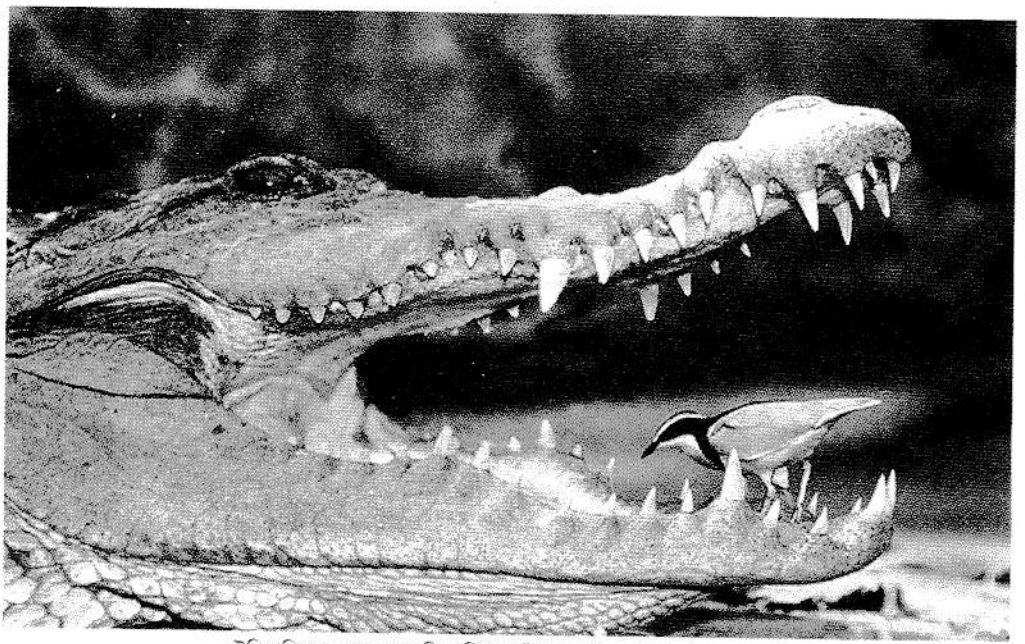

ইজিপশিয়ান প্লোভার পাখি কুমিরের দাঁতে আটকে-থাকা খাবার খাচ্ছে

পশুদের মগজে বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম, তাই আমরা তাদের পোষ মানিয়ে অনেক কাজ আদায় করে নিই। গরুর কাছ থেকে দুধ আদায় করি, বেড়ালকে দিয়ে ইঁদুর মারাই, কুকুরকে দিয়ে বাড়ি পাহারা দেওয়াই, ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়াই, এমনকি বাঘ-ভাল্লুককে দিয়ে সার্কাসের খেলাও দেখিয়ে থাকি আমরা।

কিন্তু, এক পশু আর এক পশুকে পোষ মানাচ্ছে—এ-কথা শুনলে আশ্চর্য লাগে না? প্রকৃতির খেয়াল কিন্তু এমনই যে, এমন ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে কে যে কাকে পোষ মানাচ্ছে সেটা বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ে। ভালোভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে দুটো ভিন্ন জাতের প্রাণী এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে, একজনের আর একজনকে না হলে যেন চলে না। আসলে, এই হাত মেলানোর সুবাদে দুটো পশুই সমানভাবে উপকৃত হয়। প্রমাণ পেতে গেলে চলো প্রথমে পোকামাকড়ের রাজ্যে একটু ঘুরে আসি।

'অ্যাফাইড' নামের কয়েক ধরনের পোকা আছে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চারাগাছে চড়াও হয়। কিন্তু পাতা বা ডালের ওপর বসে তারা আর নড়তে-চড়তে পারে না। মনে হয়, গাছের আঠায় তাদের পা

আটকে গেছে। আসলে, প্রতিটি পোকার দুটো ফাঁকা ও লম্বা শুঁড় আছে। এই শুঁড় গাছের ডালে বা পাতায় বিঁধিয়ে দিয়ে তারা গাছের রস চুকচুক করে টানতে থাকে। কিন্তু এমনই কপাল যে, এই রসের খুব সামান্যই তাদের হজম হয়, বেশিরভাগ রস শরীর থেকে বেরিয়ে আসে পেছনের পায়ের ডগা দিয়ে। বেরিয়ে-আসা এই রসে চিনির ভাগ এত বেশি যে, তা খুবই আঠালো হয়ে পড়ে। ফলে এই আঠালো রসে পোকাগুলো নিজেরাই আটকে পড়ে গাছের গায়ে।

ঘটনাটা কিন্তু তাদের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মিষ্টি রসের সন্ধান পেয়ে লাল পিঁপড়েরা দল বেঁধে আসতে থাকে। পিঁপড়েরা শুধু রস খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, পোকাগুলোকে মুখে করে গাছের তাজা অংশে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাই পোকাগুলো দ্বিগুণ উৎসাহে গাছের তাজা রস টানতে থাকে আর আখেরে লাভ হয় পিঁপড়েগুলোর। শুধু তাই নয়, পিঁপড়েগুলো এইসব পোকাদের ধরেও নিয়ে যায় মাটির নিচের বাসায়। এই বাসাগুলো তৈরি হয় কোনো গাছের কচি শেকড়ের চারপাশে। পোকাগুলো এইসব শেকড়ের রস ভক্ষণ ও রস বিতরণ অবাধে চালিয়ে যায়।

পোকাগুলো কিন্তু বোকা নয়। এতে তাদেরও লাভ হয়। তাদের নড়াচড়ার সুবিধে হয়। তারা আবার প্রায়ই খোলস ছাড়ে। এই খোলস পোকার দেহে যদি রসে লেপটে থাকে তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের বারোটা বেজে যাবে, কিন্তু পিঁপড়েরা এইসব খোলস পরিষ্কার করে দেয়। সবচেয়ে বড় লাভ এই যে, পোকাগুলো ডিম পাড়লেই পিঁপড়েরা সেগুলো বাসার ভেতর নিয়ে যায়, আর নিজেদের ডিমের মতোই যত্ন করে। তা না হলে পাখি বা অন্য কীটপতঙ্গরা এই ডিম সাবাড় করে দিত। তাই দেখা গেছে যে, পিঁপড়ে না থাকলে এইসব পোকার বংশবৃদ্ধি হতে খুবই দেরি হয়।

শুধু কীটপতঙ্গই নয়, বড় মাপের পশুপাখিরাও এ-ব্যাপারে কম যায় না। মিশরের নীলনদের তীরে প্রচুর কুমির দেখতে পাওয়া যায়। 'ইজিপশিয়ান প্লোভার' নামের একরকম পাখি এই কুমিরগুলোর পেছনে সবসময় ঘুরঘুর করে। তীরে উঠে কুমির যখন হাঁ করে রোদ পোহায় তখন এই পাখিগুলো কুমিরের মুখের ভেতর ঢুকে গিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। আসলে কুমিরের দাঁতে যে পোকা হয় তা নাকি এই পাখিদের খুব প্রিয় খাবার। এতে কুমিরের দাঁতও পরিষ্কার হয় আবার পাখিগুলোর ঠোকরানোর ফলে একটা শিরশিরে আরাম অনুভব করে, ফলে কুমিরের বিশ্রামের মেজাজটা আরও বেড়ে যায়।

কুমির যদি খপ করে মুখটা বন্ধ করে ফেলে তাহলে অনায়াসে দু-চারটে পাখি খেয়ে নিতে পারে, কিন্তু এ-কাজ তারা কখনও করে না। তাহলে কি বলতে হবে যে, পশুদেরও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে? প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পশুদের প্রকৃতিই হচ্ছে এমন যে, খিদে পেলে তারা কখনও বিশ্রাম করবে না। আবার বিশ্রাম করার সময় তাদের একটুও খিদে থাকে না। তাই রোদ পোহানোর সময় কুমিরের কাছে খিদের চেয়ে সুড়সুড়ির মেজাজটাই বড়।

তাছাড়া, পাখিগুলো আর একটা উপকারও করে। কুমিরের কোনো শত্রুকে আসতে দেখলে এরা অনেক উঁচু থেকে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, এমনকি কুমিরের মাথায় চাঁটি মারার ভঙ্গিতে ঝাপটাতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমিরগুলো সতর্ক হয়ে জলে নেমে যায়। আফ্রিকার জঙ্গলেও কুমির ও পাখির এই বন্ধুত্ব দেখা গেছে, অবশ্য সেখানে পাখির নাম 'ট্রোকিলাস'।

দক্ষিণ মেরুর বরফে-ঢাকা মহাদেশের চারপাশের সমুদ্র হচ্ছে 'স্পার্ম হোয়েল' নামক তিমি মাছের স্বর্গরাজ্য। তবে শরৎকাল এসে গেলেই সমুদ্রজল বরফে পরিণত হতে শুরু করে, আর তখন তিমি মাছগুলো দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের দিকে সরে আসে। গরমকালে তিমির গায়ে পোকা ও শ্যাওলা জাতীয় আবর্জনা জমে। সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য তিমি মাছগুলো 'প্রে ফ্যারালোপ' নামের সামুদ্রিক পাখিকে লোভ দেখায়।

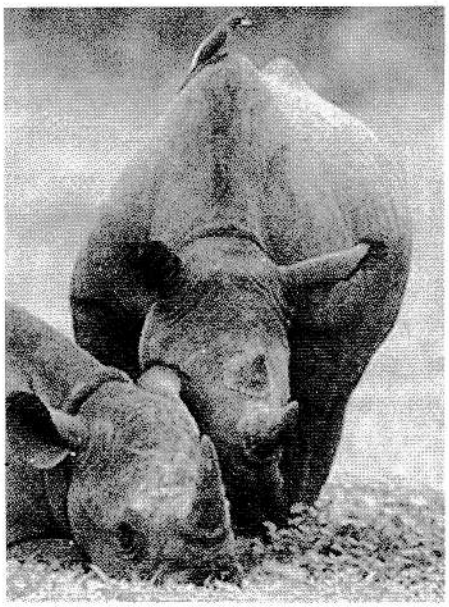

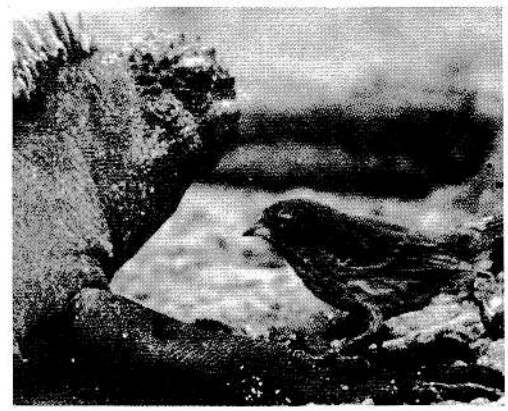

গণ্ডারের গায়ে বন্ধু অক্সপেকার পাখি

পাখিগুলোও এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ফলে এইসময় সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিমি মাছ জলের ওপর পিঠ তুলে ভাসছে, আর কতকগুলো পাখি তার পিঠের ওপর বসে আছে। বুঝতেই পারছ যে, কুমির ও পাখির বন্ধুত্বের যে কারণটা আগে বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও তাই হয়।

কাঠঠোকরা পাখির নাম কে না জানে, কিন্তু ষাঁড়ঠোকরা পাখির নাম শুনেছ? আফ্রিকার একটা পাখির ইংরেজি নাম 'অক্সপেকার', এটি বাংলা করলে 'ষাঁড়ঠোকরা' হতে পারে। এদের পায়ের আঙুলের জোর এত বেশি যে জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায় জোঁকের মতো আটকে থাকতে পারে। আফ্রিকার জঙ্গলে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, মোষ, বাইসন বা হরিণ দুলকি চালে ঘাস খাচ্ছে আর এইসব পাখি তাদের পিঠ, ঘাড়, পেট, লেজ ধরে দোল খাচ্ছে। ব্যালান্স রাখার কাজে পাখিগুলোর লম্বা লেজও খুব সাহায্য করে। আসলে অক্সপেকারের কাজ হল বাইসন বা হরিণ জাতীয় জন্তুর চামড়া থেকে পোকামাকড় খুঁটে খাওয়া, আর বিপদের গন্ধ পেলে তুমুল হইচই করা। তাই বাইসন বা হরিণও এদের লাই দিয়ে মাথায় তুলে রাখে।

'ক্যাটল-এগ্‌রেট্‌স' পাখির ব্যবহারও অনেকটা অক্সপেকারের মতোই, তবে এরা গরু-মোষের গায়ে বড় একটা চড়ে না, ঠোকরও মারে না, বরং এরা গরু-মোষের পাশাপাশি হাঁটে আর মাঝে-মাঝে ঘাসে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। আসলে, এইসব পাখির প্রিয় খাদ্য একরকম উড়ন্ত কীট বা পোকা। বেশিরভাগ বসে থাকে। যেই ঘাসখেকো জন্তুরা ঘাসের ওপর হাঁটতে শুরু করে অমনি ঘাসে আলোড়ন শুরু হয় আর পোকাগুলো ভয়ে উড়তে থাকে। এই অবস্থায় পাখিগুলো কাছাকাছি থেকে কম খাটুনিতে ভালোই শিকার করতে পারে। এরা কাকের মতো এতই সতর্ক পাখি যে, কাছাকাছি বাঘ যদি ওত পেতে থাকে তাহলে এরা ঠিক বুঝতে পারবে আর চেঁচামেচি শুরু করবে। গরু, মোষ বা বাইসনের এটাই মস্ত লাভ।

এবার এসো একটু জলের তলায় ডুব দেওয়া যাক। বহুকাল ধরে মেক্সিকোর জেলেরা একধরনের মাছের কথা বলে আসছেন। তাঁরা এইসব মাছের নাম নিয়েছেন 'বার্বার ফিশ'।

এইসব মাছ আকারে বেশ ছোট, কিন্তু অনেক বড় বড় মাছের গায়ে তারা চিমটি কাটে। বড় মাছেরা অন্যান্য ছোট মাছকে অনেক সময় খেয়ে ফেলে, কিন্তু এই মাছের গায়ে কখনও 'হাত দেয় না'। কারণ, বড় মাছের গা পরিষ্কার করা আর সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য বার্বার ফিশের দরকার। বড় মাছের গায়ে, বিশেষ করে কানকো ও ফুলকোর মধ্যে রোজই অনেক ময়লা, শ্যাওলা ও ক্ষতিকারক জীবাণু জমা হয়। তাই প্রায়ই দেখা যায় যে, একটা বড় মাছ জলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, আর বার্বার ফিশ তার ফুলকোর ভেতর ঢুকে কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন কোনো নাপিত চুলে কাঁচি চালাচ্ছে। যেসব শ্যাওলা আর জীবাণু ফুলকোর ভেতর ঢুকে থাকে তা খাওয়াতেই নাপিত-মাছের আনন্দ!

সব সময় বার্বার ফিশই যে বড় মাছের খোঁজ করে তা নয়, বরং অনেক সময় দেখা যায় যে, বড় মাছেরাই নাপিত-মাছের সেলুনে চলে এসেছে। কয়েক ধরনের বার্বার ফিশ এখনও বড় মাছকে খোশামোদ করে না : এরা কয়েক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও স্পঞ্জের ওপর বসে থাকে এবং এদের গায়ের রঙ এতই উজ্জ্বল যে, বড় মাছগুলো এদের দূর থেকে চিনতে পারে আর কাছে চলে আসে। শুধু তাই নয়, একপাশের কানকো পরিষ্কার হয়ে গেলে ঘুরে দাঁড়ায়, যাতে অন্যপাশটা এই মাছ পরিষ্কার করে দিতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, অনেক সময় গা পরিষ্কার করাতে বড় মাছের লাইন পড়ে যায়, এবং যতক্ষণ না একটা বড় মাছের গা পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ পেছনের বড় মাছগুলো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

ফ্লোরিডার উপকূলে একটা খাড়ির মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যেসব বড় মাছ খাড়ির মধ্যে আসতে চায় না তারাও খাড়ির ভেতরে চলে আসে যদি খাড়িতে বার্বার ফিশ ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য যে-কোনো বড় মাছের সঙ্গে এই মাছের বন্ধুত্ব হয় না, বিশেষ-বিশেষ বড় মাছের সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ বার্বার ফিশের ঘনিষ্ঠতা হয়। ক্রমশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন যে, হাঙরও অনেকসময় এই মাছের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঘোরাফেরা করে, এমনকি জলহস্তি জলের ওপর মাথা তোলার সময় দেখা যায় যে, তার বিরাট দেহকে কামড়ে কয়েকটি বার্বার ফিশ ঝুলে রয়েছে।

তবে কাঁকড়াও এ-ব্যাপারে বেশ দক্ষ। এক একটা 'রেক ফিশ' বা 'পাইলট ফিশ' দিনে সাত-আটবার 'হারমিট ক্র্যাব' নামক কাঁকড়ার সেলুনে এসে কানকো পরিষ্কার করায়। আবার গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে 'ইগুয়ানা' নামক গিরগিটি যখন সমুদ্রতীরে রোদ পোহায় তখন 'রক ক্র্যাব' জাতের কাঁকড়া তাদের গায়ে মাথায় ঘুরে ঘুরে শ্যাওলা ও জীবাণু পরিষ্কার করে দেয়।

অনেক সময় দেখা যায়, দুটো আলাদা প্রাণীর প্রিয় খাদ্য একই, কিন্তু কোনো একজনের ক্ষমতায় কুলোয় না সেই খাবারকে বাগে আনতে। সেক্ষেত্রে একটু অন্যভাবে এই দু'জনের মধ্যে ভাব জমে ওঠে। অনেকটা ভোঁদড়ের মতো মুখ আর কুকুরের মতো দেহ নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে যে জন্তু তার ইংরেজি নাম 'র‍্যাটল'। এরা মধু খেতে পেলে আর কিছু চায় না। মৌচাক দেখতে পেলেই হল, ভেঙেচুরে তছনছ করে ছাড়বে। এদের গা এতই লোমশ যে মৌমাছিরা গায়ে হুল ফোটাতে পারে না। এক জাতের পাখি আছে যারা তক্কে-তক্কে থাকে কোথায় র‍্যাটলের দেখা পাওয়া যায়। কারণ, পাখিগুলোর প্রিয় খাদ্য হচ্ছে মৌচাকের ভেতরের মোমের মতো অংশটা। কিন্তু মৌমাছির চাক ভাঙার ক্ষমতা এদের নেই। তাই একটা র‍্যাটলের দেখা পেলে এরা কর্কশ গলায় ডাকতে থাকে আর গাছের ডালে লাফালাফি শুরু করে দেয়। র‍্যাটলও বুঝতে পারে যে, পাখিগুলোর

হারমিট-কাঁকড়া শামুকের পরিত্যক্ত খোলে বাসা বেঁধেছে

সন্ধানে নিশ্চয়ই কোনো মৌচাক আছে। তারপর পাখিগুলো মৌচাকের দিকে আস্তে আস্তে উড়ে যায় আর র‍্যাটলও পাখিগুলোকে অনুসরণ করে ছুটতে থাকে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পাখিগুলো যেন র‍্যাটলের গাইড, তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'হনিগাইড'।

সমুদ্রের তলায়ও এ-ধরনের আর একটা মজার বন্ধুত্বের খবর পাওয়া গেছে। অনেকটা কেঁচোর মতো দেখতে একটা কীটের নাম 'র‍্যাগওয়ার্ম'। এরা শামুকের ভেতরের নরম অংশটা খাবার জন্য ছুঁকছুঁক করে, কিন্তু এরা কাছে এলেই অতি সাবধানী শামুকের মুখ খোলার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অথচ 'ডগফিশ' মাছ এতই চালাক যে শামুকের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে আর শামুক মুখ বার করলেই এক ঝটকায় মাথাটা কামড়ে ছিঁড়ে দেয়। তখন র‍্যাগওয়ার্ম শামুকের ভেতরকার নরম অংশটা কুরে-কুরে খেতে খেতে একেবারে সাফ করে দেয়।

ডগফিশ আর র‍্যাগওয়ার্মের কাজ শেষ হলেই এগিয়ে আসে আর একটা জীব—'হারমিট ক্র্যাব' গোষ্ঠীর কাঁকড়া। এরা শামুকের খোলার ভেতরটা দখল করে নেয়।

কারণ, তাদের কাছে ডিম পাড়ার আর লুকিয়ে থাকার এত ভালো জায়গা আর নেই। তাই সমুদ্রের নিচে এই তিনটে প্রাণীকে প্রায়ই কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং বুঝতেই পারছ যে, শুধু মানুষই নয়, পশুরাও পশু পোষে। তবে আমাদের সঙ্গে পশুদের সম্পর্ক নেহাতই মনিব-চাকরের, আর পশুদের বেলায় এই সম্পর্ক বন্ধুত্বের, এই যা তফাত! আমরা পোষা জীবদের সব সময় বন্দি করে বা আগলে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু পশুজগতে একদল অন্যদলের ওপর নির্ভর করেও পুরোপুরি স্বাধীন; তাই উদারতার দিক দিয়ে হয়তো পশুদের কাছে আমরা হেরে গেছি!

আলী ইমাম

অনেকদিন আগে

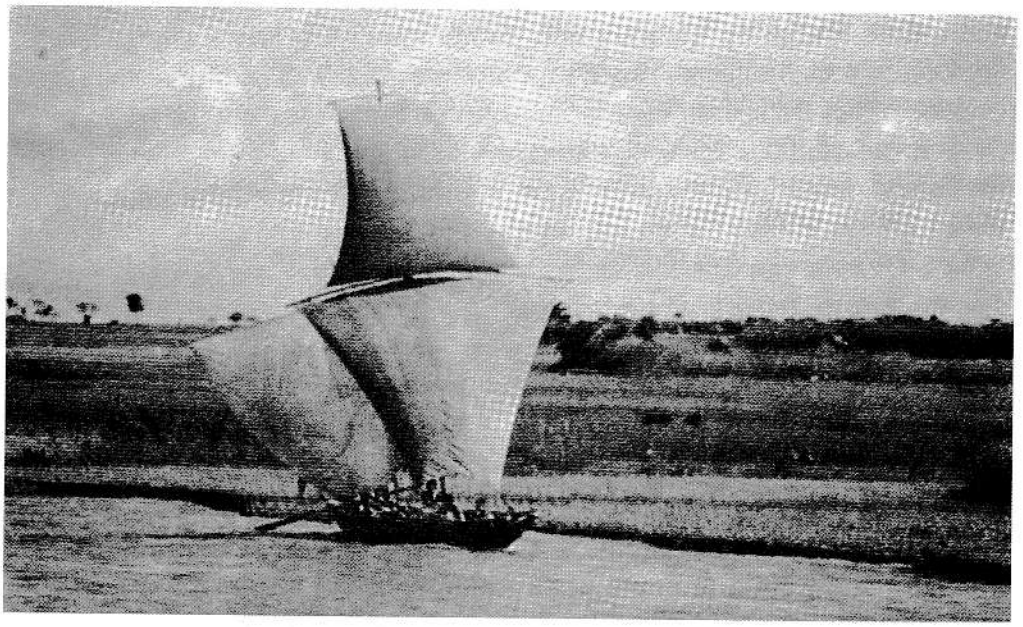

নদীর দু'পাশে চিকচিক করছে বালি। কোথাও কাশের বন, কোথাও নলখাগড়ার ঝোপ। একটি বড় নৌকা তরতর করে ভেসে যাচ্ছে। নৌকোর মাঝিরা তালে তালে দাঁড় টানছে। তাদের কালো-কালো গা ঘামের বিন্দুতে চকচক করছে। নদীর ওপর বালিহাঁসের চক্কর। এমন সময় নৌকার পাটাতনে এসে দাঁড়ালেন একজন দীর্ঘদেহী বিদেশী পুরুষ। তাঁর হাতে বন্দুক। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুটা উত্তেজিত। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ দেখতে পেলেন চরের বালুতে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে কয়েকটা কুমির। বন্দুক তাক করলেন সেই বিদেশী পুরুষ। তিনি শুনেছেন বন্দুকের গুলিতে নাকি কুমিরের কোনো ক্ষতি হয় না। ফরাসি দেশের ঘন অরণ্যে তিনি হিংস্র বাইসন শিকার করেছেন। গুলির তীব্র শব্দে দুপুরের নদী সচকিত হয়ে উঠল। চরগুলোতে ঝটপটানি। একটি কুমিরের পায়ে গুলি লাগে। তারপর কুমিরটি দ্রুতগতিতে নদীতে নেমে যায়। নৌকা থামালেন তিনি চরের কাছে। ঘাসঝোপের কাছে দেখলেন কুমিরের রক্তের দাগ। ঘাসজমি লাল হয়ে আছে।

দিনটি ছিল ১৬৬৩ খৃস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। স্থান ঢাকার দূরের একটি নদী। বিদেশীর নাম টাভার্নিয়ার। বাড়ি তাঁর ফ্রান্স। মূল্যবান পাথরের ব্যবসা তাঁর। নেশা দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখা।

সেই সূত্রে এসেছেন বাংলাদেশে। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এই কুমিরকে গুলি করার বর্ণনা আছে। নৌকো করে যেতে যেতে অনেক দৃশ্য দেখেছেন টাভার্নিয়ার। দৌলদিয়া নামের একটি জায়গায় দেখলেন অজস্র কাকের সমাবেশ। কৌতূহলী হয়ে মাঝিদের পাঠালেন। কী ব্যাপার? নদী থেকে জেলেরা মাছ ধরে নদীর পাড়ে ফেলে রেখেছে। বিরাট আকারের মাছগুলোকে নলখাগড়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মাছের লোভে তাই কাকের দল ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে। টাভার্নিয়ার সেখানে মাছ কিনলেন। রান্না করে খেলেন। বাংলাদেশের প্রাচুর্য তাকে বিস্মিত করেছিল। এত বিচিত্র স্বাদের মাছ!

তাঁর ছিল মণিমাণিক্যের ব্যবসা। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে মোগল বাদশাহ আর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কাছে বিক্রি করতেন। অনেক পাথর ছিল পায়রার ডিমের মতো। অনেক পাথরের রঙ ছিল রক্তের মতো টকটকে লাল। পৃথিবী বিখ্যাত মণি 'কোহিনূর'-এর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন টাভার্নিয়ার। বহু ইতিহাস মিশে আছে, 'কোহিনূর'কে নিয়ে।

১৬৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকা শহরে এলেন। রাজমহল থেকে ঢাকা এসে পৌঁছুতে তাঁর সময় লেগেছিল মোট নয় দিন। এসেছিলেন নদীপথে। যে নদীগুলোর ওপর দিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর নাম লিখেছেন এভাবে : ছোটবর, লক্ষ্মী, পাগলা ও কদমতলী। আসার সময় দেখেছেন গঞ্জ, হাট, বাজার। ঝুরিঅলা বটগাছ। টকটকে লাল শিমুল।

নতুন পরিবেশের সাথে মিশে আনন্দিত ছিলেন তিনি। কয়েকটি স্থানের কথা লিখেছেন। হাজরাহাট, দোনাপুর, বাগমারা, কাজিহাট। পাগলা নদীতে দেখেছেন ইটের সেতু। কদমতলী নদীতে দেখেছেন উঁচু মিনারে মানুষের ঝুলন্ত মাথার খুলি। মাঝিরা তাঁকে জানালেন এগুলো জলদস্যুদের মাথা।

১৩ জানুয়ারি সন্ধেবেলায় ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন টাভার্নিয়ার। তাঁর মতে শহরটি ছিল চার মাইলের অধিক। নদীর তীরে ছাড়া-ছাড়া বাড়ি। অধিকাংশ বাসিন্দা ছুতোর। ঘরগুলো বাঁশ ও কাদার তৈরি। ওলন্দাজ আর ইংরেজদের ছিল লাল ইটের কুঠিবাড়ি। টাভার্নিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন :

> 'ঢাকা আগমনের পরদিন নওয়াবকে সালাম দিতে গেলাম। তাঁকে সোনার বুটিদার ও সোনালি ফিতে জড়ানো একটি জমকালো লম্বা জামা ও পান্নাখচিত একটি পাথর উপহার দিলাম। যে ওলন্দাজটির সাথে আমি থাকতাম, সন্ধ্যের দিকে তার কাছে ফিরে এলাম। নওয়াব আমাকে বেদানা, চীনা কমলালেবু, তরমুজ ও তিন প্রকার আপেল পাঠান। পরদিন আমি কতগুলো জিনিস তাঁকে প্রদর্শন করলাম এবং তাঁর পুত্র নওয়াবজাদাকে সোনার গিলটি করা ঘড়ি, রুপোর একজোড়া পিস্তল এবং একটি দূরবীন উপহার দিলাম।'

ঢাকার নওয়াব তখন শায়েস্তা খাঁ। তাঁর আমলে মগ জলদস্যুদের উৎপাত খুব বেড়ে যায়। ওদের বলা হত হার্মাদ। ভয়ংকর নিষ্ঠুর ছিল ওরা। রাতের বেলায় ছিপনৌকা দিয়ে নিঃশব্দে এসে ঘুমন্ত গ্রামগুলোতে আক্রমণ করত। মশালের আগুনের দাউ-দাউ শিখায় লাল হয়ে যেত গ্রামগুলো। পুড়ে যেত ঘরবাড়ি। বাংলাদেশের মানুষজনের কাছে তখন আতঙ্কের অপর নাম হার্মাদ। শায়েস্তা খাঁ মগদস্যুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সেই যুদ্ধের কথা লিখেছেন টাভার্নিয়ার। নওয়াবের রণতরীগুলো ছিল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। এর উভয়পার্শ্বে ৫০ খানা করে ১০০ খানা এবং ২ জন করে ২০০ জন দাঁড় টানত। কোনো কোনো রণতরীতে ছিল সোনার কাজ। শায়েস্তা খাঁ'র বড় ছেলে বুজুরগ উমিদ খান ১৬৬৬ খৃস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি এক তীব্র লড়াইয়ের পর চট্টগ্রাম দখল করে নেন। টাভার্নিয়ার তখন ঢাকায়। ঢাকাতে সেই বিজয়-উৎসব হয়েছিল।

ওলন্দাজ কুঠিতে তাঁকে আপ্যায়িত করা হয় ফলমূল আর শাকসবজি দিয়ে। তাতে ছিল বড় শিম। টাভার্নিয়ার খোঁজ নিয়ে জানলেন সেই শিমের বীজ আনা হয়েছে জাপান থেকে। ইরান থেকে আনা হয়েছে মুসাব্বি আর খরমুজ। নতুন ধরনের ফলমূল আর সবজি আনা হয়েছে।

আরও কয়েকজন এসেছে দূরদেশ থেকে, যারা ভালোবেসে ফেলেছে বাংলাদেশকে। এখানকার আম, জাম, নারকেলের ঘন ছায়া, উলি-ডুলি পোশাক পরা সাধারণ মানুষগুলোকে। সম্রাট ঈসা খাঁর আমলে এসেছিলেন রালফ ফিচ।

বাংলাদেশের অলংকার তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কত তার নাম। নিপুণ কারিগরেরা নিষ্ঠাভরে বানিয়ে চলেছে কর্ণকুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক, বলয়, কেয়ূর, শঙ্খকঙ্কণ, মেখলা। গরিব ঘরের মেয়েরা পরতো কচি তালপাতার কানের দুল আর ফুলের মালা। রালফ ফিচ লিখেছেন :

> 'নারীরা তাদের কণ্ঠে রুপোর হাঁসুলী, হাতে বাজুবন্দ, পায়ের আঙুলে রুপো ও তামার অথবা হাতির দাঁতের আংটি পরিধান করে থাকে।'

এমনি করে বহু পর্যটকের ডায়েরির পাতায় আমাদের দেশের অতীত লুকিয়ে আছে। অতীতকালের জনজীবন। টুকরো টুকরো ছবি।

রালফ ফিচের বাড়ি ছিল ইংল্যান্ড। শ্বেতদ্বীপ থেকে এসেছিলেন এই পলিমাটির দেশে। পাথুরে দেয়ালের দুর্গ, পাইনের বন আর ঠাণ্ডা শীত ফেলে এখানকার খড়ের ছাউনি, আকন্দ বাসকের ঝোপ এবং ভেজা মাটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

খেজুরগাছকে তিনি একটি মূল্যবান বৃক্ষ বলে মনে করতেন। কারণ খেজুর গাছ বহু উপকারে আসে। ফল খাওয়া যায়, ভিনিগার তৈরি হয়। খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি হয় নৌকার ছাউনি, নয়তো কুটিরের চালা।

রালফ ফিচ ছিলেন রানী প্রথম এলিজাবেথের দূত। সম্রাট আকবরের কাছে রানী যে-পত্র দিয়েছিলেন তার অনুবাদ এ-রকমের :

> 'আমাদের প্রজাগণের দেশ দেখিবার ইচ্ছা এবং সঙ্গে-সঙ্গে সকল দেশের পণ্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত করিবার উদ্দেশে পত্রবাহককে আপনার রাজ্যে পাঠাইলাম। আমাদের সন্দেহ নেই যে আপনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।'

রালফ ফিচ বাখরগঞ্জের মাটিকে খুব উর্বরা বলেছেন। সেখানকার বালাম চালের খ্যাতি ছিল। সোনারগাঁয়ে দেখেছেন লোকজন বাঘ ও শেয়ালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বাড়ির চারদিকে মাটির প্রাচীর তৈরি করত। তবু আক্রমণ হত।

১৬০৮ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন আব্দুল লতিফ। বাড়ি তাঁর গুজরাট প্রদেশের আহমেদাবাদ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ব্যাপকভাবে সফর করেছিলেন তিনি। রাজশাহীর আলাইপুর থেকে রংপুরের ঘোড়াঘাট। ঘোড়াঘাটে ছিল বহু পীর-ফকির। তাঁদের অনেকের কাছে ছিল উড়িষ্যা থেকে আমদানি করা ময়না পাখি।

ঘোড়াঘাটে ছিল গহিন জঙ্গল। সবচাইতে মারাত্মক ছিল বুনো মোষ। আবদুল লতিফের ভাষায় :

> 'বন্য মহিষ একজন অশ্বারোহী শিকারীকে বাতাসের বুদবুদের মতো মনে করে। তারা তীর অথবা তরবারির ভয়ে সামান্যতম নড়াচড়া করে না। আঘাত পেলে শিক্ষিত রণহস্তীর মতো তেড়ে আসে। বন্য মহিষের সহিত তুলনায় এতদঞ্চলের বাঘগুলি সাধারণ মহিষের মতো নিরীহ।'

আবদুল লতিফ সেখানে গণ্ডার শিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কত বন্যজন্তু এখন আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি হত ঢাল। উপজাতীয় লোকেরা এসব ঢাল ব্যবহার করত। উপজাতি ছিল কোচ ও রাজবংশীরা। কোচরা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে ফসলের আবাদ করত। হরিণের শিং সংগ্রহ করত। শহরের বাইরে থাকত ডোমরা। কুকুর মারার কাজে ওরা ছিল দক্ষ।

কোম্পানি আমলে ঢাকার স্থাপত্য

ফলপাকুড়ের প্রশংসা করেছেন আবদুল লতিফ। এক-একটি গাছে ধরত তিন-চারশো কাঁঠাল। আর ছিল মর্তমান কলা, ডালিম, আতা।

একধরনের চাঁপা ফুল দেখেছিলেন তিনি। তার নাম দিয়েছিলেন আসাইখানি। মিষ্টি গন্ধ সে ফুলের।

হাজার বছর ধরে এদেশের জীবন বয়ে চলেছে। সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্রভূমিতে এদেশের পশুপাখি, জীবজন্তু সবকিছুই আকৃষ্ট করেছে বিদেশী পর্যটকদের। জেমস টেলর এসেছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। ১৮৪০ সালে ঢাকার ওপর তাঁর লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়। বহু তথ্যে ভরা। জেমস টেলরের ছিল দেখার মতো চোখ। কৌতূহলী মন। এদেশের অনেক ঔষধি গাছপালার নাম সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। জয়ন্তী পাতা, থানকুনি পাতা, কালো কালকাসুন্দা, রক্তচন্দন, পাথরচুন, কুন্দরী, শতমূলী, পলতা সুন্দী, শাপলা। বিচিত্র তাদের ব্যবহার। পেট ঠাণ্ডা রাখার জন্যে বহু লোক খেত ত্রিফলা। ত্রিফলা হল আমলকী, হরীতকী আর বহেড়া ভেজানো পানি। মধুপুর অঞ্চলে আমগুরুজ নামে একরকমের বুনো লতা পাওয়া যেত। সেই আমগুরুজ লতা কেটে ভিজিয়ে রাখলে লাল পানি বেরোয়। সেই লাল পানি খেলে জ্বর সেরে যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। বেস্তনি গেলিনুল পাখি সম্পর্কে লিখেছেন।

ডোরা মাথার হাঁস, পানি মোরগ আর পেলিকানের কথাও আছে তাঁর বইটিতে। পেলিকান দিয়ে জেলেরা মাছ ধরত। পেলিকানের চামড়ায় ছিল এক রকমের তেল। সেই তেলে আকৃষ্ট হত কই, খলসে।

যেই বাংলাদেশে ঝমঝমিয়ে নেমে আসত বর্ষা, অমনি জেলেরা পোষা পেলিকান নিয়ে নদীতে চলে যেত। ফাঁদ হিসেবে পাখিগুলোকে নৌকোর সাথে বেঁধে রাখা হতো।

ব্রাডলে বার্ট নামক একজন ইংরেজ গত শতকের শেষদিকে নৌপথে ঢাকার দিকে আসেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখে গেছেন অপূর্বভাবে :

> 'ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। একটা মাছরাঙা পাখি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ঝুপ করে পানিতে ডুব দেয়। আয়নার মতো স্বচ্ছ নদীর বুক থেকে জল ছিটকে যায় চারদিকে। পলকের মধ্যে সে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। মন্থরগতি গরুগুলো নদীর কিনারে এসে জল পান করে। একপাল মহিষ জলাভূমিতে নেমে পানির ওপরে তুলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে দেয় পানিতে।'

বিশপ হেবার বাংলাদেশে এসেছিলেন ১৮২৪ সালে। তাঁর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৬ সালে। সেখানে ছিল ঢাকা থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত যাওয়ার কথা। ঢাকা শহরে পা দিতেই হেবার হাতির ডাক শুনেছিলেন। তখন ঢাকা শহরে অনেক হাতি ছিল। ঢাকার একটি এলাকার নাম মাহুতটোলা। শহরের গাছগাছালি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, বিশেষ করে পিপুল গাছ। রাস্তায়-রাস্তায় ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

হেবারের শখ ছিল নৌকা করে জলাভূমিতে ঘোরা। দু'পাশের শস্যক্ষেত, সবুজ গ্রাম, উড়ন্ত পাখি তাঁর ভালো লাগত। ঝকঝকে আকাশের ছায়া বিলে, নদীতে। সোনারঙ রোদের মাঝে চলমান জীবন। একবার গিয়েছিলেন হাজিগঞ্জে। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ার্নার সাহেবের কুঠিতে ছিলেন। হেবার লিখেছেন :

> 'বিকেলে আমরা বাগানে হাঁটছিলাম। মি. ওয়ার্নার এমন সময় আমাকে একটি গাছ দেখালেন যেখানে দু'টি পেলিকান পাখি সবসময় বিশ্রাম নেয়, আর একটি গাছে বাসা বেঁধেছে এক ঈগল পাখি। ঈগল, তাঁর মতে সচরাচর নদীতে দেখা যায় এবং পেলিকানও দুষ্প্রাপ্য নয়। পথে আসতে আমি এ দুটোর একটিরও দেখা পাইনি শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন। এরপর আমাকে তিনি চমৎকার বেগুনি রঙের একটি ফুল দেখালেন যা জলপিনি নামে পরিচিত।'

হেবারের বর্ণনা থেকে বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রামের বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা, ঘাস, পাখি এবং কীট-পতঙ্গের বিবরণ হেবার দিয়েছেন। তাঁর ছিল কৌতূহল। কোথায় নতুন পাখি উড়াল দিল, কোথায় পাখিরা বাসা বাঁধল, কী দিয়ে বাসা তৈরি করল সবকিছুই লক্ষ করেছেন হেবার।

আজকাল অনেক প্রাণী দেখা যায় না। মানুষের বসতি যত বেড়েছে পশুপাখির দলও তত কমেছে। হেবার লিখেছেন : 'একটি ছোট্ট শেয়াল মি. ওয়ার্নারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুন্দর সুন্দর ছোট্ট একটি প্রাণী আকারে খরগোশের মতো, শরীরে প্রচুর লোম, লেজটা কাঠবেড়ালীর মতো। মাঝে-মাঝে এরা ছোট ছোট পাখি ধরে খায়, নয়তো ক্ষেতের ইঁদুর বা শাদা পিঁপড়ে খেয়ে বেঁচে থাকে।'

অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া ছবিগুলো এমনি করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে :

> 'ইবনে বতুতার চোখে কী স্বপ্ন উঠেছিল ফুটে
> নীলনদ মিছে হল তাঁর কাছে বাংলার নদীজলে।
> বার্নিয়ের ভুলে গেল স্বদেশের যশোগাথা।
> পলিমাটি পদাবলী তাঁর দৃষ্টি দিল ভরে।'

শায়েস্তা খাঁর আমলে ইউরোপ থেকে একজন বিখ্যাত পর্যটক এসেছিলেন এই শস্য-শ্যামল বাংলাদেশে। এখানকার পলিমাটি, সবজিক্ষেত, ছোট ছোট কুঁড়েঘর, রুপোলি নদী তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তিনি এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে উৎসাহের সাথে ঘুরেছেন। এখানকার নদী, চরের সবুজ কার্পেটের মতো বিছানো ঘাস তাঁর কাছে চমৎকার লেগেছিল—নাম তাঁর ফ্রান্সিস বার্নিয়ের

(১৬২০-১৬৮৮)। জাতিতে ফরাসি। অনেক গুণ ছিল তাঁর। বেশ কয়েকটি পেশায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দখল ছিল দর্শনশাস্ত্রে। উৎসাহ ছিল পর্যটনে। অন্য দেশের মানুষের প্রতি, জীবনযাত্রার প্রতি বার্নিয়েরের কৌতূহল ছিল। তখনকার দিনে দেশভ্রমণ করা ছিল এক কষ্টের ব্যাপার। পথ দুর্গম—বন্দরে শোনা যায় নানারকমের গল্প।

বার্নিয়েরের আগে আরো কয়েকজন ফরাসি পর্যটক এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিয়ের মার্বেল, জাঁ বাতিস্তা এবং টাভের্নিয়ার। টাভের্নিয়ার ১৬৬৬ সালে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তাঁর সাথে বার্নিয়েরের দেখা হয়েছিল। বাংলাদেশে আসার পথে তাঁরা দু'জন সহযাত্রী ছিলেন। মুর্শিদাবাদে এসে উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পদ্মানদীর খাত বেয়ে টাভের্নিয়ার আসেন ঢাকায়। বার্নিয়ের স্থলপথে কাশিমবাজার হয়ে হুগলি চলে যান।

শায়েস্তা খাঁর পূর্বে ঢাকার শাসক ছিলেন মীর জুমলা। তাঁর আমলে ঢাকা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। মীর জুমলা শীতলক্ষ্যা ও ইছামতীর মিলনস্থলে অনেকগুলো দুর্গ তৈরি করেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। একবার হাজীগঞ্জ দুর্গ থেকে বিরাট এক নৌবাহিনী নিয়ে আসাম আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন তিনি।

টাভের্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনীতে কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে। স্থানগুলো হল দোলাপুর, হাজরাহাট, দৌলদিয়া, দমপুর, বাগমারা, কাজিহাট এবং ঢাকা। তাঁর মতে হাজরাহাট থেকে স্থলপথে ঢাকার দূরত্ব ছিল ৯০ মাইল। পালতোলা এক বিরাট নৌকায় করে এসেছিলেন। নদীর দু'পারের শ্যামল ছবি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। নদীর চিকচিকে শাদা বালুচরে দেখলেন অসংখ্য কুমির। বালুতে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। একধরনের কুমির শিকারি লোক ছিল। তাদের বলত গাড়ু। কুচকুচে কালো শরীর। কানে লোহার বালা। বল্লম বিঁধিয়ে কুমির হত্যা করত। পাগলা নদীতে ইটের তৈরি এক চমৎকার সেতু দেখেছিলেন তিনি। সেতুটি বানিয়েছিলেন মীর জুমলা। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাইয়ের ছেলে মীর জুমলা। আসাম আক্রমণ করার সময় অসুস্থ হন। তাঁর বহু সৈন্য তখন পীড়িত হয়ে মারা

যায়। মীর জুমলা ঢাকার কাছে অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। ঢাকাতে এখনো মীর জুমলার কামান রয়েছে। সেই কামানের নাম কালে জমজম খাঁ।

সেই পাগলার সেতু থেকে এক মাইল দক্ষিণে পেলেন কদমতলী নদী। নদীর তীরে উঁচু মিনার। সেখানে ঝুলছে মানুষের মাথার খুলি। কোনো তান্ত্রিক সাধুর আখড়া নয়। তাঁর মতে এগুলো জলদস্যুদের মাথা। গ্রামবাসীরা তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই শাস্তি দিয়েছে। হার্মাদদের আক্রমণে তখন বাংলার গ্রামগুলো আতঙ্কে থরথর করে কাঁপত। কালো রাত মশালের দাউদাউ আগুনে টকটকে লাল হয়ে যেত।

বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনী অনেক চমৎকার। ঝরঝরে ভাষাতে লেখা। তাঁর লেখা থেকেই সতেরো শতকের ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা এই উপমহাদেশের জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর নিপুণ লেখার মাঝ দিয়েই ইউরোপে মোগল দরবারের অন্তরঙ্গ বিবরণ প্রবেশ করে। বারো বছর তিনি এই অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। ফরাসি দেশের সম্রাট তখন দ্বাদশ লুই।

প্যারিস থেকে তিনি রওনা দিয়েছিলেন লোহিত সাগর যাবেন বলে। উত্তাল নীল সমুদ্র এবং নারকেল গাছের সারি-ঘেরা দ্বীপ তখন পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। শহরের ভিড়ের বাইরে তারা যেতে আকুল। মৎস্যজীবীদের গল্পে শোনা যায় দক্ষিণ প্রদেশের সুগন্ধি মসলা, তেলভরা এক দারুচিনি দ্বীপের কথা। যার বালুর মধ্যে ঝলসায় বহুমূল্য মণি। সেইখানে আছে এক পাখি যার ডানা মাটিতে ছড়ানো থাকে। ঠোঁট দিয়ে বিশাল গাছের মাথা ছিঁড়ে আনতে পারে। শামুকের রস মাখা যেন তার পালকের রঙ। এইরকম রহস্যময় হাতছানিতে বের হয়ে সামুদ্রিক বাতাসে পাল তুলে দিয়েছে তখন অভিযাত্রীরা। বার্নিয়েরের ইচ্ছে লোহিত রাজধানী কায়রোতে কাটাবেন এক বছর। তারপর ঠিক করলেন ইথিওপিয়া যাবেন।

তিনি লিখেছেন : 'আমাকে বলা হল, আজকাল ক্যাথলিকদের পক্ষে সে দেশে যাওয়া নিরাপদ না। রানী-মা'র চক্রান্তে পর্তুগিজরা নিহত হয়।'

তাই তিনি মোগল বাদশাহের সাম্রাজ্যে আসার ইচ্ছে করলেন। ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে এলেন সুরাট বন্দরে।

তখন দিল্লির সম্রাট শাহজাহান। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। জরা আর ব্যাধিতে আক্রান্ত সম্রাট। সম্রাটের অসুস্থতার সুযোগে যুবরাজেরা ক্ষমতার জন্য গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে। চিকিৎসক হিসেবে বার্নিয়েরের সুনাম ছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের মোপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেছিলেন। মোগল বাদশাহের চিকিৎসক হিসেবে আট বছর কাটালেন। সম্রাটের পরিবারকে দেখলেন খুব কাছ থেকে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আত্মজীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। ভাষার লালিত্যে এবং নিপুণ বর্ণনার গুণে বিভিন্ন এলাকা যেন ছবির মতো ফুটে উঠল তার কাছে। বার্নিয়ের এতে অনুপ্রাণিত হলেন বিভিন্ন এলাকা দেখার জন্যে।

বাবর এক স্থানে বিবরণ দিচ্ছেন :

> 'আমি যখন ইস্তাদারের এক ক্রোশের মধ্যে এলাম, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার নযরে পড়ল। দেখলাম এই সরোবর ও আকাশের মধ্যে মাঝে মঝে লালরঙের কিছু একটার আবির্ভাব হয়, আবার রঙটা মিলিয়ে যায়। আমরা আরো কাছে এসে বুঝলাম এ-রঙের সৃষ্টি হয় বুনোহাঁস দ্বারা। দশ হাজার, বিশ হাজার নয়, গণনার অতীত অসংখ্য হাঁসেরই সৃষ্টি এই রঙ। ওরা উড়বার সময় ওদের পাখার নিচের লাল রঙ কখনো দেখা যায়, কখনো দেখা যায় না। কেবল বুনোহাঁস নয়, অন্যরকম অসংখ্য পাখিও সে সরোবরের পাড়ে গিজগিজ করে। সরোবর তীরের অসংখ্য স্থানে তারা ডিম পেড়ে রাখে। এখানে দেখা গেল যে কয়েকজন আফগান পাখির ডিম কুড়াচ্ছে।'

চিকিৎসক বার্নিয়ের প্রবেশ করেছেন মোগল অন্তঃপুরে। তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছে এক রহস্যময় পৃথিবী। বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে আওরঙ্গজেব কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছিলেন। পারিবারিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের শিকার হয়েছিলেন হতভাগ্য দারা। দিল্লির রাস্তা দিয়ে দারার শেষ যাত্রা নিজে দেখেছেন বার্নিয়ের। সেই শোকাবহ যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে তিনি :

> 'তাঁকে বসানো হল এক বুড়ো জিরজিরে হাতির ওপর। নোংরা ও ইতর প্রাণীটার পিঠে পাতা ছিল এক ছেঁড়া কম্বল। দীন এক আসন। তাঁর একমাত্র বস্ত্র ছিল মোটা কাপড়ের এক ময়লা সাদা জামা আর পাগড়ি, আর সস্তা এক শাল, চাকরেরা যেমন পরে। রাস্তার দু'ধারের ছাদ আর দোকান থেকে আসছিল শুধু রোদন আর বিলাপ। স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড় হু-হু করে কাঁদছিল।'

বাংলাদেশে তখন জলদস্যুদের প্রচণ্ড উপদ্রব ছিল। তাদের বলা হত হার্মাদ। শব্দটি এসেছে আরমাডা থেকে। পর্তুগিজ জলদস্যুদের ফারাঙ্গিয়ান-ই-হার্মাদ বলা হত। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আরমাডার অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয়। বার্নিয়ের জলদস্যুদের আক্রমণের বিবরণ দিয়েছেন। তারা এসেছিল গোয়া, সিংহল, কোচিন ও মালাক্কা থেকে। তারা ছিল সেসব পর্তুগিজ-অধিকৃত এলাকার পলাতক খুনি।

পরস্পরকে তারা হত্যা করত। বিষ খাওয়াত, নিজেদের যাজকদের পর্যন্ত বধ করত। বাজার, বিয়েবাড়ি, এমনকি গোটা এক গ্রাম পর্যন্ত তারা আক্রমণ করত। সবাইকে নিয়ে যেত বন্দি করে, যা লুট করতে পারত না, তা পুড়িয়ে ফেলত।

খাদ্যদ্রব্যের প্রতি উৎসাহী ছিলেন বার্নিয়ের। ফরাসি দেশে রান্না রীতিমতো শিল্পকলার পর্যায়ে। তাই বার্নিয়ের এই অঞ্চলের রান্নার পদ্ধতি দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বার্নিয়ের লিখেছেন :

> 'চালের সাথে ঘি আর চার-পাঁচ রকমের মটরশুঁটি দিয়ে এখানে একরকমের খাদ্য তৈরি হয়। এটি অতি সাধারণ লোকের খাদ্য। বলতে গেলে একরকম বিনেপয়সায় এরকম খাবার পাওয়া যায়। এক টাকায় কুড়িটি অথবা তার চাইতেও বেশি মোরগ কিনতে পাওয়া যায়। এ দামে সমান সংখ্যক হাঁসও পাওয়া যাবে। টাটকা এবং লোনা মাছও পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়। এককথায় বাংলা প্রাচুর্যের দেশ।'

বঙ্গোপসাগরের মোহনার দ্বীপগুলোতে ভ্রমণ করেছিলেন বার্নিয়ের। সুন্দরবনের রহস্যময় প্রকৃতি তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বনমোরগের কথা লিখেছিলেন। কাঠুরে, বাওয়ালী ও মৌয়ালীরা বিভিন্ন কাজে যায় সুন্দরবনে। তাদের অনেকের থাকে আবার নানা রকমের মানত। সেই মানতের জন্যে মোরগ-মুরগি বনে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের কথা লিখেছেন বার্নিয়ের : 'প্রায়শই এরা অতর্কিতভাবে হামলা করে বসত। আমি এরূপ বলতে শুনেছি যে, বাঘের সাহস এত বেড়েছে যে এরা নৌকা থেকে ঘুমন্ত লোকদের মধ্য থেকে সবচাইতে তাগড়া জোয়ানদের বেছে তুলে নিয়ে যায়।'

ভাটি বাংলায় তখন হার্মাদের আক্রমণ। লুণ্ঠিত জনপদ। নিষ্ঠুর অত্যাচারের নানা কাহিনী। বার্নিয়ের সমুদ্র-উপকূলের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে শুনেছেন সেইসব বীভৎস অত্যাচারের বর্ণনা। বন্দিদের হাতের তালুতে একেকটা ছিদ্র করে দিত জলদস্যুরা। ছিদ্র করা হত লোহার শলাকা দিয়ে। তারপর হালসি দিয়ে গাঁথা হত তাদের। বন্দিদের তখন পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে ফেলা হত জাহাজের পাটাতনে।

১৬৩২ সালে বাংলার সুবেদার ছিলেন কাসিম খান জুইনী। দিল্লি সম্রাটের আদেশে হুগলির পর্তুগিজ উপনিবেশ আক্রমণ করেছিলেন তিনি। জলদস্যুদের ছিল মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত নৌবহর। তখন নোয়াখালী অঞ্চলের নাম ভুলুয়া। সন্দ্বীপ পার হয়ে হার্মাদরা এসে হাজির হত পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমস্থল—সংগ্রামগড়ে। সেই সংগ্রামগড় থেকেই তারা দিক নির্ধারণ করে রওনা হত। কখনো যেত ধূমঘাট, ভূষণা, হুগলির দিকে। কখনো যেত বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, ঢাকার দিকে।

বাংলাদেশে তখন পায়রা এবং ঘুঘু বিক্রি হত। এসব পাখির ঝলসানো মাংস ছিল উপাদেয়। মেঘনা নদীর তীরের বাজারে লবণ-মাখা গরুর গোশত বিক্রি হত। মর্তমান কলা ছিল সুমিষ্ট। আতাফল দেখতে খরমুজের মতো। বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের কমলালেবু পছন্দ করতেন। নারাঙ্গীর চাইতে সেগুলো ছিল নরম আর সরস। মোগল দরবারে রামরঙ্গি নামে এক উৎসব হত। সেখানে পরিবেশন করা হত কমলালেবুর রস।

দিল্লির বাজার সম্পর্কে বার্নিয়েরের মন্তব্য :

> 'দিল্লিতে ভালো পাঁউরুটি হয় না, ওদের আমও নাকি বাংলাদেশের আমের মতো সুস্বাদু নয়। মাছের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রডিয়া ও শিংগোলা। মেষের আর গরুর গোশত, বিশেষ করে মেষের গোশত যদিও সুস্বাদু, গুরুপাক। তবে সত্যিকার খাদ্য হল ছাগশিশু। দোকানে কিন্তু তা প্রায়ই পাওয়া যায় না। গোটা আর জ্যান্ত জীবটাকে কিনতে হয়। কসাইখানায় যা মেলে তা হল বড় বড় আর বেশিরভাগ রুগ্ণ ও শক্ত ছাগলের মাংসের টুকরো।'

হরিণের গোশতের প্রতি তখন মানুষ আগ্রহী ছিল। লাল হরিণকে বলা হত আরকারগলচা। শরৎ ও বসন্তকালে এই হরিণ নির্দিষ্ট পথে শীতের পাহাড় থেকে গ্রীষ্মের পাহাড়ে যায়। শীতের শেষভাগে বারান নদীতে অসংখ্য হাঁস দেখা দেয়। এগুলো খুবই মোটা।

গোশতের পাশাপাশি মাছও প্রিয়। শরৎকালে যখন কুলান কুরগী নামের গাছে ফুল ও বীজ হয় তখন লোকে এর বিশ-পঁচিশ বোঝা ডাল নিয়ে নদীর পানিতে ফেলে দেয়। সেই ডালের কষে পানিতে মাছের নেশা হয়ে যায়। সেই নেশায় মেতে তখন মাছগুলো ঘোরাফেরা করতে থাকে। তখন লোকজন মাছ ধরে ফেলে। অনেক লোক তালগাছের পাতা দিয়ে জাফরী-কাটা জাল বোনে ও পানিতে সেই জাল ফেলে মাছ ধরে। তারা গুলবাহার পারওয়ান ও ইস্তলিক নদীতে এ কৌশলে মাছ ধরে।

বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীতে সেই আমলের জীবনধারার নানা ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

কে কোথায় কবে প্রথম দর্পণের ব্যবহার করেছিল?

তোমরা আজকাল সকলেই আয়নায় মুখ দ্যাখো। আয়নাকে আমরা বিশুদ্ধ ভাষায় দর্পণ বলি। ধাতু দ্বারা নির্মিত দর্পণের প্রচলন সবদেশেই অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। যিশুখ্রিস্টের জন্মের সে প্রায় চতুর্থ শতাব্দী পূর্বে ধাতুনির্মিত দর্পণ ব্যবহারের প্রচলন ইউরোপে ছিল। কিন্তু মুখ দেখার আয়না বা দর্পণের (যার পশ্চাতে পারদ মাখানো থাকে) ব্যবহার ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভেনিস নগরে হয়েছিল। লন্ডনে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ হতে এর ব্যবহার শুরু হয়।

ভিয়েতনামের রূপকথা

সোনার পাহাড়

অনেক, অনেক দিন আগের কথা।

তারা ছিল দু'ভাই। দু'জনেই ছেলেমানুষ। আর দুটিতে খুব ভাব। সারাদিন তারা হেসেখেলে বেড়াত। একসঙ্গে ঘুরত এখানে-সেখানে। আপনার বলতে তাদের আর কেউ ছিল না। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি অনেক। তাই তাদের দিন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দে চলে যেত।

এমনি করে অনেকদিন কাটল। কত মাস গেল—কত বছর ঘুরল। বড় হল দু'ভাই।

এখন আর তারা খেলে না। হেসে-খেলে বেড়াবার দিন আর নেই। সে বয়েস চলে গেছে তাদের। যে বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তা এবার দু'জনের মধ্যে ভাগ করে নেবার কথা হল। কিন্তু এই সম্পত্তি ভাগ করবার ব্যাপারে দেখা গেল যে, তাদের মন আর ছোটবেলার মতোন নেই।

ছোটভায়ের মনটি যেমন সরল, তেমনি তার মধ্যে লোভ একেবারেই ছিল না।

কিন্তু আর এক ভায়ের মন সেরকম নয়। বরং ঠিক উল্টো।

সেই বড়ভাই বিষয় ভাগ করবার কথা তুলল। শুনে ছোটভাই বলল, 'তা বেশ তো। এর আর ভাগ করবার কী দরকার। আমি শুধু ওই কুঁড়েঘরটি নেব। আর তার সামনের এই জায়গাটুকু। আমার আর কিছু চাই না। আর সব তুমি নাও।'

বড়ভাই অন্য বাড়ি-ঘর জমি-জায়গা সমস্ত নিল। এইসব নেবার তার খুব ইচ্ছে ছিল মনে-মনে। ছোটভাই তা জানতে পেরে সব তাকে দিয়ে দিল। বড়ভাই খুব খুশি। ছোটভাইকে আর সে কিছুই দিতে চাইল না। সে-ও শুধু কুঁড়েঘরখানি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রইল।

তারপর কেটে গেল আরো কিছুদিন।

তাদের দু'ভায়ের একে একে বিয়ে হয়ে গেল।

বড়ভাই এখন বড় বাড়িতে খুব ধুমধাম করে থাকে। তাদের আয় যেমন বেশি, তেমনি আড়ম্বরও খুব। তার আর তার বৌয়ের মনে তাই ভারি অহংকার। নিজেদের বিষয়ে তাদের খুব উঁচু ধারণা। ছোটভাইকে তারা মানুষ বলেই মনে করে না।

কিন্তু ছোটভায়ের সেজন্যে মনে কোনো দুঃখ নেই। আর তার বৌও হয়েছে তেমনি। নিজেদের অবস্থায় তারা বেশ সুখী হয়েই আছে। বড়ভায়ের ঐশ্বর্য দেখে তাদের মনে হিংসেও নেই, কষ্টও নেই। কুঁড়েঘরখানিতে তারা বেশ শান্তিতে থাকে।

তাদের কুঁড়েঘরের সামনে একটুখানি জায়গা। সেই জমিতে একটি গাছ আছে। সেই গাছে ফল ধরে। আর সেই ফল খেয়ে থাকে ছোটভাই আর তার বৌ। আর কোনো অভাববোধ তাদের নেই। ওই একটি গাছের ফলেই তাদের অভাব মেটে।

এমনি করে তাদের দিন চলে যায়।

একদিন হল কি, প্রকাণ্ড এক পাখি কোথা থেকে উড়ে এল। আর সেই গাছের ডালে বসে তার ফল খেতে লাগল টপাটপ করে।

দেখে ছোটভাই আর তার বৌয়ের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ওই গাছটি থেকেই তাদের দিন কোনোরকম চলে। ওই গাছের ফল খেয়ে বেঁচে আছে তারা। আর তাদের সেই মুখের গ্রাস পাখিটা খেয়ে নিচ্ছে। এমন করে ফলগুলো খেয়ে ফেললে, তাদের কী করে চলবে?

কিন্তু তাদের মন বড় ভালো। তাই পাখিকে কিছু বলতেও পারল না আর তাড়িয়েও দিল না। আহা, বেচারির খুব খিদে পেয়েছে বলেই না খেতে এসেছে। তা খাক। আমাদের না হয় একটা দিন কষ্টেই কাটবে। কী আর করা যায়?

এই ভেবে পাখিকে তারা কোনোরকম বাধা দিল না। সে নিজের মনে অনেকগুলো ফল শেষ করে উড়ে চলে গেল। ছোটভাই আর তার বৌয়ের দিকে দেখলও না চেয়ে। বুঝতে পারল না, বেচারিদের কী ক্ষতিটা সেদিন হল!

পরের দিন সেই প্রকাণ্ড পাখিটা আবার হাজির হল। আর গাছের ফলগুলো খেয়ে নিতে লাগল ডালে বসে।

দেখতে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু তবু তাড়াতে পারল না পাখিটাকে। ভাবল : আর কোথাও কিছু খেতে পায়নি বলেই এখানে খেতে এসেছে। তাড়িয়ে দিলে হয়তো না-খেয়ে থাকবে। সেটা কি ভালো?

কিন্তু এদিকে তাদের নিজেদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। আগের দিন পাখি প্রায় অর্ধেক ফল খেয়ে গেছে। তার ওপর এখন এমন করে খেলে ফল আর কিছুই বাকি থাকবে না। তখন তাদের কী উপায় হবে?

এইসব কথা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু পাখিটাকে দূর করে দিতে পারল না কিছুতেই।

ওদিকে, গাছের ওপর থেকে পাখি তাদের কথা খানিক খানিক শুনতে পেল। শুনে সেই পাখি বলল : 'আমি ফল সব খেয়ে নিচ্ছি দেখে তোমরা বড় ভয় পেয়েছ, না? তবে এতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, জেনো।'

তখন স্বামী-স্ত্রী পাখিকে মানুষের মতোন দিব্যি কথা বলতে শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা আরো অবাক হল যে পাখিটা তাদের কথা আর মনের ভাব সব বুঝতে পেরেছে!

পাখির কথার কী উত্তর দেবে, তারা হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। ক্ষতি যে তাদের কতখানি হয়েছে, পাখি তার কী বুঝবে? কিন্তু তাকে সেকথা বলে লাভ কী!

এইসব তারা দু'জন ভাবছে। এমন সময় পাখি আবার বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তোমরা মনে করছ, আমি মিথ্যে আশা দিয়ে তোমাদের সব ফল খেয়ে পালিয়ে যাব। কিন্তু তা নয়। তোমাদের গাছের ফল আমার ভারি ভালো লেগেছে। আর তোমরাও দেখছি খুব ভালো লোক। আমাকে ফল খেতে দেখেও মারলে না, কিছুই করলে না। তাই তোমাদের এই ক্ষতির বদলে আমি সাধ্যমতো উপকার করব। আমি তোমাদের এত দিতে পারি যা তোমরা এখন ভাবতেও পারবে না।'

এই বলে সে তাদের দিকে একবার মুখ নিচু করে দেখে নিল। কিন্তু তাদের মুখে তবু কোনো উত্তর জোগাল না।

তখন পাখি আবার বলল, 'আচ্ছা, শোনো বলি। যত ফল আমি খেয়েছি, চাও তো তত ওজনের সোনা আমি দিতে পারি। বিশ্বাস না হয়, কালই আমি তা দেব। তবে তোমাদের একটু কষ্ট করতে হবে। যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

এই বলে আবার নিচে তাদের দিকে চাইল সে।

শুনে ছোটভাই কোনোরকমে বলল, 'এ আর কষ্ট কী? যদি বলো, তোমার সঙ্গে কাল যাব।'

তখন পাখি বলল, 'আর একটা কাজ করতে হবে। একটা থলি তৈরি করে রেখো, সোনা আনবার জন্য। কাল আমি এই সময় আবার আসব। তারপর তোমায় নিয়ে যাব এক জায়গায়। থলি ভর্তি করে তুমি যত খুশি সেখান থেকে সোনা নিয়ে আসবে।'

ছোট ভাই বলল, বেশ, কাল আমি থলি নিয়ে বসে থাকব তোমার পথ চেয়ে।

পাখি বলল, 'আচ্ছা, কাল আমি ঠিক এই সময়ে আসব।'

এই বলে আর একটা ফল ঠোঁটে নিয়ে উড়ে গেল। তখন স্বামী-স্ত্রী বলাবলি করতে লাগল : পাখি যা বলল, তা কি সত্যি? এও কি হতে পারে যে, থলি-ভর্তি সোনা তার সঙ্গে গেলে পাওয়া যাবে! নাকি পাখিটা তাদের গরিব দেখে ঠাট্টা করে গেল?

যা হোক, কাল তো সবই বুঝতে পারা যাবে। তবে যখন এত করে বলে গেল তখন থলি একটা জোগাড় করে রাখা উচিত।

এইসব ভেবে, একটা মাঝারি মাপের থলি তারা তৈরি করল। দেখা যাক, কী আছে বরাতে!

পরের দিন পাখি ঠিক সময়ে এল। তারপর সেই গাছের ডালে বসে গোটাকতক ফল খেল।

ততক্ষণে ছোটভাই এসে দাঁড়িয়েছে গাছের নিচে।

তার দিকে চেয়ে পাখি বলল, 'এবার চলো তাহলে। থলি আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' বলে সে কুঁড়েঘরের ভেতরে গিয়ে থলি নিয়ে এল।

তখন পাখি মাটিতে নেমে এসে বলল, 'আমার পিঠে ওঠো। এখন যাব।'

ছোটভাই থলি নিয়ে তার পিঠে চেপে বসল। আর সেই প্রকাণ্ড পাখি তার মস্ত দুই ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে।

উড়তে উড়তে পাখি সমুদ্র পার হয়ে চলে গেল। শেষে নামল গিয়ে একটা দ্বীপে।

তারপর বলল, 'এই নাও। যত খুশি থলি ভর্তি করে নিয়ে যাও। এখানে কেউ বারণ করবার নেই।'

তখন পাখির পিঠ থেকে নেমে, চারদিক দেখে তো তার মাথা ঘুরে গেল। পাখি তাহলে সত্যিকথাই বলেছিল। ওঃ,

একী কাণ্ড! চারদিকে যত পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সব সোনার! সে যে কত সোনা, তার আর ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া, কত রকমের সব মণি-মুক্তো-হীরে এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে। চুন্নি পান্না আরো কী কী দামি দামি পাথর! সে নামও জানে না সেসবের। আর সোনার শুধু পাহাড় নয়, ছোট বড় নানা গড়নের কত সোনার তাল যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, গুনে শেষ করা যায় না!

দেখতে দেখতে সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ সবের মধ্যে সে যে কী নেবে আর কী রাখবে, তা ঠিক করাই দায় হল তার পক্ষে।

তখন পাখি তার অবস্থা বুঝে বলল, 'অত ভাবছ কী? থলিতে যা ধরে নিয়ে নাও না যত ইচ্ছে। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! তোমাকে তো বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

পাখির কথা শুনে সে সোনা আর হীরে-মুক্তো যা সামনে পেল থলি-বোঝাই করে নিল।

তারপর পাখি আবার তাকে পিঠে চাপিয়ে উড়ে চলল আকাশে। উড়তে উড়তে সমুদ্র পার হয়ে এসে আবার তার কুঁড়েঘরের সামনে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সেই একদিনেই ভাগ্য ফিরল ছোটভাইয়ের। এক বস্তা হীরে-সোনা-মুক্তো একেবারে বদলে দিল তার অবস্থা। কিন্তু তার মনের কোনো পরিবর্তন হল না। শুধু গাছের ফল খেয়ে যখন দিন কাটত তখন যেমন স্বভাব ছিল, এত ঐশ্বর্য পেয়েও তেমনই রইল—তেমনি সরল আর অমায়িক। আর সবসময় মনের সেই সন্তুষ্টি-ভাব।

তাছাড়া তার কিংবা তার বৌয়ের অহংকারও মোটেই হয়নি। তাই তাদের ব্যবহার দেখে বোঝা যেত না, তাদের অবস্থা কতটা ভালো হয়েছে। তারা যে হঠাৎ এতখানি ধনী হয়ে গেছে তা বাইরে থেকে অনেকে ভাবতে পারত না। যদিও তারা কিনেছে নতুন বাড়ি।..

তারপর ছোটভায়ের একদিন ইচ্ছে হল, বড়ভাই আর তার বৌকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে।

তাই সেদিন বড়ভায়ের বাড়িতে গেল সে নেমন্তন্ন করতে। নেমন্তন্নের কথা শুনে কিন্তু স্বামী-স্ত্রী মনে মনে ভারি বিরক্ত হল। ছোটভায়ের নতুন বাড়িতে যেতে তাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তার যে অবস্থা হঠাৎ এত ফিরে গেছে এটা তাদের খুব খারাপ লাগছিল। আর এখন তার বাড়ি গিয়ে সেই ঐশ্বর্য দেখতে হবে, এই চিন্তাতেই তাদের মন ভরে উঠছিল হিংসায়। কিন্তু 'যাব না' বললে বড়ই খারাপ শোনায়।

তাই যাওয়াটা কোনোরকমে বন্ধ করবার জন্যে বড়ভাই বলল, 'দেখো, যেতে পারি, যদি তুমি একটা কাজ করতে পারো। তোমার বাড়ি থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা একটা লাল কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিতে পারো। যদি পারো তাহলেই আমি যাব।'

ছোটভাই বলল, 'আচ্ছা বেশ, তাই হবে।'

তখন বড়ভায়ের বৌ বলল, 'আর আমি যেতে পারি, যদি আমার জন্যে একটা কাজ করো। তোমার বাড়ির বাইরে সমস্তটা সোনার জলে রঙ করে দিতে হবে। তবেই তো আমি যাব ওখানে।'

শুনে ছোটভাই বলল, 'আচ্ছা বেশ, তাই হবে।' বলে চলে এল।

বড়ভাই আর তার বৌ ভেবেছিল, ছোট ভাই তাদের কথায় রাজি হবে না। কারণ এতখানি খরচ করা তার ক্ষমতার বাইরে।

কিন্তু তাদের কথায় তাকে তখনি রাজি হয়ে যেতে দেখে ধরে নিল যে সে অতি নির্বোধ!—জানে না, তাদের কথামতো সব করতে গেলে কত অনর্থক খরচ হয়ে যাবে।

তাই তারা নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করতে লাগল ছোটভায়ের এই কাণ্ড দেখে। তাদের মনে হল, ওর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর নয়তো বেচারি বোকা গাধা! না হলে এমন বাজে খরচে এককথায় রাজি হয়ে গেল। এ বাড়ি থেকে ওর নিজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় বিছিয়ে দেবে লাল কার্পেট? ঘরের বাইরে আগাগোড়া সোনার জলে রঙ করে দেবে? এই দুটোই তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলেও তার পক্ষে শুধু শুধু এতটা খরচ করা উচিত নয়। অথচ দুটোই সে করবে বলে গেল। নির্বোধ আর কাকে বলে।...

কিন্তু, কী আশ্চর্য! সত্যিই বড়ভায়ের বাড়ির দরজা থেকে নতুন বাড়ি পর্যন্ত আগাগোড়া লাল কার্পেট পাতা হয়ে গেল। তখন আর সে কী করে? আসতেই হল ছোটভায়ের সেই নতুন বাড়িতে।

সেখানে এসে আবার অবাক হতে হল। বড়বৌ বলেছিল, বাড়ির বাইরেটা আগাগোড়া সোনার জলের রঙ করে দিতে।

ছোটভাই তাও করেছে। আবার তার চেয়েও বেশি। বাড়ির ভেতরকার সমস্ত দেয়াল আর সব ঘর পর্যন্ত সোনার জলে জ্বলজ্বল করছে।

এসব দেখে বড়ভাই আর তার বৌ একেবারে হকচকিয়ে গেল। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! কী করে ও এমন তাড়াতাড়ি এত টাকা রোজগার করল? ওর তো কিছুই ছিল না। ঘরের জন্যে এত দামি সব আসবাবপত্রই-বা কিনল কী করে?

তারপর খেতে বসে দেখল, খাওয়ার আয়োজনও প্রচুর। এখানে এত ভালো ভালো আর দামি খাবার পাবে, এও তারা একেবারেই ভাবতে পারেনি। ও তাহলে সত্যিই অনেক টাকা করেছে। এবার আর তারা মনের ভাব চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'কী করে এত টাকা রোজগার করলে? আর এত কম সময়ের মধ্যে?'

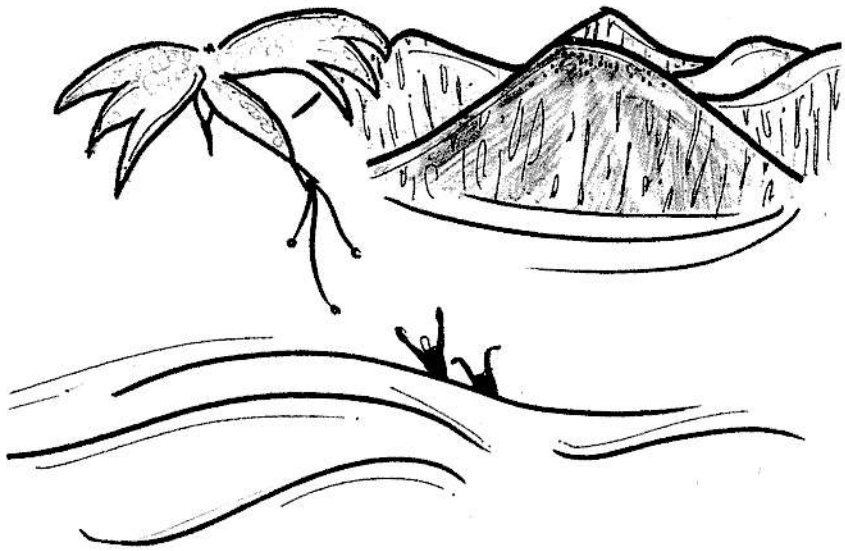

ছোটভায়ের সরল মন। সে তখন বড়ভাইকে সব কথা একে একে বলে ফেলল। সেই প্রকাণ্ড পাখির গাছ থেকে ফল খেয়ে নেওয়া, তারপর তার সঙ্গে কথা বলা, শেষে তার কথামতো পিঠে চেপে সোনার পাহাড়ের দ্বীপে যাওয়া আর সেখান থেকে থলি ভর্তি করে হীরে-মুক্তো-সোনা নিয়ে আসবার সমস্ত ঘটনাই সে বড়ভাইকে বলল।

শুনে বড়ভাই আর তার বৌ হিংসায় জ্বলতে লাগল মনে-মনে।

ভালো করে তারা আর খেতেও পারল না। ছোটভাইয়ের এইরকম অদ্ভুতভাবে এত সোনাদানা পাওয়ার কথা কেবলই বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। আর কী করে নিজেরাও অমনিভাবে সোনা পেয়ে যেতে পারে, রাতদিন তাদের হল সেই চিন্তা।

শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে অনেক পরামর্শ করে, অনেক মাথা খাটিয়ে বড়ভাই ছোটভাইকে ডেকে বলল, 'দেখো ভাই। তোমার এমন ভালো অবস্থা হয়েছে, আমি তো তার কিছুই জানতুম না। কিন্তু দেখে আমাদের বড়ই আনন্দ হয়েছে। তা তোমার তো কোনোকিছুর অভাব নেই। ভালো বাড়ি থেকে আরম্ভ করে ভালো ভালো জিনিসপত্র সবই এখন তোমার আছে। এখন আমি একটি জিনিস তোমার কাছে চাইছি। দেবে তো, ভাই?'

ছোটভাই জিজ্ঞেস করল, 'কী জিনিস, দাদা? যদি আমার সাধ্য থাকে, নিশ্চয় দেব।'

তখন বড়ভাই বলল, 'ভাই এ কিছু দামি জিনিস নয়। তোমার ওই কুঁড়েঘরটা আর তার সামনের জায়গাটুকু আমায় দাও। এটা আর তোমার কিছু কাজে লাগবে না। এইটুকু আমি তোমার কাছে চাইছি।'

শুনে ছোটভাই বলল, 'তা বেশ তো, নিও।'

তারপর সেই কুঁড়েঘর আর তার সামনের জায়গাটা বড়ভাইয়ের হয়ে গেল। সে তখন রোজ এসে এসে দেখত, সেই প্রকাণ্ড পাখিটা আসছে কিনা।...

একদিন পাখিকে এসে ফল খেতে দেখে বড়ভাই গাছের নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার আমাকেও সেই দ্বীপে নিয়ে যাবে তো?'

পাখি বলল, 'আচ্ছা, নিয়ে যাব। কাল থলি তৈরি করে রেখো। আমি ঠিক এই সময় এসে নিয়ে যাব।'

এই বলে, ফল খাওয়া সেরে পাখি উড়ে গেল।

তখন স্বামীর মুখে সব কথা শুনে বড়বৌ বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তাহলে দু'জনে মিলে দু'গুণ সোনা-হীরে আনা যাবে।'

সে রাতে জল্পনা-কল্পনা করতে করতে তাদের ঘুমই হল না। ছোটভাই গিয়েছিল একটা থলি নিয়ে। তারা তাই আরো ধনী হবে বলে দুটো থলি তৈরি করল। আর তাও খুব বড় বড়—দুটো মস্ত বস্তা।

পরের দিন পাখি ঠিক সময়ে এল, আর ফল যা খাবার খেয়ে নিয়ে বড়ভাইকে বলল, 'এবার চলো আমার পিঠে চেপে।'

তখন বড়ভাই আর তার বৌ দু'জনে তার পিঠে উঠল, সঙ্গে দুটো বস্তা নিয়ে। আর পাখি তাদের নিয়ে আকাশে উড়ে চলল। উড়তে উড়তে সমুদ্র পার হয়ে, তাদের নিয়ে এল সেই দ্বীপে।

তারা দ্বীপের কথা ছোটভাইয়ের মুখে সবই শুনেছিল। না হলে, এইসব সোনার পাহাড় আর হীরে-মুক্তো-সোনা এত এত পড়ে থাকতে দেখলে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যেত।

যাই হোক, স্বামী-স্ত্রী মিলে তো সেই প্রকাণ্ড দুটো বস্তা ভর্তি করে নিল সোনা-হীরে-মণি-মুক্তো দিয়ে। তা ছাড়া দু'জনে তাদের জামা আর কাপড়চোপড়ের মধ্যেও যত পারল ভরে নিল।

তারপর সবশুদ্ধ নিয়ে পাখির পিঠে চেপে বসল, বাড়ি ফেরবার জন্যে। আর পাখি তাদের নিয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করল।

এখন, একে তো তারা দু'জনে পাখির পিঠে চেপেছে, তার ওপর দুটো বড় বস্তা বোঝাই করে নিয়েছে সোনা আর মণি-মুক্তো-হীরে। তা ছাড়া দু'জনের জামা-কাপড়ের মধ্যেও যতটা ধরে নিয়েছে। তাই উড়তে উড়তে পাখির বিষম ভারী লাগল পিঠে। এত ভার সে সহ্য করতে পারল না। ডানা মেলতে তার কষ্ট হতে লাগল।

পাখি শেষে আর সইতে না পেরে পিঠ থেকে ফেলে দিল তাদের দু'জনকে। ঠিক সেই সময় তারা সমুদ্র পার হচ্ছিল। তাই পাখি পিঠ ঝাড়া দিতেই তারা পড়ল সমুদ্রের অগাধ জলে। আর বস্তাদুটো আঁকড়ে ছিল বলে সেইসব সোনা-হীরে-মণি-মুক্তো নিয়ে একেবারে তলিয়ে গেল। ধন-প্রাণ সব গেল তাদের অতি লোভের ফলে।

পাখির দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর কেন?

পাখিকে উড়তে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার দৃষ্টিশক্তি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় পাখির চোখ খুবই ছোট। কিন্তু পাখির চোখ অনেক বড়। পাখির চোখ এত বড় যে, মাথার খুলির বেশির ভাগ অংশজুড়েই রয়েছে চোখ। আমাদের চোখের দুইটি পর্দা। কিন্তু পাখির চোখে তিনটি পর্দা। আকাশে উড়ার সময় তৃতীয় পর্দা, মোটরগাড়ির কাচ মোছার যন্ত্রের মতো উপরে-নিচে ওঠানামা করতে থাকে। এইজন্যই পাখির দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর।

ডা. শুভাগত চৌধুরী

শরীর এক রহস্যময় দুর্গ

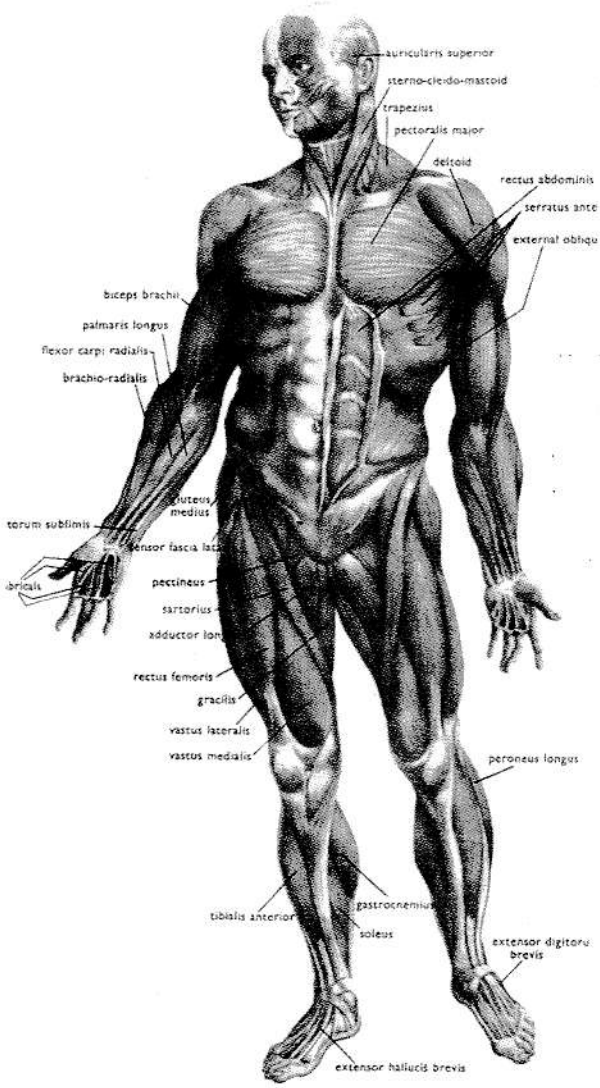

চারদিকে গহিন ঘন অন্ধকার। শরীরের নিবিড়তম অঞ্চলে তখন ছুটে বেড়াচ্ছে একদল সতর্ক প্রহরী। তাদের নাম টি-কোষ।

টি-কোষ হল একরকমের লসিকা-কণিকা বা লিম্ফোসাইট, যা একধরনের শ্বেতকণিকা। তারা দেহের প্রতিরক্ষাবাহিনীর অংশ। শত শত বাহু মেলে তারা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের বাহুগুলো এত সজাগ-সচেতন যে, তাদের সাথে যখনই অন্যান্য কোষের সাক্ষাৎ হয়, তক্ষুনি তারা তাদের আকার-অবয়বকে চিনে ফেলতে পারে। চলমান এই প্রহরীরা যতক্ষণ দেহের ভিতর টহল দিয়ে বেড়াবে, ততক্ষণ দেহের অন্যান্য কোষ নিশ্চিন্ত।

ধরা যাক, হঠাৎ টি-কোষের বাহুগুলোর সাথে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত আকৃতির একটি কোষের ছোঁয়া লাগল। তক্ষুনি তারা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। অদ্ভুত কোষটি ভয়ানক স্বার্থপর এবং রাক্ষুসে স্বভাবের। তার প্রকৃতি হল : আশপাশের স্বাভাবিক কোষগুলোর চারদিকে ভিড় জমানো এবং তাদের সকল

পুষ্টিকে ধীরে ধীরে শুষে নেয়া। টি-কোষরা কিন্তু বসে নেই। মুহূর্তের মধ্যে তারা সতর্ক-ঘণ্টা বাজিয়ে দিল চারদিকে। ঘণ্টা বাজবার সাথে সাথে দেহের প্রতিরক্ষাসেনাদের মধ্যে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। ছুটে এল 'ঘাতক-কোষরা' এবং তাদের সঙ্গী হয়ে এল ম্যাক্রোফেজ নামে আরও একধরনের কোষ, যারা তত চটপটে না হলেও খুব পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। ঘাতক-সেনারা পৌঁছনোর আগেই টি-কোষরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই অদ্ভুত কোষটির উপর। তবে, যুদ্ধে টি-কোষ একা এঁটে উঠতে পারে না। অবশ্য, তিন মিনিটের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায় ঘাতক-সেনা ও ম্যাক্রোফেজরা। তখন তিন দলে মিলে সেই রাক্ষুসে কোষটির দেহের দেয়াল চিরে ফেলল।

দশ মিনিট পর। শত্রুটির দেহের প্রাচীর ততক্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অদ্ভুত রাক্ষুসে কোষটি ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। বিজয়ী যোদ্ধারা বীরদর্পে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলল।

এ কোনো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। দেহের মধ্যে কোনো ক্ষতিকর আগন্তুকের আগমনে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, তারই একটি চিত্র এটি। আমরা জেনেছি, আমাদের দেহের এই প্রতিরক্ষা-সেনারা কী বিশ্বস্ততার সঙ্গেই না আমাদের বাইরের রোগজীবাণুদের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে!

ভাবতে নিশ্চয়ই অবাক লাগে, আমাদের চারদিকে অগুনতি রোগজীবাণু ভেসে বেড়াচ্ছে, আমাদের প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে, কিন্তু আমরা সবসময় রোগাক্রান্ত হচ্ছি কই! কী আশ্চর্য কৌশলেই না দেহ এদের প্রতিহত করে চলেছে! আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে একটি নিপুণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, যা বহিরাগত রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। খুব বেশিদিনের কথা নয়, যখন থেকে আমরা জেনেছি আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এই নাটকীয় লড়াইয়ের খবর : রোগ প্রতিহত করবার জন্য শরীরের অক্লান্ত সংগ্রামের এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

কোনো এক সুদূর সোনালি অতীতে যখন এই পৃথিবীর বুকে জীবনের সূচনা ঘটেছিল, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে তার বেঁচে থাকবার লড়াই, টিকে থাকবার সংগ্রাম। প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক দুর্জয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। সেটা এতই জটিল এবং শক্তিশালী যে, কোটি কোটি বছরের নিরন্তর লড়াইয়ের পরও আমরা বংশপরম্পরায় বেঁচে আছি এবং টিকে আছি।

দেহের এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থাটি পৃথিবীর মতোই পুরোনো হলেও এ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি মাত্র শ-খানেক বছর আগে। ততদিনে বিবর্তনের পথ বেয়ে এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থাটি হয়ে উঠেছে আরও জটিল, পরিপক্ব এবং দুর্জয়। পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব আজও রহস্যে ঢাকা। কী অলৌকিক উপায়ে এর সূচনা হয়েছিল, তা হয়তো কোনোদিন জানা যাবে না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, জীবনের এই অবিরাম বয়ে চলা। আবার, এই পথযাত্রায় যা-কিছু অর্জিত হয়েছে, তাও জীবন রক্ষা করে। জীবন ও প্রতিরক্ষা তাই চলেছে পাশাপাশি।

বেঁচে থাকবার লড়াইয়ে আমাদের পরম শত্রু হল অসংখ্য ক্ষুদ্র রোগজীবাণু—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্রই এদের বাস। এরা নানা উপায়ে আমাদের দেহকে আক্রমণ করে রোগ ঘটাতে পারে। এদের প্রবল আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করবার জন্য দেহের মধ্যে যে দক্ষ প্রতিরক্ষা-সেনানীরা রয়েছে, তাদের কথা জানতে কার না ইচ্ছে হয়!

দেহের এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কথা জানবার আগে কিছু পূর্বকথা প্রয়োজন। আমাদের দেহে জীবাণুর আক্রমণে যে বিপদ ঘটে, তার চেয়েও বড় বিপদ হল আক্রমণের পর তাদের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দেহে ছড়িয়ে পড়া। এর কারণ কী? আমাদের দেহে নিরন্তর অবিরাম দ্রুতগতিতে যে রক্তস্রোত বয়ে চলেছে, তারই মাধ্যমে রোগজীবাণু পলকের মধ্যেই পৌঁছে যায় দেহের প্রত্যন্ত

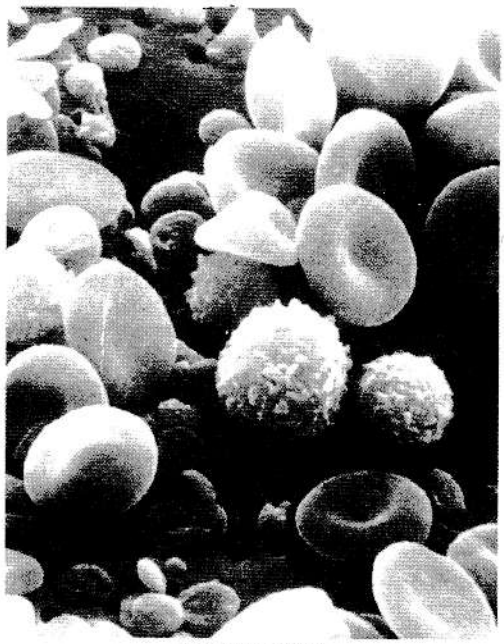

রক্তের শ্বেতকণিকা

অঞ্চলে। গাছপালায় এই রক্ত সংবহনতন্ত্র না থাকাতে তাদের ক্ষেত্রে জীবাণুর সংক্রমণ এভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে না। আমাদের দেহে যে রক্ত রয়েছে, তা প্রতি ১৩ সেকেন্ডে একবার সারাদেহ ঘুরে আসে। প্রায় ৬০ লিটার পরিমাণ রক্ত প্রতি ঘণ্টায় বৃক্কে ও মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয় এবং সেই পরিমাণ রক্ত আবার ফিরে আসে হৃৎপিণ্ডে। সুতরাং কেটে যাওয়া আঙুল থেকে একটি জীবাণুর মস্তিষ্কে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ৪ সেকেন্ড। কী ভয়ানক ব্যাপার, তাই না?

কিন্তু আমাদের দেহে যে রাসায়নিক প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং জীবাণু-বিধ্বংসীরা রয়েছে, তারাও এতই দ্রুতগামী এবং দক্ষ যে, নিমেষেই জীবাণুদের পর্যুদস্ত করতে পারে।

এবার এই প্রতিরক্ষাবাহিনীর জন্মকথা শোনাই। বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো এবং কিছু অক্টোপাসের মধ্যে আমরা পাই আদিম রক্ত সংবহনতন্ত্রের নমুনা। এই রক্তপ্রবাহে পাওয়া যায় আরও প্রাচীনতম একরকমের কোষ, যাদের বিশেষ ধরনের প্রকৃতি রয়েছে। তারা কেঁচোর শরীরে রক্তে ধীরে ধীরে কিছু যেন খোঁজার ভঙ্গিতে চলাফেরা করে এবং সর্বদাই জঞ্জাল তুলে গিলে ফেলে। তাদের আরও একটি কাজ হল কোনো ব্যাকটেরিয়ার সাক্ষাৎ পেলেই আক্রমণ করা এবং জয়-পরাজয় নির্ধারিত না-হওয়া পর্যন্ত অবিরাম লড়াই করে চলা।

উত্তরাধিকারসূত্রে আদিম এই কোষগুলোর যে বংশধরদের আমরা পেয়েছি, তাদের নাম হল শ্বেতকণিকা। দেহরক্ষী বাহিনীর প্রথম প্রতিরক্ষাব্যূহ এরাই গঠন করে। এই শ্বেতকণিকাদের কথা প্রথম বর্ণনা করেছিলেন একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী,—ই. ই. মেচনিকভ (১৮৪৫-১৯১৬), প্রায় একশো বছর আগে। তিনি জীবাণুতত্ত্বের জনক লুই পাস্তুরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতেন। দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম সবাইকে অবহিত করেন।

শ্বেতকণিকারা আমাদের সাথে সাথে অনেক অনেক বছর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে আরও ভয়ানক জীবাণুধ্বংসী, আরও দ্রুত চলমান। এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে জীবাণুধ্বংসী গোলাবারুদের নিজস্ব ভাণ্ডার। এরা আরও দ্রুত জীবাণুকে খেয়ে ফেলতে পারে, আরও দ্রুত

রোগজীবাণুর কাছে চলে যেতে পারে। স্বল্পসময়ের মধ্যে বুঝতে পারে, কোথায় রয়েছে জীবাণুরা এবং তক্ষুনি করে সাবাড়!

জীবাণু ধ্বংস করবার কাজে শ্বেতকণিকাদের আরও একজন সঙ্গী রয়েছে। তার নাম হল ম্যাক্রোফেজ। তারা দেখতে অনেকটা শ্বেতকণিকাদের মতো, কিন্তু আকারে আরও বড় এবং জীবাণুধ্বংসী গোলাগুলির পরিমাণ তাদের মধ্যে বেশি। দেহের দেয়াল তাদের আরও পুরু, টিকে থাকার শক্তি বেশি এবং দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতি আরও বিশাল।

শ্বেতকণিকা ও ম্যাক্রোফেজ ঠিক যেন ছোট আর বড় ভাই।

এরা দু'ভাই-ই জন্ম নেয় অস্থিমজ্জায়। সেখানেই পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে রক্তস্রোতে। হিশেব করে দেখা গেছে, একজন ১৫৪ পাউন্ড ওজনের লোকের দেহে রয়েছে প্রায় ১২৬ বিলিয়ন শ্বেতকণিকা ও ম্যাক্রোফেজ-সেনার এক দুর্জয় বাহিনী। প্রয়োজনে এরা সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এরা কী করে রোগজীবাণুকে সাবাড় করে, সে-কথা আরও চমকপ্রদ। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে এদের ঠিক অ্যামিবার মতো চলাফেরা করতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় খুব ধীরে ধীরে এরা চলতে থাকে,—ঠিক যেন শান্ত সাগরের তীরে একটি শৈবাল চলেছে। এখন, একটি জীবাণু এই পরিবেশে ঢুকলেই ঘটনা অন্যরকম হয়ে ওঠে। শ্বেতকণিকারা সজাগ খরগোশের মতো হঠাৎ যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এক নিশ্চিত প্রতীক্ষা ও সতর্কতা তাদের নাড়া দিয়ে যায়। কোনোকিছুর উপস্থিতি অনুভব করে তারা জীবাণুটির দিকে একে একে চুপিসারে এগিয়ে যেতে থাকে।

দেহের মধ্যেও শ্বেতকণিকারা রক্ত থেকে জীবাণু-সংক্রমণের জায়গায় এইভাবেই এগিয়ে যায়। এদের অনভূতি এত সজাগ যে, মিনিটের মধ্যে এরা জীবাণুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, জীবাণুদের আঁকড়ে ধরে এদের মধ্যে জীবাণুধ্বংসী অ্যানজাইমগুলো ঢুকিয়ে দেয়। তখন জীবাণুরা যেন যন্ত্রণায় গা মোচড়াতে থাকে। তাদের চলাফেরা বন্ধ হয়ে আসে। অবশেষে একসময় তারা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শ্বেতকণিকারা এত মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে এবং এত শক্তি খরচ করে কারণ, এ যুদ্ধ স্বল্পস্থায়ী। অবশ্য, ততক্ষণে এদের বড়ভাই ম্যাক্রোফেজরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। তাদের শক্তি আরও বেশি। জীবাণুধ্বংসী গোলাগুলিও (অ্যানজাইম) তাদের বেশি। তক্ষুনি আক্রমণভাগের দায়িত্ব ম্যাক্রোফেজরা নিয়ে নেয়। শ্বেতকণিকারা পিছু হটে চলে যায়।

যুদ্ধের শেষেও শ্বেতকণিকারা নিজেদের দায়িত্বের কথা ভুলতে পারে না। যুদ্ধক্লান্ত শ্বেতকণিকাদের ভেতর হয়তো তখনও নিহত জীবাণুর খণ্ড খণ্ড অংশ রয়েছে, তারা নিজেরাও হয়তো আহত ও বিস্রস্ত। তবু অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনার মতো তারা রক্তে পাহারা দিয়ে চলে। সতর্ক অপেক্ষায় থাকে সম্ভাব্য আরও এক যুদ্ধের জন্য।

আমাদের দেহে রক্তের এই শ্বেতকণিকা ও ম্যাক্রোফেজরা হল দেহের প্রথম প্রতিরক্ষাব্যূহ মাত্র। রোগজীবাণুকে প্রতিরোধ করবার জন্য কেবল এরাই যথেষ্ট নয়। এছাড়া, রোগজীবাণুর বিস্তার অনেক সময় এত দ্রুত ঘটে যে, শ্বেতকণিকারা তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না।

আমাদের শরীরের দ্বিতীয় যে প্রতিরক্ষাব্যূহ রয়েছে, তা সংগঠন করে প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'ইম্যুনোগ্লবুলিন'। এই প্রতিরক্ষিকা রক্তে ভেসে বেড়ানো গ্লবুলিন নামে একরকমের প্রোটিন। এদের বিশেষত্ব হল, যে-কোনো নতুন আগন্তুক বস্তুর সাথে দৃঢ়সংযুক্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করা। আমাদের দেহে এরকম পাঁচধরনের প্রতিরক্ষিকা রয়েছে।

এরা কীভাবে তৈরি হয়, এবার সে-কথা বলি। আমাদের দেহকোষ এই প্রতিরক্ষিকা তৈরি করে থাকে। যখন কোনো আক্রমণকারী রোগজীবাণু আমাদের দেহে ঢোকে, তখন দেহকোষরা সহজেই চিনে ফেলে যে, অনুপ্রবেশকারীরা তাদের নিজেদের মতো নয়—ভিনদেশী। এর কারণ হল, সেই রোগজীবাণুদের দেহে বাইরের দেয়ালের যে রাসায়নিক গঠন, তা দেহকোষদের দেয়ালের রাসায়নিক গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই রাসায়নিক চিহ্নগুলো—দেহকোষ যাদের নিজের নয় বলে চিনে ফেলতে পারে,—তাদের নাম হল অ্যান্টিজেন। আগন্তুক জীবাণুদের দেহপৃষ্ঠের এই 'ভিনদেশী রাসায়নিক চিহ্ন' বা অ্যান্টিজেনকে দেহকোষ শনাক্ত করবার পরই প্রতিরক্ষিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে শুরু করে।

যা তাদের নিজস্ব, কেবল তাকে চেনার শক্তিই যে দেহকোষদের রয়েছে, তাই নয়। যা তাদের নিজের নয়, যা পরদেশী, তাকেও চেনার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে দেহকোষের। আরও একটা কথা হল, এই প্রতিরক্ষিকা কেবল রোগজীবাণু দেহে ঢুকলেই তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিরক্ষিকা তৈরি হওয়ার জন্যও চাই রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ। আমাদের দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার এ এক বড় দুর্বলতা। জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করবার মতো প্রতিরক্ষিকা সৃষ্টির জন্যই যেন একটি আক্রমণ চাই শরীরের ওপর। এরপর সেই আক্রমণকারীর পিছনে ছুটে তাকে পরাজিত করা।

এই প্রতিরক্ষিকারা কীভাবে যুদ্ধ করে? রোগজীবাণুরা যখন দেহে হানা দেয়, তখন আক্রমণকারীদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য যে প্রতিরক্ষিকারা তৈরি হয়ে আছে, তারা জীবাণুদের দেয়ালের সাথে নিজেদের জুড়ে দেয়। জীবাণুর পিঠে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে তারা দেয়ালকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে বসে থাকে। জীবাণুর আকারের তুলনায় তারা খুব ছোট হলেও তাদের এই কাজটুকুই যথেষ্ট। আগন্তুকটি যদি কোনো বিষাক্ত পদার্থ হয়, তাহলে প্রতিরক্ষিকাটি অ্যান্টিজেনের সাথে সংযুক্ত হয়ে তাকে নির্বিষ করে ফেলে।

প্রতিরক্ষিকারা রোগজীবাণুর প্রত্যক্ষভাবে কোনো ক্ষতি করে না। তবে, তাদের দেয়ালে প্রতিরক্ষিকা সেঁটে বসবার পর এমন কতগুলো ভৌত ঘটনা পরপর ঘটে যায় যে, রোগজীবাণুরা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে। রোগজীবাণুর শরীরে এক দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়ে নিরীহ গোবেচারা দর্শকের মতো জীবাণুটির দেহের উপর বসে থেকে নীরবে তারা দেখতে থাকে মৃত্যুগুহায় জীবাণুটির ধীরে ধীরে তলিয়ে যাওয়া।

তৃতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহের দায়িত্বে থাকে একধরনের 'ঘাতক-কোষ'। এরা হল একদল প্রোটিন-সমষ্টি, যা আমাদের যকৃতে তৈরি হয় এবং রক্তে সঞ্চালিত হয়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হল কমপ্লিমেন্ট। এদের মোট সংখ্যা ৯।

কমপ্লিমেন্টরা কীভাবে জীবাণু ধ্বংস করে, সে-সম্বন্ধে সঠিক কিছু এখনও জানা যায়নি। নয়টি কমপ্লিমেন্ট একে একে আগন্তুক কোষের বাইরের দেয়াল ভেঙে চুরমার করে ফেলে। তার ফলে আগন্তুক কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। জানা গেছে, কমপ্লিমেন্টদের জীবাণুধ্বংসী কাজের জন্য চাই প্রতিরক্ষিকাদের সাহায্য। যখন কোনো অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষিকা একটি জীবাণুপৃষ্ঠের অ্যান্টিজেনের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন প্রতিরক্ষিকাটির আকৃতি পালটে যায়। প্রতিরক্ষিকা অণুটির কোনো এক বিশেষ স্থান এর ফলে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং এই নতুন উন্মুক্ত স্থানটি রক্তে ভেসে বেড়ানো প্রথম কমপ্লিমেন্টকে সক্রিয় করে তোলে। প্রথম কমপ্লিমেন্টটি আবার প্রতিরক্ষিকার সাথেই সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্তির ফলে আরও একটি সংযুক্তিস্থল উন্মুক্ত হয়।

এরপর একে একে বাকি আটটি কমপ্লিমেন্ট জীবাণুপৃষ্ঠে একত্রে জমা হয়। তখন এরা একত্রে বর্মভেদী গোলার মতো জীবাণুপৃষ্ঠে বিস্ফোরিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র সৃষ্টি করে। চোখের পলকে

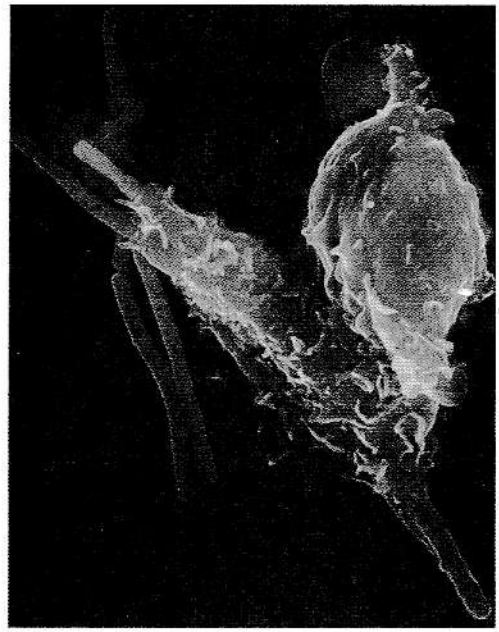

ঘটনাটি ঘটে যায়, জীবাণুটি বিভক্ত হওয়ার অথবা পালিয়ে যাওয়ারও সময় পায় না। বাইরের দেয়াল ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর জীবাণুটির দফা রফা!

প্রতিরক্ষা সেনাদের কথার এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি জানা গেছে, এই তিনটি প্রতিরক্ষাব্যূহই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যেও একজন হুকুমদাতা প্রভু দেহে রয়েছে। দেহের এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এতই জটিল এবং চমকপ্রদ বলে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে, এর ফলে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা জন্মলাভ করেছে। এর নাম হল ইম্যুনোলজি বা অনাক্রম্যতত্ত্ব।

একজন বিখ্যাত অনাক্রম্যতত্ত্ববিদ—ডা. রবার্ট অ্যালান গুড দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। ডা. গুড আমেরিকার নিউইয়র্কের সর্ববৃহৎ ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। তিনি মনে করেন : দেহের নিজস্ব এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থার রয়েছে এক সার্বিক নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র এবং এটি সম্বন্ধে জানতে পারলে একে কাজে লাগিয়ে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে ফেলা সম্ভব।

আমাদের দেহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফনোড। এগুলো হল দেহ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকক্ষ। দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সাথে যে-কোনো দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর তুলনা করা যায়। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মূল হল প্রহরী বা সান্ত্রি। দেহের মধ্যে তেমনি এই সান্ত্রিদের দায়িত্ব যারা পালন করে, তাদের নাম লসিকা-কণিকা বা লিম্ফোসাইট। এরা অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়। অস্থিমজ্জাকে সেজন্য দেহরক্ষী সেনাদের রিক্রুটিং কেন্দ্র বলা যেতে পারে।

কিন্তু রিক্রুট করবার পর রক্ষীসেনাদের চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যাতে তারা সতর্ক এবং সুসজ্জিত সেনানী হিশেবে গড়ে উঠতে পারে। এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় দু-পর্যায়ে। লসিকা-কণিকারা তৈরি হওয়ার সময় অস্থিমজ্জাতেই একটি সাধারণ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।

পরবর্তী উন্নততর প্রশিক্ষণ নির্ভর করে লসিকা-কণিকারা ভবিষ্যতে কী দায়িত্ব পালন করবে, তার ওপর। যেমন, স্থলবাহিনীতে যারা কাজ করবে, তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চয়ই অশ্বারোহী বাহিনীর কাজের থেকে ভিন্নতর হবে। শরীরের মধ্যে এরকম দুটো প্রশিক্ষণকেন্দ্র রয়েছে।

একটি হল থাইমাস নামে এক গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে ফুসফুসের নিকটে অবস্থিত। কিছু লসিকা-কণিকা অস্থিমজ্জা থেকে থাইমাসে এসে পৌঁছায়। সেখানে উন্নততর প্রশিক্ষণ নেয়ার পর পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত-লসিকা কণিকারা দেহের প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণকক্ষ বিভিন্ন লসিকাগ্রন্থিতে এসে জমা হয়। এদের নাম হয় তখন থাইমাস উদ্ভূত লসিকা—সংক্ষেপে টি-লসিকা কণিকা। এদের কথা শুরুতেই বলেছি। আরও একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এই লসিকা-কণিকারা যখন থাইমাসের মধ্য দিয়ে যায়, তখন তাদের আকার ও গুণাগুণেরও পরিবর্তন ঘটে। সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য তারা প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে।

এবার দ্বিতীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কথা। মানুষের মধ্যে অস্থিমজ্জা নিজেই এই দ্বিতীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করে থাকে। যে লসিকা কণিকারা অস্থিমজ্জা থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ লাভ করে, তাদের বলা হয় বি-লসিকা কণিকা। 'টি' এবং 'বি' লসিকা-কণিকারা হল পরিপক্ব লসিকা-কণিকা। এই দু-ধরনের কণিকার প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপও দু-রকমের এবং এ-কারণেই দেহে প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়াও হয় দু-রকমের।

প্রশিক্ষিত পরিপক্ব দেহরক্ষীরা এরপর পুঞ্জীভূত হয় কতকগুলো সুসংগঠিত ইউনিটের ভেতর, যে-ইউনিটগুলো দেহে প্রবেশের পথগুলোকে পাহারা দিয়ে আছে। এগুলোই হল লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফনোড। নাক ও গলা দিয়ে রোগজীবাণু ঢোকার রাস্তায় পাহারা দেয় শ্বাসনালি ও গলনালিকে বৃত্তের মতো ঘিরে থাকা লসিকাগ্রন্থিরা। খাবার ও পানির মাধ্যমে যেসব রোগজীবাণু ঢুকতে পারে, তাদের বাধা দিচ্ছে বৃহদন্তের বেষ্টনীতে অবস্থিত লসিকাগ্রন্থিরা। এরকম আরও লসিকাগ্রন্থি রয়েছে আমাদের ত্বকের নিচে, বগলে, কুঁচকিতে, টনসিলে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই লসিকাগ্রন্থিগুলোকে আবার নিয়ন্ত্রণ করছে প্লীহা—যাকে কমান্ড কেন্দ্রও বলা যেতে পারে।

তবুও অনেক সময় শত্রু লসিকাগ্রন্থির পাহারা ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। তখনই ঘটে বিপত্তি। সেটি যদি পরিচিত কোনো শত্রু হয়, তাহলে পূর্বে গঠিত প্রতিরক্ষিকারাই তাদের সামাল দিতে পারে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজানা শত্রু হয়, তাহলে? চলমান লসিকা-কণিকা প্রহরীরা তখন নিমিষে ছুটে আসে তাদের সাথে মোকাবেলা করতে। আগন্তুক রোগজীবাণু পৃষ্ঠের অ্যান্টিজেনকে তারা সহজেই শনাক্ত করে এবং এরপর টি-কোষরা স্থির করে—আগন্তুকটি ভিনদেশ থেকে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, না, কোনো বন্ধুদেশের আগন্তুক। শত্রুকে চিনে ফেলার সাথে সাথেই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সজাগ হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। লসিকাকণিকাটি নিকটস্থ লসিকাগ্রন্থিতে বিপদসংকেত পাঠিয়ে দেয়। পর্যায়ক্রমে এই বিপদসংকেত পৌঁছে কমান্ড সেন্টার প্লীহায়। প্লীহা তখন এক বিরাট সমরসজ্জার আয়োজন করে। অসংখ্য সুসজ্জিত লসিকাকণিকা বেরিয়ে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। একেই বলে 'রাজকীয়' প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া!

লসিকাগ্রন্থির মাধ্যমে যখন বিপদসংকেত বয়ে যায়, তখন এই সংকেতটি একপর্যায়ে টি-কোষ এলাকা অথবা বি-কোষ এলাকাতে গিয়ে পৌঁছোয়। এলাকা নির্বাচন নির্ভর করে এ-পরিস্থিতিতে আমাদের দেহকে রক্ষা করার জন্য কী প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে দেহের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের ওপর। যদি এটি বি-কোষকে স্পর্শ করে, তাহলে কোষটি হল এমন একটি প্রোটিন তৈরির কারখানা, যা সেই পরদেশী অ্যান্টিজেনের সঠিক প্রতিরক্ষিকা তৈরি করে থাকে। বিপদসংকেত বহনকারী লসিকা

কণিকাটি লসিকাগ্রন্থিগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় শত শত বি-কোষকে স্পর্শ করে সংবাদটি জানিয়ে দিয়ে যায়। তার ফলে বি-কোষগুলো উদ্দীপিত হয়ে গঠন করে অনেক প্লাজমা কোষ, যা এরপর তৈরি করে কোটি কোটি প্রতিরক্ষিকা।

সংবাদবাহী লসিকাকণিকাটি যদি বি-কোষ এলাকায় না গিয়ে টি-কোষ এলাকায় পৌঁছোয়? তাহলে টি-কোষকে স্পর্শ করবার সাথে সাথেই স্থির টি-কোষটি একটি ঘাতক লসিকাকণিকায় রূপান্তরিত হয়। সেই লসিকাকণিকাটি গ্রন্থি থেকে তখন চলে আসে রক্তে,—জীবাণুকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে।

ঘাতক কোষগুলো কীভাবে আক্রমণস্থলকে শনাক্ত করে, তা এখনও জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, আমাদের দেহকে রক্ষা করার জন্য সমগ্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থারই প্রয়োজন। টি ও বি লসিকাকণিকা, প্লাজমা কোষ, কমপ্লিমেন্ট, প্রতিরক্ষিকা, ম্যাক্রোফেজ এবং শ্বেতকণিকা—সবাই একসাথে মিলে আমাদের দেহকে রাখে সুস্থ ও নীরোগ। এতে কোনো ত্রুটি থাকলেই ঘটে বিপত্তি, ঘটে রোগজীবাণুর পুনঃসংক্রমণ, ঘটে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য রোগ।

আমলকী

আমলকীর অপর নাম অমৃত ফল। আমলকী হচ্ছে ভিটামিন 'সি' এর অফুরন্ত ভান্ডার। এত পরিমাণ ভিটামিন 'সি' অন্য কোনো ফলে বা সবজিতে নেই। এর স্বাদ টক হলেও মুখরোচক ফল হিশেবে এর কদর আছে। ঔষধ হিশেবে আমলকী.নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রায় সব ধরনের কবিরাজি ঔষধে এর ফল কাজে লাগে। বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র ছোট ও মাঝারি আকৃতির আমলকী পাওয়া যায়।

আমলকীর জন্ম হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে কোনো এক দেশে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং মায়ানমারের জঙ্গলে এর সমগোত্রীয় ফল দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত শীতপ্রধান দেশে এর ফলন বেশি হয়। আমলকীর মধ্যে ২০০ থেকে ৪০০০ প্রজাতি দেখা যায়। আমলকী গাছ যখন কচি সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় তখন দেখতে অপরূপ লাগে। এর পাতা দেখতে অনেকটা তেঁতুলপাতার মতো। গাছ উচ্চতায় ৭-১৪ মি. পর্যন্ত হয়। তবে ডালপালা বেশি মোটা হয় না। গুঁড়ির ভেতরের কাঠের রঙ লাল। পাতাগুলো সবুজ পালকের মতো ডালের দু'পাশে থাকে। শীতের সময় আমলকীর ডালে মন-ভোলানো রূপ দেখা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন :

'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আমলকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।'

গরম পড়ার সাথে-সাথে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সবুজ বর্ণের ফুল ফুটতে শুরু করে। ফুলে হালকা মিষ্টি গন্ধ আছে। কাঁচাফল হালকা সবুজ, পাকলে ঈষৎ হলদে। ফলের ভেতর থাকে একটা শক্ত আঁটি যার মধ্যে ছয়টা কালচে-বাদামী বীজ থাকে।

ইংরেজি নাম—Amla
বৈজ্ঞানিক নাম — *Phyllanthus Embelica linn*

সুনির্মল বসু

সবার আমি ছাত্র

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান—
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দরি-খোলা হই তাই রে।
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে
চাঁদ শিখাল হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর—
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে—
গান জাগাল আমার প্রাণে
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা-মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিশ
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়—
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়;
শিখছি সেসব কৌতূহলে—
সন্দেহ নাই মাত্র ॥

শঙ্খ ঘোষ

স্বপ্নের স্কুল : নিজের কাজ নিজে

তোমাদের স্কুলে পার্লামেন্ট আছে, পার্লামেন্ট? নেই তো? আমাদের স্কুলে কিন্তু ছিল। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, শোনো তাহলে সেই গল্প। পদ্মাপারের সামান্য একটা রেলকলোনি, তিনদিকে তাকে ঘিরে আছে ছোট ছোট গ্রাম, সেই কলোনির ছোট্ট একটা স্কুল। সেই দূর ১৯৪৪-৪৫ সালে, কতই-বা তার ছাত্রসংখ্যা হবে তখন! গ্রাম আর কলোনির ছেলেরা মিলে বড়জোর দুশো-আড়াইশো। স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে ভালোও বাসে ছেলেরা, ভয়ও করে। একদিন তিনি সেই ছেলেদের কাছে বলে বসলেন : 'তোমাদের জন্য একটা নতুন কথা ভেবেছি। তোমাদের নিজেদের একটা পার্লামেন্ট হবে।'

পার্লামেন্ট? আমাদের পার্লামেন্ট? সে আবার কী বস্তু?

হেডমাস্টারমশাই বললেন : 'তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব নেবে নিজেরাই। নিজেদের কোনো সমস্যা হলে তা মীমাংসা করবে নিজেরাই। সেটাই কি ভালো নয়?'

কিসের দায়িত্ব, কিসের মীমাংসা, কিছুই আমরা বুঝতে পারিনি গোড়ায়। পরে একটু একটু করে স্পষ্ট হল তাঁর গোটা কথাটা শুনতে শুনতে। কথাগুলির মধ্যে এমন মজার একটা পরিকল্পনা ভেসে এল যে, আমরা সবাই একেবারে চনমন করে উঠলাম।

মাস্টারমশাই বললেন : 'প্রত্যেক ক্লাসেই নানারকম কাজের পরিচালনার জন্য কয়েকটা বিভাগের ছক করা হবে। যেমন ধরো, ক্লাসের সৌজন্য, ক্লাসের শৃঙ্খলা ঠিকঠাক রাখবার দায়িত্ব থাকবে একটা বিভাগের, তার নাম হবে 'ম্যানার্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সেকশন'। সাতজন সদস্য থাকবে সেই সেকশনে, ক্লাসই ঠিক করে নেবে কারা সেই সদস্য। সদস্যরা ঠিক করে নেবে তাদের মধ্যে কে হবে প্রধান, আর সে-ই হবে সে-বিভাগের মন্ত্রী। মন্ত্রী? একেবারে মন্ত্রী? হ্যাঁ, মন্ত্রী। বিভাগ থাকবে এইরকম নটা, আর প্রত্যেক বিভাগের সদস্য থাকবে সাতজন। সাত নয়ে তেষট্টিজন ছেলে তো আর নেই কোনো ক্লাসেই। একই ছেলে তাই বিভিন্ন বিভাগের সদস্য হতে পারে তার রুচি আর প্রবণতার ধরন অনুযায়ী। সকলেই সদস্য, অনেকেই মন্ত্রী। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় খাড়া হয়ে বসেছি আমরা। কী কী নটা বিভাগ? ইংরেজিতেই বলা হয়েছিল নামগুলি। শক্ত মলাটের লম্বাটে একটা নীল খাতার পাতায় পাতায় লেখা হচ্ছিল নাম : ম্যানার্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সেকশন, লিটারেরি সেকশন, ফাইন আর্টস, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাগ্রিকালচারাল, অ্যাথলেটিকস, হেলথ, সোশ্যাল সার্ভিস আর অ্যামিউজমেন্ট সেকশন। নটা বিভাগের তেষট্টিটা সদস্যের নাম ঠিক হবে ছেলেদের নিজস্ব নির্বাচনে, সাতটি নাম মন্ত্রীর, সব মিলিয়ে একজন হবে ক্লাসের মুখ্যমন্ত্রী। আর গোটা স্কুল মিলিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রী। হেডমাস্টারমশাই? তিনি হবেন প্রেসিডেন্ট।

ব্যস্, রাতারাতি একটা গাম্ভীর্য এসে গেল আমাদের চলনে বলনে। বেশ একটা মন্ত্রী-মন্ত্রী ভাব। কতই যেন দায়িত্ব আমাদের।

কিন্তু, ভাব এলেই তো হল না, মন্ত্রী বা সদস্যের যোগ্য কাজও তো কিছু করা চাই। ম্যানার্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিন সেকশনের তত্ত্বাবধানে ক্লাসের শৃঙ্খলা রাখা কিংবা লিটারেরি সেকশনের দৌলতে দেয়ালপত্রিকার আয়োজন করা ছাড়া আর যে কী করা যায় তা মাথায় আসছিল না ঠিক। ও, হ্যাঁ— কোথাও আগুন লাগলে (প্রায়ই কীরকম করে যেন আগুন লাগতও এখানে-সেখানে) বা কারও অসুখ করলে দৌড়াতে পারে বটে সোশ্যাল সার্ভিসের ছেলেরা। থিয়েটারের আয়োজন করতে পারে অ্যামিউজমেন্ট সেকশন।

কিন্তু আর? আর কিছু? লাফিয়ে উঠল সেই বিভাগের ছেলেরা, আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্লাস। দরবার গেল হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে : 'একদিনের ছুটি চাই আমরা, ক্লাসঘরে রঙ করব।' আধাকৌতুক-আধাবিরক্তিতে লক্ষ করছিলেন অন্য মাস্টারমশাইরা, কিন্তু ছুটি মিলল অচিরেই। মই বুরুশ বালতি চুন খুঁজবার জন্য দিকে দিকে দৌড়াল সবাই। সেসব সংগ্রহ হবার পর কিছু ছেলে লেগে গেল কাজে, আর অন্যেরা রইল তাদের আশেপাশে উৎসাহ দেবার জন্য।

পরদিন একেবারে ঝকঝকে-তকতকে ক্লাসে ঢুকে ক্লাসটিচার বেশ আন্তরিক খুশিতে বলে উঠলেন : 'বাহ, তোমরা? তোমরা নিজেরাই করেছ এসব?'

কী! ক্লাস নাইন করেছে!

টেনই-বা তবে নয় কেন? কেন নয় এইট? শুরু হয়ে গেল এক অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা। কোন ক্লাস সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে তুলতে পারে তাদের ক্লাসঘর, তার প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতা শুরু হল আরও একটা। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন ঘর রঙ করেছে? আচ্ছা বেশ, অ্যাগ্রিকালচারাল সেকশন তাহলে বাগান করবে। দেখি তো সেটা আরও ভালো কাজ কি না!

শুরু হল পাশাপাশি বাগান-তৈরির হল্লা। বিকেলবেলায় খুরপি-কোদাল নিয়ে তৈরি সবাই।

অল্পদিন পরেই নানারকমের ফুলে ভরা সেই বাগানসারির সামনে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইরা বলেন : 'এই যে এটা ক্লাস সিক্সের বাগান, এটা সেভেনের, এটা ক্লাস টেনের বাগান, এটা নাইনের...'

ছোটই তো শহর! শহরময় ছড়িয়ে যায় কথাটা। ক্লাসঘরের ভেতরটা সবার চোখে না-পড়লেও বাগান তো বাইরে থেকেই দেখতে পান সবাই। ফলে মুখে-মুখে রটে গেল একটা বাঁকা কথা : 'স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ভারি চালাক লোক। একেবারে বিনে-পয়সায় গোটা স্কুলটা রং করিয়ে নিলেন আর ভরিয়ে নিলেন বাগানে বাগানে! ভারি চালাক!'

কিন্তু সেসব কথা আমরা কি তখন গ্রাহ্য করি আর?

নিজেদের কাজ নিজেরা করছি ভেবে গর্ব-গর্ব মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছি সবাই আমরা, স্কুল পার্লামেন্টের মস্ত-ভার-পাওয়া সেই খুদে খুদে সদস্যেরা।

হাস্যকৌতুক

শিক্ষক : কলিম তুমি পড়ো না কেন? না পড়লে ভালো ফলাফল করতে পারবে না।
ছাত্র : স্যার পড়লে যে ব্যথা পাই।

*　　*　　*

ও বুড়িমা তোমার বয়স কত হল?
—এই বছর কুড়ি হল।
—বল কী? মাত্র কুড়ি!
হ্যাঁ বাপ। ওর চেয়ে বেশি আমি গুনতে পারি না।

শিবরাম চক্রবর্তী

ব্যক্তিত্ব কাকে বলে!

নন্দদুলাল হুড়মুড় করে ঢুকল রেস্তোরাঁর মধ্যে—ওরই যেন রেস্তোরাঁটা, ভাবখানা এমনি। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা—যদিও হৃষ্টতার চেয়ে পুষ্টতার পরিমাণ বেশি, তা হলেও নন্দদুলালকে দেখলে অহমিকার জ্বলন্ত ছবি বলেই জ্ঞান হয়।

চেয়ারে সে বসতে-না-বসতেই বয় ছুটে এসেছে—'কী আনব বলুন হুজুর।'

'দেখি তোমাদের মেনু' বলে বয়ের হাত থেকে খাদ্যতালিকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে ঠোঁট চেটে নন্দদুলাল অর্ডার দিল : 'এগ চিপস, মাটন চপ আর রোস্ট ফাউল—আজ কেবল এই।'

নন্দদুলাল আমার টেবিলেই এসে বসেছিল। ওর প্রাদুর্ভাবের মিনিট-পনেরো আগে আমি এসেছি। কিন্তু এতক্ষণ ধরে বসে বহু চেষ্টাতেও ঐ বয়ের সুনজরে পড়তে পারিনি। ইশারা, ইঙ্গিত, হাতছানি সব ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি কয়েকবার ঈষদুচ্চ স্বরে 'বয়, বয়' রবেও ও দূরে থাক, ওর কৃপাকটাক্ষটুকুও টানা যায়নি—অথচ এই নন্দদুলাল হেলেদুলে এসে বসতে-না-বসতেই তার একটা মুখের কথা খসবার আগেই শশব্যস্তে সে এসে হাজির! দেখে আমার তাক লাগতে থাকে।

তাক লাগলেও এ-তাক আমি ফসকাতে দিই না। সত্যি বলতে, প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারাও বয়কে আনতে অপারগ হয়ে হতাশ-মনে একটু আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু করেছিলাম : হে প্রভু,

বয়কে আমার কাছে নিরাপদে পৌঁছে দাও। হয়তো আমার সেই প্রার্থনার দৌলতেই নন্দদুলাল এল—নিমিত্তরূপে এল—আর নন্দদুলালের উপলক্ষ করে বয়রূপী বিধাতার তথাস্তু লাভ করলাম। অতএব এই সুযোগ ফসকাতে না দিয়ে আমিও শুরু করি—'বয়, শোনো তো একবার এদিকে—'

'দাঁড়ান আসছি।' বলে বয় নন্দদুলালের অর্ডার নিয়ে ছুট দিল এবং চক্ষের পলকে রুটি আর মাখন এনে রেখে গেল আমার টেবিলে—নন্দদুলালের সামনে।

'শুনছ? আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।' —আমি আবার বলতে যাই। 'আসছি। একটু সবুর করুন।' বলে একটা প্লেটে তিনটে ডিমের পোচ আর কিছু আলুভাজা এনে সে হাজির করে। কাঁটাচামচ চালাবার সাথে সাথে নন্দদুলাল জানায়—'মাটন চপ আর রোসটাও চটপট নিয়ে এসো, বুঝেছ?' বয় দ্বিরুক্তি না করে ঘাড় নেড়ে চলে যায়। আমার কথাটা ওকে বলার জন্য মুখ খুলেও ওকে বলা হয় না। বুক ফাটলেও আমার মুখ ফোটে না। অবশেষে ক্ষুণ্নস্বরে নন্দদুলালকেই বলি—'আমি প্রথম এসে বসেছি এই টেবিলে অথচ—'

নন্দদুলাল বাধা দিয়ে বলে—'প্রথম পুরুষই কিন্তু উত্তম পুরুষ হয় না। তুমি হচ্ছ তুমি, আমি হচ্ছি আমি। ব্যাকরণ পড়ে থাকলে এটা তো মানো?' বয় টেবিলের উপর মাটন চপ আর ফাউল রোস্ট এনে রাখে। আমার ইচ্ছে করে উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ—আমাদের মাঝখানে ওই বয়—ওদের দু'জনকে ধরে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি বাধিয়ে পৌরুষের একটা উত্তম-মধ্যম রচনা করে বসি। কিন্তু মনের জ্বালা পেটের আগুনে জ্বলন্ত হয়ে কবজিতে এসে পৌঁছবার আগেই নন্দদুলালের মুখ থেকে খসেছে—'কফি লাও!' আর বয়ও অমনি উধাও—বলতে-না-বলতেই।

রেস্তোরাঁ ছাড়া কোথায়-বা খাই? কিন্তু চিরকাল ধরে দেখে আসছি রেস্তোরাঁর এই বয়গুলো আমাকে যেন দেখতেই পায় না। আমলই দেয় না আমায়। সবার হুকুম তামিল করে সুদূর নক্ষত্রের আলোর মতো সবশেষে আমার কাছে এসে পৌঁছায়। আমার দুঃখের কথাটা নন্দদুলালকে জানাই।

শুনে ও অনুকম্পার হাসি হাসে—'নিজেকে জাহির করতে জানা চাই হে। বুঝলে?'

'বুঝেছি। কিন্তু কী করে যে জাহির করব সে-ই হয়েছে আমার সমস্যা।' আমি ঘাড় নাড়ি—'মারামারি করতে তো আমি পারিনে। গায় আমার অত জোর নেই, আর হাঁকডাকও আমার আসে না।'

'তোমার মুশকিলটা যে কোথায় আমি বুঝেছি। আসলে তোমার ব্যক্তিত্বের অভাব। ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায় তার একফোঁটাও নেই তোমার ঘটে। আর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে এমনই যা আপনিই জাহির হয়। স্বভাবতই তা ব্যক্ত না হয়ে পারে না। কোন লোকটা ব্যক্তি আর কোন লোকটা নয়—তা দেখলেই টের পাওয়া যায়। সবাই এমনকি রেস্তোরাঁর বয়াটে বয়রাও তা ধরতে পারে। আর সেইরকম বুঝেই তারা ব্যবহার করে থাকে।'

কথাটা আমার বোঝার চেষ্টা, আর ওর বোঝাই করার চেষ্টা।

'এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটা হচ্ছে কারও সহজাত, জন্ম থেকেই পাওয়া, আবার কাউকে কাউকে চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে হয়। এই যেমন তুমি আর আমি। আমি ব্যক্তিত্ব নিয়েই জন্মেছি, তোমাকে কিন্তু সাধনার দ্বারা এটা পেতে হবে।' জাজ্বল্যমান দুটি উদাহরণ সামনাসামনি ও রাখে।

'অনেক ব্যক্তির সাধ্যসাধনা করতে হয় জানি, এই যেমন এতক্ষণ ধরে এই রেস্তোরাঁর বয়ের আমি করেছি—কিন্তু ব্যক্তিত্বের সাধনা আবার কীরকম? তার রহস্যটা শুনি।'

নন্দদুলাল বিজ্ঞের ন্যায় মুখখানা বানায়—কিন্তু ওকে ধড়িবাজের মতো দেখাতে থাকে। 'আছে হে, আছে হে। রহস্য আছে বৈকি।' ওর মুখটাই রহস্যময় হয়ে ওঠে।

নন্দদুলাল ফাউল রোস্টের সদ্ব্যবহার করে আর আমি রহস্যটা যে কী হতে পারে তা-ই নিয়ে মাথা ঘামাই। 'বয়, বিল আনো।' কফির পেয়ালায় আরামের চুমুক দিতে দিতে ও বলে। বয় একটা প্লেটে

করে বিল নিয়ে আসে এবং এতক্ষণ পরে, একটু যেন দয়াপরবশ হয়েই, আমার দিকে ফিরে তাকায়। 'আপনার কী আনব বলুন তো?'

বয়ের অযাচিত সম্ভাষণে আমি চমকে যাই—'আমার? আমাকে বলছ? আমার কী আনবে?...এক কাপ কফি আর কিছু কাজু বাদাম—তাই নিয়ে এসো। বেশি কিছু নয়।'

বয় আমার জন্য আনতে যায়। নন্দদুলাল বিলের দামটা প্লেটের উপরে রাখে আর একটা সিকি ওই বয়ের উদ্দেশেই নিঃসন্দেহে, প্লেটের তলায় রেখে দেয়।

'আমার দাঁড়াবার সময় নেই—চলি আজ, কেমন? আরেক দিন কথা হবে। ব্যক্তিত্বটা তখন বুঝিয়ে দেব তোমায়। আজ একটু তাড়া আছে আমার।' এই বলে দিগ্বিজয়ীর মতো পদভরে রেস্তোরাঁ কাঁপিয়ে ও চলে যায়।

আমি ওর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হৃষ্টপুষ্ট চেহারার দিকে চেয়ে থাকি—পুষ্টতার চেয়ে হৃষ্টতার মাত্রাই এখন বেশি বলে মনে হয়। চেয়ে থাকি আর ব্যক্তিত্বের আসল রহস্যটা কী হতে পারে, তা-ই নিয়ে মাথা ঘামাই।

মাথা ঘামালেই আমার মাথার ঘিলু গলতে থাকে। আর ঘিলু গললেই বুদ্ধি খোলে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের স্থূল রহস্যটা আমার কাছে খোলাসা হয়ে আসে। খানিকটা ঘিলু ওরফে কপালের ঘাম রুমালে মুছে ফেলার পরে মূল কথাটা আমি বুঝতে পারি। 'ওহ্, এই ব্যাপার!... আচ্ছা পরীক্ষা করেই দেখা যাক-না!' এই বলে আমার কফিটুকু নিঃশেষ করে আমি উঠে পড়ি।

তার পরের দিন। ওই রেস্তোরাঁই। আমিও ঢুকেছি, বসেছি আমার টেবিলে, আর নন্দদুলালও এসে উপস্থিত হয়েছে প্রায় সেই মুহূর্তেই। তেমনি আনন্দে নিজেকে দুলিয়ে, নিজেকে জাহির করতে করতে সে হাজির। —'পেরেছ? পেরেছ আবিষ্কার করতে রহস্যটা?' আমার সামনে বসে পড়ে ও প্রশ্ন করে।

'কীসের রহস্য?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'ব্যক্তিত্ব হে, ব্যক্তিত্ব! সহজে হয় না, সাধনা করতে হয়।' মুরুব্বির মতো মুখ। —'কী করে এই ব্যক্তিত্ব গজায়। টের পেলে তার কিছু?'

'একটু একটু পেরেছি বোধ হচ্ছে।' নিরীহের মতো বলি।

'বয়!' নন্দদুলাল হাঁক ছাড়ে। 'আসছি দাঁড়ান।' বয়ের জবাব আসে। ... এবং বলতে-না-বলতে খাদ্যতালিকা হাতে করে সে তটস্থ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তালিকাটা ওর হাতে না দিয়ে আমাকেই দেয়। নন্দদুলালের গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে—বিস্ময়ে আর ক্ষোভে ওর গলা থেকে কথা বের হয় না। 'বয়'! বলে ও গর্জন করে। কিন্তু ওই বয়-ধ্বনিতে বয় আজ টলে না। 'একটু সবুর করুন বাবু, এঁরটা আগে এনে দিই।' বলে আমার অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি লোকটার?' নন্দদুলাল গজরাতে থাকে, রাগে আর বিস্ময়ে থই পায় না।

'ব্যক্তিত্বের রহস্যটা তুমি জানতে চাও? চাও তো বলি'—আরম্ভ করি আমি, 'জানাতে আমার কোনো আপত্তি নেই—'

'থামো!... এসব আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। আমি চাই কাজ, অফুরন্ত কাজ। আমি কাজের মানুষ, এরকম বাজে রেস্তোরাঁয় বসে বসে নষ্ট করার মতো অত সময় আমার নেই।' এই বলে উঠে পড়ে সে গটগট করে বেরিয়ে যায়।

ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কখনোই হাসবার চিজ নয়; কিন্তু তা না হলেও ওর দিকে তাকিয়ে আমার কেমন হাসি পেতে থাকে। ব্যক্তিত্বের মোদ্দাকথাটা তখন আর আমার কাছে অবিদিত নেই। আসল কথাটা

হচ্ছে, নন্দদুলাল গতকাল বয়ের উদ্দেশে নিজের প্লেটের তলায় যে-সিকিটা রেখেছিল—সে চলে গেলে...না, বয়ের উদ্দেশে নিবেদিত জিনিস মেরে দেব, এতটা ছোটলোক আমি নই—অন্তত এখনও হইনি। বয়ের প্রাপ্য বয়ই পেয়েছে। কেবল ওই সিকিটা ওর প্লেটের তলা থেকে তুলে এনে আমার প্লেটের তলায় রেখেছিলাম। হাতফেরতা হয়ে ওটা বয়ের হাতেই পৌঁছেছে, কিন্তু সামান্য একটু ইতরবিশেষের জন্যই, নন্দর অমন মারাত্মক ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও আজ ওর আগে আমার এই আনন্দ—এই 'বয়'লাভে জয়লাভ!

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মজার ঘটনা

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনে অনেক মজার ঘটনা আছে। একবার এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী করেন? আইনস্টাইন বললেন, 'আমি এখনও পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র।' লোকটা অবাক হয়ে বললেন, 'বলেন কী! আমি তো গত বছর পাস করেছি আর আপনি এখনও ছাত্র?'

তাঁর জীবিত অবস্থায় একটা গ্রানাইট পাথরের মূর্তি বানানো হয়েছিল। আর এজন্য তাঁকে মডেলিং করতে হয়। সেসময় পাশ দিয়ে এক লোক যাচ্ছিল যে আইনস্টাইনকে চেনে না। লোকটা আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পেশা কী?' আইনস্টাইন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'মডেলিং'।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বেগম রোকেয়া

আজ থেকে একশো বছর আগের কথা। বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে বাস করতেন এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। তাঁর নাম জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। সাবেরের বিরাট বাড়িটা ছিল গ্রামের সাড়ে ৩০০ বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তির মাঝখানে। সাবের সাহেব ব্যয়বহুল ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন এবং নানা বিষয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। সাবের সাহেবের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের নাম আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের; আর কন্যাদের নাম করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোমেরা। মধ্যম কন্যা রোকেয়াই বাঙালি মুসলমান মহিলা সমাজের মধ্যমণি বেগম রোকেয়া। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছরেরও আগে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম।

ভাবতে অবাক লাগে, সেকালের পরিবেশে জন্মে বেগম রোকেয়া জীবনব্যাপী সাধনায় যে অবদান রেখে গেছেন, তা কী করে সম্ভব হয়েছিল! সে-সময়ে পরিবেশ কেমন ছিল, তা আজ তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কেমন ছিল অবস্থা শোনো।

রোকেয়ার দুই ভাইয়ের পড়াশোনার সব ব্যবস্থা করেছিলেন পিতা সাবের সাহেব। দুই ভাই-ই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু রোকেয়া ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। লেখাপড়া শেখার জন্য ঘরের বাইরে যাবার কোনো সুযোগই তাঁর ছিল না। তখনকার মুসলমান সমাজে মেয়েদের বাংলা-ইংরেজি লেখাপড়া শেখাবার প্রশ্নই উঠত না। তাই রোকেয়া বা তাঁর বোনেরা কোনো স্কুলে পড়তে যাননি। বড়ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চজীবনদৃষ্টিও পেয়েছিলেন। তাই তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে করিমুন্নেসা ও রোকেয়াকে ইংরেজি পড়াতে শুরু

করেন। তাঁর আগ্রহ ও তত্ত্বাবধানে এই দুই বোন ইংরেজিশিক্ষায় যথেষ্ট এগিয়ে যান। কিন্তু সেখানেও বিপদ। বড়বোন খুব বাংলা বই পড়েন। এজন্য তাঁর পড়াই বন্ধ করে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল মামাবাড়ি বলিয়াদীতে এবং ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল দেলদুয়ারে। অতিশয় পড়ার আগ্রহের এই হল পরিণাম। বিয়ের নয় বছর পর করিমুন্নেসা বিধবা হন। বাল্যকালে রোকেয়াকে বড়বোন করিমুন্নেসা বাংলা পড়ান এবং বড়ভাই ইব্রাহিম সাবের ইংরেজি পড়ায় উৎসাহ দেন ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন।

রোকেয়ার বিয়ে হয় ষোলো বছর বয়সে। তাঁর স্বামীর নাম সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। সাখাওয়াত সাহেবের বাড়ি ছিল বিহারের ভাগলপুরে। এই বিয়ের আগে সাখাওয়াত হোসেন সাহেব মায়ের পছন্দমতো বিহারেই এক আত্মীয়াকে বিয়ে করেন। একটি শিশুকন্যা রেখে সাখাওয়াত সাহেবের ঐ প্রথম স্ত্রী অল্পবয়সে মারা যান। বেগম রোকেয়া এবং সাখাওয়াত সাহেবের কোনো সন্তান বাঁচেনি। সাখাওয়াত সাহেব রোকেয়াকে বাংলা ও ইংরেজি চর্চায় উৎসাহিত করতেন। বেগম রোকেয়ার পরিচালনায় ভাগলপুরে একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় খোলার ইচ্ছা ছিল তাঁর। এজন্য তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন বলে ঠিক করেন। তাছাড়া পত্নী বেগম রোকেয়াকেও তিনি দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। এই সময় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতা গেলে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাখাওয়াত সাহেবের প্রথমপক্ষের কন্যা ও জামাতার আচরণে রোকেয়া ভাগলপুর থেকে চলে আসতে বাধ্য হন।

কলকাতায় এসে ১৯১১ সালের মার্চ মাসে ৮ জন ছাত্রী নিয়ে অলিউল্লাহ লেনে তিনি আবার স্কুল খোলেন। কিছুকাল পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উঠে আসে লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। এই স্কুল বাঙালি মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করে। প্রতিষ্ঠানটি রোকেয়ার অতুলনীয় অবদান। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এই স্কুলের উন্নতির জন্য কাজ করতে করতেই মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে বেগম রোকেয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন।

যিনি নিজে স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পাননি, তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন স্কুল। কত বাধা এসেছিল সমাজ থেকে, দেশ থেকে, এমনকি পরিবার-পরিজনদের থেকে। কিন্তু সব বাধা সরিয়ে বেগম রোকেয়া তাঁর স্কুলের মধ্য দিয়ে জাতির সেবা করে গেছেন। বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন তিনি। গৃহকোণ আলোকিত হয়েছে; পরিবর্তন এসেছে পরিবারে, সমাজে, দেশে। এই আলোর তুলনা হয় না।

শুধু শিক্ষার আলো জ্বালানোই নয়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সমাজে মেয়েদের মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন কলম। বাংলা ও ইংরেজিতে সেই চর্চার ফসল তাঁর অবিস্মরণীয় রচনাসম্ভার। তাঁর সমস্ত রচনার লক্ষ্য সত্য প্রতিষ্ঠা। বাস্তবকে তুলে ধরে—যা হওয়া উচিত, সেদিকে মানুষের চোখ ফেরানোই তার উদ্দেশ্য। বাল্যকালে যে অবরোধের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তা মোচন না হলে যে নারীর মুক্তি নেই এবং নারীর মুক্তি না হলে যে সমাজেরও মুক্তি নেই, একথা তিনি অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন। পায়রাবন্দের বন্দি পায়রা বুঝেছিলেন মুক্ত আকাশের মানে। সে মুক্তির আহ্বান তাঁর কণ্ঠে। সেই মুক্ত আকাশের আলো তাঁর লেখায় দ্যুতিমান।

তাঁর 'মতিচুর', 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ' ও ইংরেজি রচনা 'সুলতানাস ড্রিম' আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর লেখায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত আছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, তাঁর আঘাতের পেছনে ছিল সহানুভূতি, আন্তরিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি। স্বচ্ছ চিন্তা ও সুন্দর মন এবং ক্রিয়াশীল জীবন বেগম রোকেয়ার সাফল্যের মূলে।

জন্মেছিলেন পশ্চাৎপদ পরিবেশে। সমাজ ছিল প্রতিকূল। বড়ভাই, বড়বোন ও স্বামী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, আর প্রায় সবাই দিয়েছিলেন বাধা। তবু এই মহীয়সী মহিলা জীবদ্দশায় অবরুদ্ধ নারীসমাজকে মুক্তির পথে চলতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন। আজও তাঁর আদর্শ আমাদের দেশ, সমাজ ও জাতিকে এগিয়ে চলার পথে অনুপ্রাণিত করছে। আজ যখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, তখন ভাবাই যায় না একশো বছর আগের সেই কথা। পুরোপুরি যায় না বোঝা, একজন বেগম রোকেয়া কী অসাধ্য সাধন করে গেছেন।

নীলনদের উৎসের খোঁজে স্পেক

স্পেক

বিখ্যাত নীলনদের নাম কে না শুনেছে! পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। মিশরের প্রাণ। এই নদের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর নামটি জুড়ে আছে, তিনি হলেন একজন বৃটিশ সামরিক অফিসার, নাম জন হ্যানিং স্পেক। ১৮২৭ সালের মে মাসের ৩ তারিখে বৃটেনের বাইডফোর্ডে (Bideford) তাঁর জন্ম। বৃটিশ-ভারতীয় সামরিকবাহিনীতে যোগ দেন ১৮৪৪ সালে। তখন থেকেই ভারতে। ভারতে থাকাকালে তাঁর মাথায় চেপে বসে অভিযানের নেশা। আর যাকে একবার এই নেশায় পেয়েছে তাকে বেঁধে রাখা দায়। সেরকমই হয়েছিল স্পেকের বেলায়। যখনই ছুটি পেতেন, চলে যেতেন হিমালয়ের কোনো-না-কোনো দুর্গম অঞ্চলে। এমনকি একবার তিব্বতও পার হয়ে গিয়েছিলেন। সে-সময় কিন্তু ইউরোপিয়ানদের তিব্বতের আশপাশের প্রদেশে যাওয়া ছিল একদম নিষিদ্ধ। অভিযাত্রী হিসেবে তিনি নাম করেছিলেন আফ্রিকায় অভিযান চালিয়ে। সে সময় নীলনদের উৎস নিয়ে নানাজনের ছিল নানারকম মত। কথায় আছে না : 'নানা মুনির নানা মত'? আসলেই তাই। এই উৎস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা গেল সেই একই ব্যাপার। মতের কোনো মিল নেই। প্রাচীনকালের গ্রিক ভূবিজ্ঞানী টলেমির সেই একই ব্যাপার।

টলেমির (৯০-১৬৮ খ্রি.) নাম শুনেছি আমরা অনেকেই। তিনি তাঁর আঁকা মানচিত্রে দেখিয়েছিলেন নীলনদের উৎপত্তি দুটো হ্রদ থেকে। তাঁর মতে, চাঁদের বরফ-গলা পানি থেকেই সেই হ্রদ দুটোর সৃষ্টি। এই উৎসের সন্ধানে কতলোক যে বেরিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবাই ফিরেছে ব্যর্থ হয়ে। কেউই আসল উৎসের সন্ধান পায়নি। সেসব অভিযাত্রীদের মধ্যে পেড্রো, ব্রুস, রেবমান ও ক্রোপ-এর নাম করা যায়।

১৮৫৫ সালে স্পেক ও রিচার্ড বার্টন নামে এক ব্যক্তি ঠিক করলেন আফ্রিকা অভিযানে যাবেন। কথামতো শুরু হল তাঁদের যাত্রা 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' বা অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার উদ্দেশে। সেকালে সেই মহাদেশের গহিন অরণ্য, বিশাল মরুভূমি আর ভয়ংকর হিংস্র জীবজন্তু সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাই ছিল না। আসলে সেখানে যে সূর্যের আলো ঢুকত না, তা নয়। আফ্রিকা সম্বন্ধে তেমন কিছু কেউ জানত না বলেই এই নামকরণ। এখন অবশ্য মানুষ এই অন্ধকার মহাদেশের অনেক রহস্যের জাল ভেদ করে জেনেছে অনেক কিছু।

আফ্রিকা কথাটা শুনলেই যেন ভয়ে গা শিউরে ওঠে। কারণ, সেখানে আছে ঘন বন-জঙ্গল। শুধু বন-জঙ্গলই নয়, সেই বনে থাকে হিংস্র সব জীবজন্তু—বাঘ, সাপ, আরও কত কী! নদীগুলোতে বিরাট বিরাট কুমির, জলহস্তী। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এছাড়া আরো আছে জংলী মানুষ, যাদের খপ্পরে পড়লে আর রেহাই নেই। প্রাণ নিয়ে তবেই ছাড়বে। এরকম এক অতি বিপজ্জনক এলাকায় অভিযান করতে যাওয়া এক অকল্পনীয় দুঃসাহসের কাজ। সেই আফ্রিকা অভিযানে নেমেছেন স্পেক ও বার্টন। কে জানে তাঁদের ভাগ্যে কী আছে! কখন যে কোন হিংস্র বাঘ কিংবা সিংহ এসে থাবা বসাবে, তাই-বা কে বলতে পারে! অথবা যদি কোনো জংলী অধিবাসী এসে আক্রমণ করে বসে, তাহলে যে কী উপায় হবে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন!

কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী তাঁরা। তাঁদের কোনো ভয়-ডর নেই। অভিযান করতে করতে তাঁরা চলছেন। এভাবে প্রথমে পৌঁছুলেন সোমালিয়ায়।

কিছুদিন অভিযান করার পর সত্যি সত্যিই একদিন কিছু আফ্রিকান উপজাতি তাঁদের আক্রমণ করে বসল। কী আর করা যাবে, প্রাণ বাঁচাতে হবে তো। ফলে দু-দলে বাধল লড়াই। ভাগ্য ভালো যে, তাঁদের বন্দি করতে পারেনি তারা। তবে তাদের আক্রমণে আহত হন স্পেক। সেজন্যে মাঝপথে হঠাৎ করেই বন্ধ করতে হল তাদের অভিযান।

কিন্তু তাদের সংকল্প ছিল দৃঢ়, ছিল দুর্জয় সাহস আর ধৈর্য। তাই হতাশ হলেন না দু'জনের একজনও। ঠিক তার পরের বছর আবার বেরিয়ে পড়লেন। সে যাত্রার লক্ষ্য ছিল মধ্য-আফ্রিকার একটি হ্রদের সন্ধান করা। ভেবেছিলেন সেই হ্রদ থেকেই বোধ হয় নীলনদের উৎপত্তি।

১৮৫৭ সালের আগস্টের কথা। উট-চলা পথ ধরে চলছেন তাঁরা। চলতে চলতে শেষে ১৮৫৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে পৌঁছুলেন টাঙ্গানিকা হ্রদের উপকূলে। তাঁরাই প্রথম পশ্চিমাদের মধ্যে টাঙ্গানিকা হ্রদ দেখতে পান। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, তাঁদের ধারণা ভুল। আসলে সে হ্রদ নীলনদের কোনো অংশই নয়। এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন বার্টন। কোনো উপায় না দেখে বার্টনকে

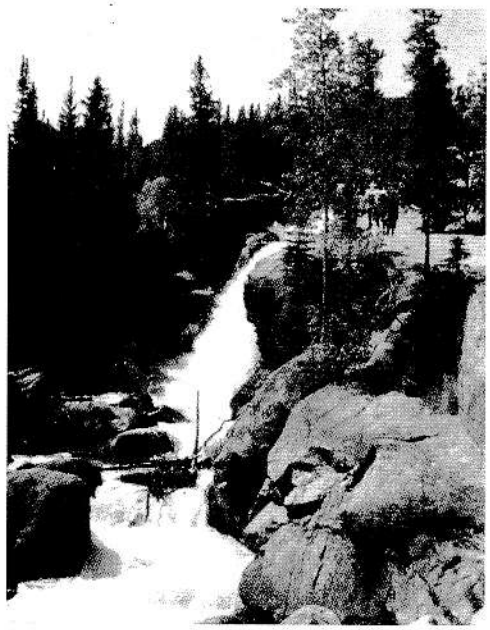

ফেলে একাই রওনা হলেন স্পেক। আবিষ্কার করলেন সেই হ্রদটি, যার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। তিনি এর নাম দিলেন 'ভিক্টোরিয়া হ্রদ'। হ্যাঁ, এই হ্রদই নীলনদের উৎস, আর কোনো সন্দেহ রইল না।

স্পেক নীলনদের উৎসের খোঁজ পেয়ে তো মহাখুশি। তিন বছর অভিযান করে খুশির সংবাদ নিয়ে দেশে ফিরলেন স্পেক।

কিন্তু এ কী হল! লন্ডনে ফেরার পর লোকেরা তাঁর কথা বিশ্বাসই করতে চাইল না। উপরন্তু হাসাহাসি শুরু করে দিল। উপহাস করতে লাগল। যেখানে এতবড় একটা খুশির খবর শুনে সবার আনন্দিত হবার কথা, সেখানে কিনা হাসাহাসি! কী আর করা যাবে, যা কপালে আছে তাই তো হবে। আবার তাঁকে ১৮৬০ সালে জেমস গ্রান্ট নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে যেতে হল সেখানে। শুরু হল প্রমাণের পালা। তাঁদের পাঠিয়েছিল রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। রওনা দেবার আগেই নীলনদের একটা নকশা তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁরা। সেই নকশা বা ম্যাপ অনুযায়ী এগোতে থাকেন। কিন্তু মিশরের কাছে নীলনদের তীর ঘেঁষে না-চলার ফলে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন না। এদিকে দ্বিতীয় উৎস এ্যালবার্ট হ্রদেরও কোনো খোঁজ মিলল না। ১৮৬৩ সালে কোনোকিছু আবিষ্কার না করেই ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে।

তখনও লোকের মধ্যে সন্দেহের অন্ত নেই। আর থাকবেই বা না কেন? স্পেক তো আর প্রমাণ করে দেখাতে পারেননি নীলনদের উৎস আসলে কোথায়। তখন কেউ কোনো সিদ্ধান্তেও আসতে পারছে না। মহা মুশকিল। এমনি সময় এই সমস্যা সমাধানের জন্য আয়োজন করা হল বার্টন ও স্পেকের মধ্যে এক বিতর্ক অনুষ্ঠানের। উদ্দেশ্য ছিল বিতর্কের ফলাফল থেকেই বোঝা যাবে যে, সত্যিই স্পেক নীলনদের উৎসের খোঁজ পেয়েছেন কি না।

কিন্তু ঠিক বিতর্কের দিন ঘটল দুর্ঘটনা। স্পেক নিহত হলেন শিকার করতে গিয়ে। একজায়গার বেড়া পেরিয়ে যাবার সময় তাঁর বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে তাঁকেই বিদ্ধ করে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৬৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ার (Wiltshire) কাউন্টিতে। যে-লোকটি আফ্রিকার মতো পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর অঞ্চলে অভিযান করে নিরাপদে ফিরে এসেছেন, তারই এমন অদ্ভুতভাবে মৃত্যু হল! নীলনদের উৎস যে ভিক্টোরিয়া হ্রদ, তা আর হ্যানিং স্পেকের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হল না।

এরপরে অবশ্য ১৮৮৫ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী স্যার স্ট্যানলি প্রমাণ করেন যে, নীলনদের উৎসের মূলে আছে দুটি হ্রদ। প্রধান উৎস হল স্পেকের আবিষ্কৃত ভিক্টোরিয়া হ্রদ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ্যালবার্ট হ্রদ। বর্তমানে অভিযান চালিয়ে দেখা গেছে যে, টলেমির কথাও ঠিক। নীলনদের উৎসে আছে সেই চাঁদের পাহাড় (আফ্রিকার রুয়েনজোরি পর্বত) আর তার বরফ-গলা পানি। আসলেই তাই। এ্যালবার্ট ও এডওয়ার্ড হ্রদের মাঝখানে সেমলিকি নদী, তার ডানদিকেই সেই পাহাড়। তবে সে পাহাড় চাঁদের পাহাড় নয়, সেটি আফ্রিকার রুয়েনজোরি পাহাড়। সেই পাহাড়ের বরফ-গলা পানিই ঐ হ্রদদুটির মধ্যে পানির যোগান দেয়।

তাহলে আমরা দেখছি যে, জন হ্যানিং স্পেকই প্রথম নীলনদের উৎস আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, তাঁর জীবদ্দশায় কেউ তাঁর এই আবিষ্কারের মূল্যই দেয়নি। তবে এখন আসল আবিষ্কারক কে, তাঁরা ঠিকই চিনতে পেরেছে।

অক্টোপাস কাঁকড়া খেতে ভালোবাসে

আটটি বাহুর জন্যেই অক্টোপাসের এই নামকরণ। কোনো কোনো প্রজাতির অক্টোপাস সমুদ্রের আট হাজার মিটার গভীরে থাকে, কোনো কোনো প্রজাতির অক্টোপাস আবার থাকে মাত্র দু-চার মিটার পানির তলায়। বিভিন্ন শ্রেণীর অক্টোপাসের আকারভেদ আছে। আটটি বাহু মেললে অনেক অক্টোপাসের ঘের হবে অর্ধ মিটারেরও কম। এরা আকারে ছোট। বিশালাকৃতির অক্টোপাস যখন তার আটটি বাহু মেলে দেয় তখন চার-পাঁচ মিটার পর্যন্তও দূরে হাত বাড়াতে পারে। এই ধরনের বিশাল অক্টোপাস আফ্রিকা ও আমেরিকার আশেপাশের সমুদ্রে আর ভূমধ্যসাগর ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তরদিকে পাওয়া যায়। অক্টোপাসরা সাধারণত রাতেরবেলা খাবারের খোঁজে বের হয়। এরা মাছ, কাঁকড়া ও অন্যান্য জলজ প্রাণী খায়—কিন্তু খাদ্য হিশেবে কাঁকড়াই এদের বেশি পছন্দ। শিকার ধরার ব্যাপারে অক্টোপাসের বাহুগুলো খুব কাজে লাগে। এই বাহুগুলো শক্তিশালী ও মজবুত এবং মাংসপেশির দ্বারা শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই বাহুগুলো দিয়ে অক্টোপাস শিকারকে আঁকড়ে ধরে। এদের মুখের আকৃতি ছুঁচলো এবং গঠন কঠিন ধরনের। মুখ দিয়ে ওরা শিকারকে কামড়ে ধরে। যদি কোনো কঠিন বর্মধারী শিকারকে পাকড়াও করে তাহলে নিজের জিভ দিয়ে তার শরীরে ফুটো করে নিজের বিষ ঢেলে দেয়। অক্টোপাসের শরীরের এই বিষাক্ত পদার্থ তার শিকার ধরার কাজে খুব সাহায্য করে। এই বিষ ঢেলে দিলে শিকার নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অক্টোপাস তার বাহুর সাহায্যে সাঁতার কেটে সমুদ্রের ওপর পর্যন্ত উঠে আসতে পারে। কিন্তু অক্টোপাস হাতগুলো পিঠের দিকে মুড়তে পারে না। তাদের পেটের মধ্যে যে ছিদ্র আছে তার সাহায্যে তীব্র বেগে পানি বের করে এরা চোখের নিমেষে অন্যদিকে ঘুরে যায়। অক্টোপাস সমুদ্রের গর্তে ডিম পাড়ে। একসঙ্গে ১৫,০০০ পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। এই ডিমগুলো আকারে গোল এবং রঙ সাদা। স্ত্রী অক্টোপাস ডিম পাহারা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে এবং আকারে একটু বড় হলে মাটিতে ছেড়ে দেয়। অক্টোপাসের বোধশক্তি প্রবল। এরা শিকার দূর থেকেই লক্ষ করতে পারে আর শত্রুদেরও দূর থেকেই চিনে নেয়। এদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। অক্টোপাস দেখতে ভয়ানক হলেও মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না। বরঞ্চ অনেক দেশের মানুষই অক্টোপাসের সুস্বাদু মাংস খেতে ভালোবাসে।

বিদ্যাসাগরের হাসিঠাট্টা

মহাত্মা গান্ধীর মতো রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বাংলায় একের-পর আর-এক মহৎ মানুষ জন্মেছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহত্তম; জগতে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের সংখ্যা অল্প। লোকে বলে : প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর। লোকের মুখে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও নামের সঙ্গে কি 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দটি শোনা যায়? আমি অন্তত শুনিনি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ। তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্বের সঙ্গে হাসিঠাট্টার কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে, লোকে বিদ্যাসাগরের কথাবার্তা মুগ্ধ হয়ে শুনত, হাসিঠাট্টায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরের লেখায় অনেক হাসিঠাট্টা ছড়িয়ে আছে। একটি নমুনা তুলে দিচ্ছি।

'এক বড় মানুষের কতকগুলা উমেদার ছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে, বাবু, পার্শ্ববর্তী গৃহে গিয়া, আহার করিতে বসিলেন, উমেদারেরাও সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া, বাবুর আহার দেখিতে লাগিলেন। নতুন পটোল উঠিয়াছে, পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে। বাবু দুই চারি খান পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জঘন্য তরকারি; ঝোলে দিয়া, ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, উমেদাররা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কী অন্যায়! আপনার ঝোলে পটোল!! পটোল তো ভদ্রলোকের

খাদ্য নয়। কিন্তু ঝোলে যতগুলো পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকলগুলোই খাইলেন এবং বলিলেন, দেখ, পটোলের তরকারি বড় মন্দ নয়। তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, সুক্তায় দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়; বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা ত বেস লোক, যেই আমি বলিলাম, পটোল ভালো তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে। যেই আমি বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয় আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই, উমেদার আপনার; আপনি যাহাতে খুশি থাকেন, তাহাই আমাদের সর্বপ্রযত্নে কর্তব্য। এই উত্তর শুনিয়া, বাবু নিরুত্তর হইলেন।'

কেবল কলমের লেখায় নয়, মুখের কথায়ও বিদ্যাসাগর চমৎকার হাসিঠাট্টা করেছেন। কয়েকটি নমুনা দাখিল করি।

● ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত কলকাতায় এসেছেন একজন বড়মানুষের কাছে বার্ষিক বৃত্তি আদায় করতে। আগের কালে বড়মানুষেরা সংস্কৃতপণ্ডিতদের অকাতরে বৃত্তি দিতেন, কিন্তু সে দিন আর নেই।

কাজ সেরে ফিরতি পথে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা। কথায়-কথায় একজন পণ্ডিত বললেন, 'আজকাল ব্রাহ্মণদের আর ব্রহ্মতেজ নেই।'

প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে বললেন, 'সে কী কথা! না, আপনি ভুল বলছেন। আজকাল বরং ব্রহ্মতেজ অনেক বেড়ে গেছে। আগের কালে আপনারা কারও কাছাকাছি হলে তিনি আপনাদের তেজ টের পেতেন। কিন্তু আজকাল আপনাদের তেজ এত বেড়ে গেছে যে, আপনারা কোনো বড়মানুষের দরজা পেরোলে সেই বড়মানুষও গরম হয়ে ওঠেন।'

● বিদ্যাসাগরকে একবার একটি ছাত্র জিজ্ঞেস করল, 'কী উপায়ে নির্ভুল লেখা যায়?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'খুব সোজা একটা উপায় আছে। সে উপায় মেনে চললে কখনও ভুল হবে না।'

'এমন কী উপায় আছে?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'কখনও লিখো না।'

● বিদ্যাসাগরের কাছে একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষে চাইতে এসেছে। বলল, 'মশায় বড় দুরাবস্থা।'

'দুরাবস্থা' কথাটা হল ভুল। র-এর পর া হবে না; অর্থাৎ আকার হবে না; আকার বদলাতে হবে, অকার করতে হবে। নির্ভুল করতে হলে 'দুরবস্থা' বলতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'আকার বদলে এসো।'

বিদ্যাসাগরের কথার ভুল মানে করল ব্রাহ্মণটি। ভাবল, তাকে বুঝি সাজপোশাক বদলে আসতে বলা হচ্ছে। তাই করল সে। পোশাক আশাক বদলে এল। এসে সেই এক কথা, 'মশায় বড় দুরাবস্থা।'

যতদিন আসছে, ওই 'দুরাবস্থা' বলছে আর বিদ্যাসাগরের মুখে শুনে যাচ্ছে, 'আকার বদলে এসো।'

শেষপর্যন্ত রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে গেল ওই ব্রাহ্মণ। প্রত্যেকবার আকার বদলে গিয়েও কেন বিদ্যাসাগরের মুখে একই কথা শুনতে হচ্ছে?

রামসর্বস্ব বুঝিয়ে দিলেন, ওই 'দুরাবস্থা' বলার জন্যই এমন হচ্ছে। বলে দিলেন 'দুরবস্থা' বলতে হবে।

এবার আর ব্রাহ্মণটি ভুল করল না। বিদ্যাসাগরকে এসে বলল, 'মশায় আমার বড় দুরবস্থা।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তুমি আকার বদলেছ, এবার তোমার কথা শুনব।'

● বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন। অনেক মান্যগণ্য ভদ্রলোক এসেছেন। তাদের মধ্যে দু'জন স্বনামধন্য মানুষ আছেন—বিদ্যাসাগর আর দীনবন্ধু মিত্র।

বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন, অতএব ভূরিভোজনের বন্দোবস্ত। রকমারি খাবারদাবার তৈরি হচ্ছে। প্রায় সব রান্নাই হয়ে গেছে, আর আধঘণ্টাখানেক সময় পেলেই সব নিখুঁত হয়ে যাবে।

কিন্তু বড়বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি দেখে কেউ-কেউ কেটে পড়বার চেষ্টা শুরু করলেন।

তা এটা খুব দুঃখের কথা। যার বাড়িতে নেমন্তন্ন, তার পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। নিরুপায় হয়ে তিনি এসে বিদ্যাসাগরকে ধরলেন। বললেন, 'আপনি যদি দয়া করে কোনোরকম ভদ্রলোকদের আধঘণ্টাখানেক আটকে রাখতে পারেন!'

গায়ের জোরে আটকে রাখার কথা নয় নিশ্চয়ই। গল্পের জোরে আটকে রাখার কথা।

বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুকে বললেন, 'দীনবন্ধু, আমি একটা করে গল্প বলব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।'

বিদ্যাসাগর গল্প আরম্ভ করলেন :

'একদিন এক ভদ্রলোক তার বন্ধুকে গিয়ে বললেন : ভাই, আমি ভীষণ অন্যমনস্ক। সেদিন কী করেছি জানো? সামান্য কাগজ মনে করে একখানা হাজার টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, ছেঁড়া

নোট দিয়ে কান চুলকোচ্ছিলাম। ভাগ্যিস, আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা, তাই শেষরক্ষা হল, নয়তো হাজারটি টাকার লোকসান হত।'

কিন্তু বন্ধুও কম যান না। তিনি বললেন, 'ভাই, অন্যমনস্কতার কথা আর বোলো না। অন্যমনস্কতার জ্বালায় জ্বলে মরছি। সেদিন রাত্রে একগাছা লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বাড়িতে ফিরে মনের ভুলে খাওয়াদাওয়া না করে সটান শোবার ঘরে চলে গেছি। তারপর কী হল শোনো, কোথায় লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে আমি বিছানায় শোব তার বদলে কিনা লাঠিগাছাকে বিছানায় শুইয়ে আমি নিজে সারারাত ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোরবেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়ল সব, তিনি আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, লাঠিগাছাকে ঘরের কোনায় রেখে দিলেন। ভাগ্যিস, ভোরবেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল, তাই খানিকক্ষণ অন্তত ঘুমোতে পেলাম, নয়তো আমাকে না-ঘুমিয়ে ঠায় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

বিপুল হাস্যরোল।

এবার দীনবন্ধু মিত্রের পালা। দীনবন্ধুও একটি গল্প বললেন। বিপুল হাস্যরোল।

আসর জমে উঠেছে। গল্পে মশগুল হয়ে আছেন সকলে। ওদিকে রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে, আসন পড়েছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারও গরজ নেই। গল্প শুনেই যেন সকলের পেট ভরবে। গল্পের আসর ছেড়ে কেউ আর উঠতে চান না।

বাড়ির যিনি কর্তা তিনি পড়লেন আর এক বিপদে। হাতজোড় করে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'মশাই, এক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আপনি আমাকে আর এক বিপদে ফেললেন। সব খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ আর খেতে যাচ্ছেন না, সকলেই গল্পে মজে আছেন। দয়া করে গল্প বন্ধ করুন।'

সহাস্য মুখে বিদ্যাসাগর গল্প বন্ধ করলেন। হাসতে হাসতে খেতে গেলেন সকলে।

● বিদ্যাসাগরের ছোটভাইয়ের নাম ঈশানচন্দ্র, ছেলের নাম নারায়ণচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের বাবা খুব ভালোবাসতেন ঈশান আর নারায়ণকে। এত ভালোবাসতেন, ওরা দু'জন বলতে গেলে, অন্যের শাসনের বাইরে।

বিদ্যাসাগর একদিন বাবাকে বললেন, 'আপনি না নিরামিষাশী! আপনাকে নিরামিষাশী বলে? আপনি দুটি বেলা ঈশান আর নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী!'

● বিদ্যাসাগর একটা ভোজনসমিতির সভ্য। মাত্র ন-দশজন সভ্য ওই সমিতিতে। সভ্যেরা দল বেঁধে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক এক স্বজনবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে আমোদ করে খাওয়াদাওয়া করতেন।

একবার জাঁকালো গোছের খাওয়াদাওয়া করে সমিতির একজন সভ্যের পেটের অসুখ হল। কেউ কেউ বললেন, 'এর পেটের অসুখ আছে, এঁকে আর সভ্য রাখা চলবে না, এঁকে ভোজনসমিতি থেকে খারিজ করে দিতে হবে।'

বিদ্যাসাগর আপত্তি করে বললেন, 'না হে, ওকে খারিজ করলে অধর্ম হবে। খেয়ে যে প্রাণ দিতে পর্যন্ত রাজি তাকে বিদায় করে দিলে কাকে নিয়ে থাকবে?'

● কৃষ্ণদাস পালকে সুপুরুষ বলা চলে না। দ্বারকানাথ মিত্রকেও না। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে তুলনায় কার চেহারা বেশি বিশ্রী? বিদ্যাসাগর কী বলেন?

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের ঘরে একদিন গল্পগুজব হচ্ছে। সেখানে আছেন বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র এবং আরও অনেকে। কে একজন লোক জানালায় উঁকি দিচ্ছে। বারংবার উঁকি দিচ্ছে কেন?

লোকটিকে ডেকে আনা হল। ঘরের মধ্যে এসে মাথা নিচু করে জড়োসড়ো হয়ে রইল সে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, 'বাপু, অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন?'

ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'জজ দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনে তাকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলাম।'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কী? তাকে চেনো?'

বলে কৃষ্ণদাসকে দেখালেন। তারপর বললেন, 'এর নাম কৃষ্ণদাস পাল। এখানে এর চেয়ে যেটি সুন্দর সেটিই দ্বারিক মিত্তির।'

● তিন-চারজন পণ্ডিতকে নিয়ে একবার লাটদরবারে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিতেরা দেখলেন, বাঙালি ছাড়া আর সকলের মাথায় উষ্ণীষ।

পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসু হলেন—বাঙালি ছাড়া সকলের মাথায় উষ্ণীষ, এর কারণ কী?

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন, 'বাঙালি মাতৃভূমির আর কোনো কাজ করতে পারেনি; মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করে মাতৃভূমির ভার কমিয়েছে।'

● বিদ্যাসাগরের কাছে একদিন কয়েকজন লোক একজন নেশাখোর সম্পর্কে অনেক কথা বলছিলেন। অনেকক্ষণ সেই নেশাখোরের কথা শুনলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন, 'অত কথা বলছ কেন, এক কথায় বলো না সে আমার প্রথম ভাগের গোপাল।'

কথাটার মানে কেউই বুঝতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর তখন বিশদ করে বললেন, 'এটা আর বুঝতে পারলেন না? প্রথম ভাগে পড়োনি, 'গোপাল বড় সুবোধ ছেলে, যা পায় তাই পরে, যা পায় তাই খায়'? ইনিও তাই—যা পান তাই খান। এটা খাব না, ওটা খাব না বলে উৎপাত করেন না।'

● মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে একবার একটা আশ্চর্য মজার কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। সে ঘটনা বলতে গেলে দুঃখের কথা থেকে আরম্ভ করতে হয়। মজার কথা আছে ঘটনার একেবারে শেষের দিকে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব চিরকাল রইল না। অনিবার্য কারণে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের ওপর বিরূপ হলেন। বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

কিছুকাল পর মদনমোহন মারা গেলেন।

মদনমোহনের মা তখনও বেঁচে আছেন। মদনমোহনের মায়ের নাম বিশ্বেশ্বরী। তিনি বিল্বগ্রামে থাকেন। মদনমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পর বিল্বগ্রাম থেকে দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় এলেন তিনি। উপযুক্ত ছেলে মারা গেছে, তিনি শোকেদুঃখে কাতর। কেঁদে আকুল।

দু-তিনদিন পর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, 'তর্কালঙ্কার আপনার কীরকম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'মদন আমার কোনো ব্যবস্থা করে যায়নি। আমার দিন চলার কোনো উপায় নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি দয়া করে খেতে পরতে দাও, তবেই আমার রক্ষা। নয়তো আমাকে না-খেয়ে মরতে হবে।'

মদনমোহনের মা কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশ্বস্তসূত্রে তিনি শুনেছেন, তর্কালঙ্কার বিস্তর টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন, অথচ তার মাকে কিনা ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষে করতে হচ্ছে!

যাই হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মদনমোহনের মা বললেন, 'মাস-মাস দশ টাকা পেলে আমার চলে যায়।'

খাওয়া-পরার অভাবে, রোগে-শোকে মদনমোহনের মায়ের শরীর অত্যন্ত কাহিল। চোখে ভালো দেখতে পান না। মদনমোহনের মা বললেন, 'শরীর যদি আমার সুস্থ থাকত, চোখে যদি আমার অসুখ না থাকত, তা হলে পাঁচ টাকাতেই আমার চলে যেত। কিন্তু শরীর আর চোখের যা দশা, একটি বামুনের মেয়ে না-রাখলে কিছুতেই আমার চলবে না। আমার এখন যেরকম ব্যবস্থা, বেশিদিন আমি বাঁচব না। বেশিদিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।

বিদ্যাসাগর মাসে মাসে দশ টাকা দিতে রাজি হলেন। মাসে মাসে দশ টাকা পাঠাতে লাগলেন মদনমোহনের মাকে। বিল্বগ্রামের ঠিকানায়।

কিছুদিন পর মদনমোহনের মা আবার কলকাতায় এলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'বাবা, তুমি আমার ভাত-কাপড়ের কষ্ট দূর করেছ। আর এক বিপদে পড়ে আবার তোমায় জ্বালাতন করতে এসেছি।'

কিন্তু এ বিপদে বিদ্যাসাগর কিছু করতে পারেন না। কেননা, এ বিপদ ঘটেছে একেবারে তাদের আপন সংসারে। নিতান্ত আপনাআপনির মধ্যে। সংসারে বসে তাকে নানারকম গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, অপমান সইতে হচ্ছে। বিদ্যাসাগর বললেন, 'মা, এ ব্যাপারে তো আমার কিছু করার সাধ্য নেই। আপনার মুখে যা শুনলাম আপনার আর সংসারে থাকার দরকার কী। আমার বিবেচনা, কাশীতে গিয়ে বাস করাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। আমার বাবা কাশীতে আছেন। আপনি যদি মত করেন তো আপনাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। আমার বাবা আপনার বাসা ঠিক করে দেবেন, সব সময় দেখাশোনা করবেন, তার কাছে মাসে মাসে আপনি দশ টাকা পাবেন, যা শুনি, মাসে দশ টাকায় সেখানে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।'

তিনি রাজি হলেন। বিদ্যাসাগর তাকে কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন। কাশীতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তার শরীর ভালো হয়ে গেল। চেহারা এমন বদলে গেল, এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল যে, বছরখানেক বাদে কাশীতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাকে চিনতে পারলেন না। সত্যি সত্যি চিনতে পারলেন না।

তিনি নিজেই তখন বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'বাবা, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, আমি মদনের মা।'

খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন বিদ্যাসাগর। চিনতে পারলেন। তারপর বললেন, 'আপনি জুয়াচুরি করে আমাকে বিলক্ষণ ঠকিয়েছেন!'

'জুয়াচুরি!' শুনে মদনমোহনের মা একটু ভয় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, আমি কী জুয়াচুরি করেছি?'

বিদ্যাসাগর বললেন, 'শুকনো হাত আর কানা চোখ দেখিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'আমার যা অবস্থা তাতে আমি বেশিদিন বাঁচব না, বেশিদিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।' কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অন্তত আরও বিশ বছর আপনি বাঁচবেন। আগে যদি বুঝতে পারতাম আমি আপনাকে মাসে মাসে দশ টাকা দিতে রাজি হতাম না!'

না, ভয় পাওয়ার মতো কথা নয়, হেসে ওঠার মতো কথা। মদনমোহনের মা হাসতে লাগলেন।

ইউনিফর্ম

ধরা যাক, তোমাদের শহরে তুমি একদিন হারিয়ে গেছ। বাড়ি যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছ না। কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। প্রথমে তুমি একজন পুলিশকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। পুলিশ তোমাকে সাহায্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত। যে-কোনো পুলিশকে পেলেই চলবে। ব্যস্ত রাস্তায় খুব সহজেই তুমি পুলিশের দেখা পাবে।

কিন্তু পুলিশদের তুমি চিনবে কীভাবে? খুবই সোজা কাজ। পোশাক দেখলেই চেনা যায়—এরাই পুলিশ। সব পুলিশ একই রকম পোশাক পরবে এবং এই পোশাক আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। তুমি তোমার দেশের যেখানেই যাও না কেন, সেখানেই তুমি পুলিশদের দেখা পাবে। পোশাক বলে দেবে, কারা পুলিশ।

একই রকম পোশাক পরাকে বলা হয় ইউনিফর্ম। আরও অনেক পেশার মানুষ 'ইউনিফর্ম' পরে। পৃথিবীর সবখানেই নার্সরা শাদা অ্যাপ্রোন ধরনের পোশাক পরে থাকে। সৈন্যবাহিনীরও ইউনিফর্ম পরে থাকতে হয়। অনেক জায়গায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয় ইউনিফর্ম পরে।

একই পেশা কিংবা একই কাজে সবার সমান অংশগ্রহণ এটা বোঝাতেই ইউনিফর্মের চল হয়েছে। তাতে আমরা সহজেই নির্দিষ্ট পেশার একটা দলকে বুঝে ফেলতে পারি। ইউনিফর্ম দেখেই চেনা যাবে সে হয়তো কোন কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

খায়রুল আলম সবুজ

লা জিওকোন্ডো

দিনের আলো নরম হয়ে যখন বুনো পথে বিছিয়ে থাকে, তখন বিকেলের দিকে, সেই পথ ধরে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে আসেন একজন তরুণী— জিওকোন্ডো। অন্যদিকে অন্য আর একজন রঙ ছড়িয়ে তুলি হাতে বসে থাকেন। জিওকোন্ডোর ছবি আঁকবেন বলে তিনি বসে থাকেন। পড়ন্তবেলার আদুরে রোদ সারাগায়ে মেখে জিওকোন্ডো এসে মৃদু টোকা দেয় শিল্পীর নির্জন স্টুডিওর দুয়ারে। দরজা খুলে যায়। জিওকোন্ডো এসে বসে পড়েন প্রতিদিনের নির্ধারিত জায়গাটিতে। তারপর একটানা কাজ চলে রাত অব্দি। এভাবেই তিন বছর অবিরাম। ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা।

রঙতুলি নিয়ে যিনি ছবি আঁকেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। আর যিনি মডেল হয়ে সামনে নিথর বসে থাকেন তিনি মিসেস জিওকোন্ডো। এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি হল ভুবনবিখ্যাত চিত্রশিল্প : মোনালিসা।

জিওকোন্ডোর স্বামী ফ্রান্সেসকো জিওকোন্ডো। তিনি মাঝে-মাঝেই ছবিটা দেখতে চান, কিন্তু শিল্পী বলেন, 'ছবি এখনো শেষ হয়নি। শেষ হলে দেখাব।' ছবি একসময় শেষ হয় কিন্তু সে ছবি ফ্রান্সেসকোর কখনো দেখা হয় না। লিওনার্দো যেখানেই যান এই ছবি সঙ্গে নিয়ে যান। শেষমেশ নিজের দেশ ইতালি ত্যাগ করে চিরতরে চলে যান ফরাসি দেশে, সেখানেও সঙ্গে থাকে জিওকোন্ডোর ছবি।

পাঁচশত বছর ধরে 'মোনালিসা' বা 'জিওকোন্ডো' বিশ্বজুড়ে মানুষের ভালোবাসা পেতে পেতে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। এখন সে প্যারিসের ল্যুভ্‌র মিউজিয়ামে কড়া পাহারায় ঝুলছে। কোনো একসময় ল্যুভ্‌র ছিল ফরাসি রাজাদের প্রাসাদ। কালক্রমে সেটা রূপান্তরিত হয়েছে জাদুঘরে। মোনালিসা সেই জাদুঘরেই এখন স্থায়ীভাবে থিতু হয়েছে। ল্যুভ্‌র মিউজিয়াম প্রধানত চিত্রশালা। এখানে আরো রয়েছে সুপ্রাচীন সব মহামূল্য জিনিসপত্র। ফ্রান্সের ল্যুভ্‌র জাদুঘর পৃথিবীর এক বিশেষ আকর্ষণ।

মোনালিসা শেষ করার পর বেশ কিছুদিন লিওনার্দো ইতালিতেই ছিলেন। রোম নেপলস বা মিলানে এখানে-ওখানে ইতালির মধ্যেই, প্রায় দশ বছর। যেখানেই গেছেন মোনালিসা তিনি হাতছাড়া করেননি। তারপর ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তিনি চিরতরে পাড়ি জমালেন ফ্রান্সে। সেই থেকে মোনালিসা সেদেশেরই সম্পদ।

একবার দু'বার মোনালিসা অবশ্য প্যারিসের বাইরে গিয়েছে। প্রথমবার কারা যেন তাকে চুরি করেছিল। সেটা ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। তারপর দু-বছর তার কোনো খোঁজই ছিল না। অবশেষে চোরসহ ছবি ধরা পড়ে ইতালিতে। সেখান থেকে উদ্ধার করে আবার প্যারিসে নিয়ে আসা হয়। মোনালিসা এমনই এক চিত্রকর্ম যে তাকে চুরি করেও রাখা যায় না।

দ্বিতীয়বার সে বেরিয়েছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশকে। আমেরিকার সুদর্শন প্রায়-যুবক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তাকে আমেরিকাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মোনালিসা যায় মাননীয় প্রেসিডেন্টের অতিথি হয়ে। সতর্ক এবং কড়া পাহারায় মোনালিসা সেবার ছাব্বিশ দিন আমেরিকাতে ছিল।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যখন মোনালিসা আঁকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ৫১ বছর আর জিওকোন্ডোর বয়স ২৪ বছর। হতে পারে, দীর্ঘ তিন বছর একই শিল্পকর্মে দু'জন কাছাকাছি থাকতে থাকতে তাদের মধ্যে কোনো মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর সেটা স্বাভাবিকও। হয়তো এ-কারণেই জিওকোন্ডোর স্বামী ফ্রান্সেসকো ডেল জিওকোন্ডোর এ ছবি আর দেখা হয়নি।

ফরাসি রাজা প্রথম ফ্রান্সিস বসবাসের জন্য লিওনার্দোকে লয়ার ভেলিতে প্রাসাদের মতো একটি বাড়ি দিয়েছিলেন। অপূর্ব সুন্দর সে বাড়ি। লিওনার্দো সেখানেই থাকতেন। এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে রাজা প্রথম ফ্রান্সিস লিওনার্দোকে মোনালিসার জন্য চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন কিন্তু শিল্পীর জীবদ্দশাতে এ ছবি রাজা হাতে পাননি। লিওনার্দোর মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সের এই ভদ্রমহিলার হাসিটি রাজার সম্পদে পরিণত হয়। তারপর থেকে এ ছবি ফরাসি রাজা ও সম্রাটদের সম্পত্তি এবং এ সম্পত্তি তাঁরা এমনভাবে আগলে রেখেছেন যে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মোনালিসা ফরাসি-সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ব্যক্তিগত শোবার ঘরেই ছিল।

হাস্যকৌতুক

বিমানবাহিনীতে যোগদান করবে বলে এক যুবক ইন্টারভিউ দিতে গেছে।

প্রশ্ন : সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী—এই তিনটি দেশরক্ষা বাহিনীর মধ্যে তুমি বিমানবাহিনীকে পছন্দ করলে কেন?

উত্তর : একমাত্র বিমানবাহিনীর যোদ্ধারাই পালানোর সময় ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ছুটতে পারে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সাহেব ডাকাত দেশী ডাকাত

জেলা ময়মনসিংহ। রতনপুরের নীলকুঠি। কুঠির দেওয়ান নবকুমার বসু। নবকুমার বাবুর মতো লোক সেকালে বড় একটা দেখা যাইত না। তিনি অনেকদিন দেওয়ানি কাজ করেন... প্রজাদের উপর কোনো অত্যাচার হয় না। পয়সা-কড়ি তাহারা ঠিকমতো পায়।

ওই সময়ে নীলকুঠির সাহেব ছিলেন মি. ম্যাকেঞ্জি নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। তিনি প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় প্রজাদের ডাকিয়া বাইবেল পড়াইয়া শুনাইতেন। বলিতেন—'যিশুর আদেশ ও উপদেশ শুন টোমরা। সট্‌পঠে চলো। সট্‌কথা বলো। ঈশ্বরকে ভক্তি করো। সব ধর্ম সমান।'

সাহেব রোগীর সেবা, দরিদ্র মানুষদের অর্থ সাহায্য করিতেন। ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পোশাকটা ছিল অনেকটা পাদরিদের মতো। ঢোলা লম্বা জামা পরিয়া, কোমরে ফিতা বাঁধিয়া লম্বা লাল দাড়ি ঝুলাইয়া সাহেব পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেন। পাড়ার হিন্দু মুসলমান ছোট-ছোট ছেলেরা সাহেবের হাত ধরিয়া চলিত—পয়সা চাহিত, খাবার চাহিত। সাহেব হাসিমুখে সবই উহাদের দিতেন। ওই সরল হৃদয় সাধু-চরিত্র ম্যাকেঞ্জি সাহেব দেওয়ান নবকুমারবাবুকে বলিতেন—'বড় দুঃখী, বড় গরিব, এই দেশের লোক। কোনো অট্টাচার করো না।'

নবকুমারবাবু মহাপ্রাণ সদাশয় সাহেবের আদর্শে কাজ করিতেন—কুঠির কাজও ভালো হইত। ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে নীলকুঠির অন্যান্য সাহেবরা এমনকি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম দারোয়ানরাও সহ্য করিতে পারিত না।

দাঙ্গা নাই, হাঙ্গামা নাই, কোনো গোলমাল নাই। প্রজারা ভালো কাজ করে, ফলে নীলের চাষও ভালো হয়।

একদিন সাহেব নবকুমারকে বলিলেন—'আমি ডেশে চলে যাব। টুমি যদি পারো কাজ ছেড়ে দিও। আমি ডেশে ঢর্ম প্রচার করে বেড়াব।'

তিনি কাজেও তাহাই করিলেন। কিন্তু নবকুমার কাজ ছাড়িলেন না। তিনি কুঠির দেওয়ানই রহিলেন।... বড় পরিবার—চাকরি না করিলে চলিবে কী করিয়া। যদি কাজ ছাড়িতেন, তাহা হইলে ভালোই হইত।

ম্যাকেঞ্জি বিলাত চলিয়া গেলেন। রতনপুরের নীলকুঠির নূতন অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন মি. ল্যাডলি। বয়স তেইশ বছর। দুর্দান্ত স্বভাবের তরুণ। এক ইংরেজ চাষার ঘরের ব্রিটিশ সন্তান।

দুই

ল্যাডলি শুনিয়াছিল—নীলকুঠির সাহেবরা এই দেশ হইতে অজস্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যায়। তাই প্রথম হইতে ল্যাডলি সাহেবের এইদিকে দৃষ্টি রহিল। কয়েকদিন পরেই ল্যাডলি নবকুমারকে বলিল—'দেওয়ান! তুমি আমাকে দু'হাজার টাকা দাও—যেমন করেই পারো।'

নবকুমার বলিলেন—'তা কেমন করে হবে, সাহেব। কুঠি-তহবিল ভেঙে আমি টাকা দিতে পারব না।'

সাহেব বলিল —'সে দায়িত্ব আমার।'

নবকুমার বলিলেন, —'আমি দেওয়ান। তহবিল ভেঙে আমি কিছুতেই টাকা দিতে পারব না।'

—'তবে চাষি মজুরদের কাছ থেকে টাকা আদায় করো, দাদন কমিয়ে দাও।'

—'তা হয় না সাহেব। আমি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের আমলের লোক। আমি পারব না গরিব চাষিদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে।'

সাহেব বলিল—'অল রাইট।'

একদিন কুঠির উত্তর-পশ্চিম দেশীয় লেঠেল ও বরকন্দাজদের লইয়া ল্যাডলি সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া দেওয়ানের বাড়ি আক্রমণ করিল। কুঠি হইতে দেওয়ানের বাড়ি ছিল মাইলখানেক দূরে।

সাহেব লেঠেল বরকন্দাজদের সাহায্যে দেওয়ানের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিল। অবশেষে বন্দুক ছুড়িয়া, মশাল জ্বালিয়া, ঘরবাড়িতে আগুন লাগাইয়া, ধানের মড়াই, খাদ্যশস্য ভস্মীভূত করিয়া শয়তান ল্যাডলি সাহেব নবকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল। অবশেষে সাহেব নবকুমারকে দরিয়ানগরের কুঠির এক মালগুদামে বন্দি করিয়া রাখিল। গুদামের দরজায় তালা চাবি লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দরজায় পাহারা বসানো হইল। কাহারও সাধ্য হইল না সেদিকে যায়। বন্দি অবস্থায় নবকুমারের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সাধারণ লোকে এই বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিল না।

ঐ সময় ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. ল্যান্স। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিনি মফস্বল সফরে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে রতনপুরের কাছে বহু লোক জমায়েত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে মি. ল্যাডলি রতনপুরের দেওয়ান নবকুমারের বাড়ি লুটতরাজ করিয়া তাঁহাকে দরিয়ানগরের এক গুদামে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে। তাই প্রজারা ইহার প্রতিকারের জন্য জোট বাঁধিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট এই খবর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া দরিয়ানগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ওখানেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত ল্যাডলির দেখা হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ল্যাডলিকে জিজ্ঞাসা

করিলেন—'মি. ল্যাডলি, এই মালগুদামে তুমি দেওয়ান নবকুমারকে বন্দি করে রেখেছ—এ ঘটনা কি সত্য? বলো।'

ল্যাডলি উদ্ধতকণ্ঠে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, সত্যি।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, —'ওকে তুমি এখুনি গুদাম থেকে ছেড়ে দাও।'

ল্যাডলি মিথ্যা করিয়া বলিল — 'কেন ছাড়ব? সে তহবিলের টাকা তছরূপ করেছে। টাকা আদায়ের জন্যই তাকে আটকে রেখেছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, —'সে অধিকার তোমার নেই। আদালত রয়েছে। সেখানেই বিচার হবে। নালিশ করে প্রমাণ করা উচিত ছিল। দরজা খোলো।'

শেষটায় বাধ্য হইয়া ল্যাডলি মালগুদামের দরজা খুলিয়া দিল। গুদামঘর হইতে মৃতপ্রায় নবকুমারকে বাহির করিয়া আনা হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেখিলেন— নবকুমারের সারা শরীর কাঁপিতেছে। কথা বলিতে পারিতেছে না। কদর্য খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাহার শরীরের এমন হাল হইয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নবকুমারকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। ল্যাডলিকে গ্রেফতার করিলেন। কিন্তু নবকুমারের পক্ষে কোনো সাক্ষী মিলিল না। নীলকুঠির চারদিকে প্রাচীর-ঘেরা মালগুদামে তিনি বন্দি ছিলেন—কে তাঁহার সাক্ষ্য দিবে? কুঠির সকলেই সাহেবের অনুগত। ল্যাডলি সাহেবের ভয়ে মালগুদামের মধ্যে বন্দি নবকুমারের করুণ বিলাপে কাহারও প্রাণ কাঁদিত না।

ম্যাজিস্ট্রেট ল্যাডলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি খাটি ইংরেজের সন্তান হয়ে এতবড় নৃশংস কাজ করতে পারলে? জাতির কলঙ্ক তুমি। তুমি নবকুমারের বাড়ি লুট করেছ?'

ল্যাডলি বলিল—'হ্যাঁ। করেছি।'

'বন্দি করেছ, অত্যাচার করেছ।'

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দুর্দান্ত ল্যাডলি উত্তর দিল—'হ্যাঁ, করেছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট ল্যাডলিকে দুইশত টাকা জরিমানা করিলেন। এক মাসের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। টাকা দিতে না পারিলে আরও দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ল্যাডলি উচ্চ আদালতে আপিল করিয়া মুক্তি পাইল। স্বাধীন ব্রিটিশ সন্তান, তাহার কী সাজা হইতে পারে? সে-যুগের এইরূপ ছিল বিচার। বিচারের নামে বিচারের প্রহসন।

তিন

ব্রজবাসী ডাকাত।

ব্রজবাসী দস্যু। দস্যু হইলেও ব্রজবাসী ছিল মহৎ।

ডাকাত হইলেও সে ডাকাতি করিত ধনীর বাড়ি। সুদখোর মহাজনদের বাড়ি—যাহারা প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া উহাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করিত। ডাকাতির টাকায় সে প্রজাদের ঋণ শোধ করিত। ব্রজবাসী ডাকাতি করিত, আবার চাষ-আবাদও করিত। বড় বড় জমিদারগণ জমি দখল ও লুটতরাজের সময় ব্রজবাসীর সাহায্য লইত। আবার ওদিকে ব্রজবাসী ছিল খাঁটি গৃহস্থ।

অতিথি-সেবা, পূজা-পার্বণ সবদিকেই ব্রজবাসীর দৃষ্টি ছিল। সে ছিল পরম বৈষ্ণব। ডাকাত হইলেও তাহার বাড়িতে নিত্য মহোৎসব ও অহোরাত্র কীর্তন হইত। ব্রজবাসীর অনেক সাগরেদ ছিল। লাঠি, সড়কি, কুস্তি—সকল বিষয়ে সে ছিল ওস্তাদ। ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ! মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল। হাড়মাংসে গড়া দেহ। শরীরের কোথাও এতটুকু মেদবাহুল্য নাই। তাহার হুঙ্কারে গাঁয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইত। ভয় বলিয়া তাহার কিছুই জানা ছিল না।

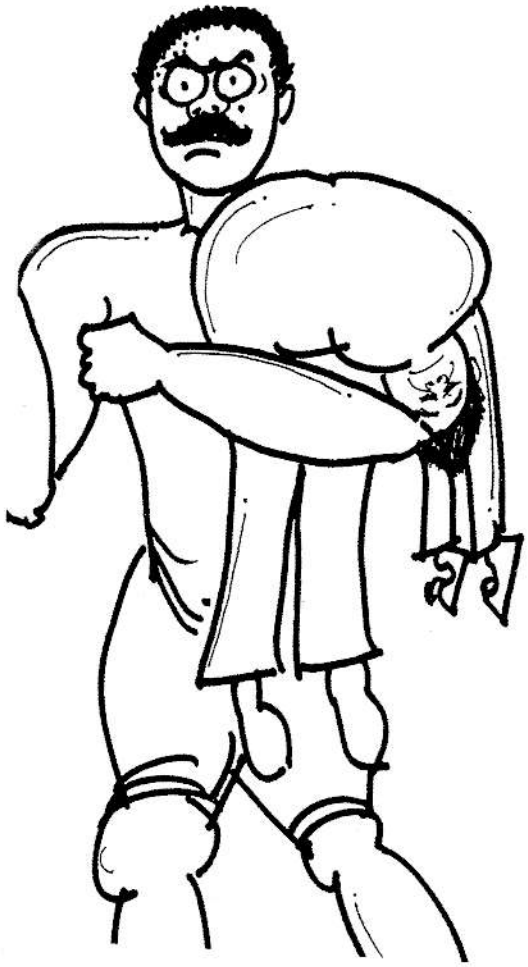

এদিকে ল্যাডলি মুক্তি পাইয়া জোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। সে ঘোড়ায় চড়িয়া নীলক্ষেতে যায়। বিনাদোষে চাষিদের বেত মারে। লাথি মারে, অকথ্য নির্যাতন করে। নবকুমারের স্থলে যে নূতন দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছে সে সাহেবের অপেক্ষা বেশি শয়তান।

ল্যাডলির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া একদিন চাষি-মজুর সকলে জোট বাঁধিয়া ব্রজবাসীর কাছে আসিল। ব্রজবাসী বাহিরের ঘরে বসিয়া কৃষাণদের সহিত কথা বলিতেছিল।

চাষি-মজুরদের মোড়ল অনুনয় করিয়া ব্রজবাসীকে বলিল—'ব্রজদাদা, আমাদের বাঁচান।'

'কী হলো তোমাদের? শীঘ্র বলো।' ব্রজবাসী জিজ্ঞাসা করিল। চাষিদের মোড়ল রামমোহন ব্রজবাসীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ব্রজবাসী শুনিয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করিয়া বলিল—'আচ্ছা, শোধ নিচ্ছি। এতদিন ধরে তোমরা এত অত্যাচার সহ্য করেছ! দেখি কেমন সে লালমুখো।'

এক পক্ষকাল গত হইল। তাহার পর একদিন অন্ধকার রাত্রে ব্রজবাসী নিজের দলের চাষি-মজুরদের লইয়া রতনপুর ও দরিয়ানগরের নীলকুঠি আক্রমণ করিল।

ল্যাডলি সাহেব এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ সাহেবের বাংলোয় প্রবেশ করিল ব্রজবাসী ও তাহার অনুচরগণ। ব্রজবাসী ল্যাডলি সাহেবকে কাঁধে তুলিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। নীলকুঠি লুট হইল। সাহেবকে এক নিবিড় জঙ্গলে লইয়া যাওয়া হইল।

ওদিকে ব্রজর দলের লোকেরা হল্লা করিয়া নীলকুঠির গুদামঘর ও সাহেবের কুঠিতে আগুন লাগাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। দূর হইতে লোকে দেখিতে পাইল আগুনের লেলিহান শিখায় দরিয়ানগর ও রতনপুরের ধ্বংসাবশেষ।

এদিকে ল্যাডলি সাহেবকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের এক চড়ায় ফেলিয়া রাখা হইল। ব্রজবাসীর নির্দেশে দলের লোকেরা নির্জন স্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

এই লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড লইয়া দারোগা, পুলিশ হাঙ্গামা অনেক কিছুই হইল। কিন্তু কেহই ধরা পড়িল না। সাক্ষীও মিলিল না। বরং ল্যাডলি সাহেব যে ভয়ানক অত্যাচারী ছিলেন...দেওয়ান নবকুমারের প্রতি নিপীড়নের বিষয় ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারের অজানা ছিল না। কাজেই ঘটনার তদন্তের ফলও কিছুই হইল না। ল্যাডলি সাহেব খঞ্জ অবস্থায় এই দেশ ত্যাগ করিল।

সেই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আর নাই। কিছু নদীতে ভাঙিয়াছে—কিছু অংশ পাট ও ধান ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে। সাহেব ডাকাত ও দেশী ডাকাতদের লড়াইয়ে দেশী ডাকাত ব্রজবাসীরই জয় হইয়াছিল।

জিরাফের ঘুমোনোর রেকর্ড মাত্র বারো মিনিট

সাড়ে পাঁচ মিটার লম্বা জিরাফ পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর উচ্চতাকে ছাড়িয়ে যায়। এতটা লম্বা হওয়ার দরুন জিরাফ অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। ১৯৫৯ সালে কেনিয়া থেকে ইংল্যান্ডের টেস্টার চিড়িয়াখানায় একটি জিরাফ পাঠানো হয়। মাত্র ন' বছর বয়সেই সে চিড়িয়াখানার 'জিরাফ হাউস'-এর কুড়ি ফুট উঁচু ছাদ ছুঁয়ে ফেলেছিল।

জিরাফের আরেকটা মজার ব্যাপার হল, জিরাফ খুবই কম ঘুমোয়। একনাগাড়ে কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নিয়েই চারপাশে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়। মাত্র বারো মিনিট ঘুমই হল জিরাফের সবচেয়ে বেশিক্ষণ ঘুমোনোর রেকর্ড। সবসময় সতর্ক থাকার দরুন খুব শিকারি জন্তুও জিরাফকে আক্রমণ করতে পারে না।

জিরাফের গায়ের রঙ হলুদাভ, তাতে আছে গাঢ় খয়েরি রঙের ছোপ। স্তন্যপায়ী জিরাফ আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমির বাসিন্দা। জিরাফের ঘাড়ে অন্যান্য পশুর মতোই সাতটি অস্থিসন্ধি থাকলেও ঘাড়টা খুবই লম্বা।

জিরাফ নিজের জিভ ৫৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে লম্বা করে ডালপালা মুখের ভেতর টেনে নেয়, তারপর ঠোঁট দিয়ে আঁকড়ে ধরে ডালপালা থেকে পাতা ছিঁড়ে নেয়। এরা দল বেঁধে থাকে। এই দলে থাকে তিন থেকে শুরু করে তেত্রিশটি পর্যন্ত জিরাফ। কখনও কখনও এই দলের মধ্যে জিরাফের সঙ্গে একই দলে থাকে জেব্রা, কৃষ্ণসার হরিণ, আর অস্ট্রিচ পাখি। এই দলের মধ্যে থাকে একজন দলপতি। সে নিজের পদমর্যাদা দেখাবার জন্যে একটা ঘাড় বাঁকিয়ে রাখে। এদের মাথায় চামড়া দিয়ে ঢাকা ছোট-ছোট শিংও আছে। এই শিংগুলোই এরা আক্রমণের সময় কাজে লাগায়। এই লড়াইগুলো সাধারণত ক্ষমতা-দখলের লড়াই। পরস্পরের ঘাড় ঘষাঘষি করেই তা শেষ হয়।

সিংহ, চিতাবাঘ অনেক সময় জিরাফকে আক্রমণ করে। জিরাফ তখন তার পেছনদিকের পা দিয়ে আক্রমণকারীকে জোরে-জোরে লাথি মারতে থাকে। অনেক সময় এই আঘাতে সিংহ বা চিতাবাঘ মরেও যায়। যখন এইসব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জিরাফ আর পেরে ওঠে না, তখন সে চার পা একসঙ্গে তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটে পালিয়ে যায়। এদের দৌড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। এখন আর কেউ ইচ্ছেমতো জিরাফ শিকার করতে পারে না। আফ্রিকার ন্যাশনাল পার্কে এদের সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। কারণ খেয়াল-খুশিমতো শিকার করলে, জিরাফ একদিন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

মার্ক টোয়েন

মৃত্যুচক্র

অলিভার ক্রমওয়েলের সময়ের কাহিনী। কমনওয়েলথ সেনাবাহিনীতে তাঁর সমসাময়িক পদস্থ অফিসারদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়স্ক কর্নেল মেফেয়ার ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সতের বছর বয়সে সামরিক জীবনের শুরু করে যুদ্ধে দীর্ণ পিঙ্গল শরীর নিয়ে তখন কর্নেল এই অল্পবয়সেও একজন নিপুণ সৈনিক। বহু রণক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন এবং নিজের শৌর্য প্রদর্শন করে ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ ও সাধারণ্যে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে গভীর অস্থিরতায় নিমগ্ন, তাঁর ভাগ্যের ওপর কোত্থেকে এক ছায়া নেমে এসেছে।

শীতার্ত সন্ধ্যায় তখন বাইরে ঝড়ের মাতলামো আর অন্ধকার। ভেতরে বিষণ্ন নির্জনতা। কারণ, কর্নেল এবং তাঁর তরুণী স্ত্রী তখন কথার উত্তাপে তাঁদের বেদনাকে অপসারিত করার চেষ্টা করে নিশ্চুপ। অপরাহ্ণের পাঠের অধ্যায় আর প্রার্থনা সমাপ্ত করে তখন তাঁদের হাতে হাত রেখে নির্জন হয়ে বসে চুল্লির আগুনের দিকে চেয়ে থাকা, চিন্তার আলস্যে নিজেদের সমর্পিত করে অপেক্ষায় দীর্ঘ প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। তাঁরা জানতেন, তাঁদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আর সে-কথা চিন্তা করেই কর্নেলের স্ত্রী থরথর করে কেঁপে উঠল একসময়।

সাত বছর বয়সের কন্যা অ্যাবি ছিল তাঁদের প্রাণপ্রতিম একমাত্র সন্তান। এক্ষুনি হয়তো সে আসবে শুভরাত্রির বিদায়-চুমু খেতে। আর সেজন্যই বোধ হয় কর্নেল এই বিষণ্ন নীরবতা ভাঙলেন। বললেন,

: অন্তত ওর জন্যে তোমার চোখের পানি এবার মুছে ফেল। এস, আমরা সব ভুলে সুখি হই। অল্পক্ষণের জন্য হলেও যা ঘটবে, তাকে ভুলে থাকতে হবে আমাদের।

: বেশ, তাই হবে। কান্নায় ভেঙে পড়লেও আমি সব ভুলে যাব। নিঃসঙ্গ হয়ে অন্ধকারে ডুবে থাকব।

: হ্যাঁ, আমাদের নিয়তিকে আমরা গ্রহণ করব, বহন করব অবিচলিত ধৈর্যে। জানব তিনি যা করেন, তা-ই সত্যিকারে ন্যায় আর সত্যিকারের দয়া—।

: তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তাই কামনা করি—আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি যদি তাই বলতে পারতাম! যদি পারতাম, এই প্রিয় হাত যাকে আমি শেষবারের মতো স্পর্শ করছি, চুমু খাচ্ছি—

: লক্ষ্মীটি চুপ কর, ওই সে আসছে!

রাত্রিবাস পরিহিত কোঁকড়ানো চুল ছোট্ট একটি শরীর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ছুটে গেল বাবার দিকে। আর ছোট্ট মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বারবার চুমু খেলেন কর্নেল মেফেয়ার।

: তুমি আমাকে ওভাবে চুমু খাচ্ছ কেন বাবা? আমার চুল যে নষ্ট হয়ে যাবে।

: না মা, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আর ওভাবে চুমু খাব না।

: সত্যি বাবা, সত্যি করে বল, তুমি দুঃখ পেয়েছ?

: তুই নিজে বুঝতে পারছিস না, মা। কর্নেল এবার নিজের দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

বাবার এই করুণ অবস্থা দেখে ছোট্ট মেয়ে অ্যাবি এবার কেঁদে উঠল। বাবার হাত দুটো নিজের হাত দিয়ে টেনে বলল,

: না বাবা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি বাবা। আমি আর কোনোদিন এমনটি বলব না। বাবা তুমি কেঁদো না।

বাবার হাত দুটো টেনে এবার খানিকটা সরিয়ে আনল অ্যাবি। বাবার চোখ-দুটো দেখতে পেল। আর দেখেই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল,

: তুমি কী দুষ্টু বাবা! তুমি একটুও কাঁদছ না। তুমি একটুও দুঃখ পাও নি। তুমি শুধু শুধু আমাকে বোকা বানাচ্ছ। আমি আর তোমার কাছে থাকব না। এই আমি মায়ের কাছে চললাম। এই বলে অ্যাবি সত্যি বাবার কোল থেকে নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর বাবা এবার ওকে দু-হাতে কাছে টেনে আনলেন। জড়িয়ে ধরে বললেন,

: না মা, তুই আমাকে ছেড়ে যাবি না। আমি দুষ্টু ছিলাম, এটা স্বীকার করছি কিন্তু আর আমি দুষ্টু থাকব না, মা। আর তুই আমাকে যা শাস্তি দিবি, আমি তা মেনে নেব। বল মা, বল।

ছোট্ট মেয়ে অ্যাবি তক্ষুনি শান্ত হয়ে এল। আগের সেই প্রফুল্লতা ফিরে এল তার মুখে। বাবার গালে সে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলল,

: তবে একটা গল্প বল না বাবা, একটা খুব ভালো গল্প।

: বাইরে কেমন একটা শব্দ হল অকস্মাৎ। সবারই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রায়। উৎকর্ণ হল সবাই। বাতাসের উদ্দামতার মধ্যে সহসা বুঝি ক্ষীণ পায়ের শব্দ শোনা গেল। ক্রমশ সেই শব্দ নিকট থেকে

নিকটতর হল, তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। নিঃসঙ্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই। আর কর্নেল তাঁর ছোট্ট মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

: একটা গল্প, না মা? খুশির গল্প?

: না বাবা, খুশির গল্প নয়, একটা খুব ভয়ানক গল্প।

বাবা একটা খুশির গল্প বলতে চাইলেন। কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা। সে ভয়ানক একটা গল্প শুনবেই। বাবার সঙ্গে তার শর্ত ছিল। সে যা চাইবে তাই হবে। বাবা তার একজন খ্যাতনামা সৈনিক। তিনি কথা দিয়েছেন সে কথা রাখতেই হবে। ছোট্ট মেয়ে এবার বলল, না বাবা, আমাদের সবসময় খুশির গল্প শোনা উচিত নয়। ধাই-মা বলে, মানুষের সবসময় খুশিতে কাটে না। আচ্ছা বাবা, এটা কি সত্যি? ধাই-মা তাই বলে বাবা। তুমি বল না, সত্যি কি না?

মা কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাঁর সমস্ত চিন্তা তাঁর আগেকার সেই অস্থিরতায় নিমজ্জিত হল। শান্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ মা এটা সত্যি। আমাদের দুঃখ আসে। করুণ, কিন্তু তবু এটা সত্যি মা।

: তাহলে সেই রকম একটা গল্প বল, বাবা। যেন আমরা ভাবতে পারি আমরাই সেই গল্পের লোক। এমন গল্প বল বাবা, যাতে আমরা ভয়ে সব কাঁপতে থাকি। মা, তুমি আরো কাছে এসে বস। আমার একটা হাত ধর। যাতে আমরা ভয়টাকে কাটাতে পারি। এবার তুমি শুরু কর, বাবা।

কর্নেল নিজেই ইচ্ছে করে একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, একদা একসময়ে তিনজন কর্নেল ছিলেন—

: হা খোদা! আমি কর্নেলদের জানি। তুমিই তো একজন কর্নেল, বাবা। বল—

: একবার এক যুদ্ধে সেই কর্নেলরা একটা আইন ভঙ্গ করলেন।

বাবার কথা শুনে ছোট্ট মেয়ে অ্যাবি আনন্দিত হয়ে লাফিয়ে উঠল। বাবার দিকে মুখ তুলে বলল,

: কী ভাঙল, বাবা? কোনো খাওয়ার জিনিস?

মা আর বাবা দু'জনেই এবার স্মিতভাবে প্রায় হেসে উঠলেন। তারপর বাবা বললেন,

: না মা, ঠিক তার উল্টো! সেই কর্নেলরা তাঁদের যা করা উচিত নয়, তাই করেছিলেন।

: কী করেছিলেন?

: না মা! যুদ্ধে যখন তাঁরা হেরে যাচ্ছে ঠিক তেমনি সময় ওদেরকে বলা হয়েছিল শত্রুসৈন্যের ওপর একটা প্রচণ্ড আক্রমণের ভান করতে যাতে করে কমনওয়েলথবাহিনী নিরাপদে পশ্চাদপসরণ করার সুযোগ পায়। কিন্তু অতিউৎসাহী সেই তিনজন কর্নেল আক্রমণের ভান না করে শত্রুসৈন্যের ওপর সত্যি সত্যি আক্রমণ করে বসল। আর ঝড়ের মতো সেই আক্রমণে শত্রুসৈন্য বিপর্যস্ত হয়ে পরাজিত হল। লর্ড জেনারেল তাই তাদের ওপর খুব বিরক্ত হলেন, তাদের প্রশংসাও করলেন খুব— তারপর তাদের অপরাধের বিচারের জন্য তিনজনকেই লন্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

: তুমি কি মহান ক্রমওয়েলের কথা বলছ, বাবা?

: হ্যাঁ, মা।

: আমি তাঁকে দেখেছি, বাবা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন তিনি বিরাট ঘোড়ায় চড়ে রাজসিকভাবে চলে যান তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে—তখন দেখতে কী অপূর্ব লাগে! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না বাবা। কিন্তু মনে হয় যেন তিনি পরিতৃপ্ত নন। তাঁকে দেখে সবাই ভয় পায়। আমার কিন্তু একটুও ভয় লাগে না, বাবা। একটুও না।

: তারপর সেই কর্নেলদের বন্দি করে নিয়ে আসা হল লন্ডনে। শেষবারের মতো তাদের নিজেদের পরিজনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়া হল। হঠাৎ আবার সেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। সবাই

উৎকর্ণ হয়ে উঠল। আবার সেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর ক্রমশ আবার তা মিলিয়ে গেল ঝড়ের শব্দের সঙ্গে অন্ধকারে। কর্নেলের তরুণী স্ত্রী এবার তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে নিজের চেহারার বিবর্ণতাকে গোপন করার প্রয়াস পেল।

: আজ সকালে তারা এসেছে।

এবার ছোট্ট অ্যাবি বিস্ফারিত চোখে বলল,

: হ্যাঁ, বাবা, এটা কি সত্যি কাহিনী?

: হ্যাঁ, মা।

: আহ, কী ভালো! বল বাবা, এটা আরো সুন্দর। বল বাবা, তুমি বলে যাও। এ কী মা! তুমি কাঁদছ?

: না বাছা, তুমি কিছু ভেব না। ও কিছু নয়। আমি সেই হতভাগ্য পরিবারগুলোর কথা ভাবছিলাম।

: কিন্তু তুমি কেঁদো না, মা। দেখবে, এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে। গল্পের প্রথমে এমনই হয়। তারপর সবাই সুখি হয়। তুমি বলে যাও, বাবা। মায়ের কান্না থামুক।

: বাড়ি যেতে দেবার আগে ওদেরকে একবার দুর্গের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হল।

: আমাদের বাড়ি থেকে তো সেই দুর্গের চূড়া দেখা যায়, বাবা।

: তারপর সেই দুর্গের চূড়ায় সামরিক আদালতে তাদের ঘণ্টাব্যাপী বিচার হল। তারা বিচারে দোষী প্রমাণিত হল আর পরিণামে তাদের হত্যা করার আদেশ দেয়া হল।

: হত্যা! হ্যাঁ বাবা?

: হ্যাঁ, হত্যা—বাবার কণ্ঠ এবার কেমন গম্ভীর হয়ে এল।

: আঃ, কী অলুক্ষণে! তুমি আবার কাঁদছ মা। না মা, তুমি কেঁদো না। দেখবে, এবার গল্পের ভালো অংশ শুরু হবে। হ্যাঁ বাবা, এবার খুব তাড়াতাড়ি বল তো। দেখছ না, মা কেমন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

: হ্যাঁ মা, সত্যি। আমি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছি বলেই হয়তো এমন হয়েছে।

: তাই তো বলছি বাবা, তুমি থেমো না।

: বেশ তাই হোক। সেই তিনজন কর্নেল ...

: তুমি কি তাঁদের চেন, বাবা?

: হ্যাঁ, মা।

: আহা, আমিও যদি চিনতাম! কর্নেলদের আমি ভালোবাসি, বাবা। তাঁরা কি আমাকে চুমু খেতে দেবে?

এবার জবাব দেওয়ার সময় কর্নেল মেফেয়ারের কণ্ঠ থরথর করে কেঁপে উঠল। বললেন, তাদের একজন নিশ্চয়ই দেবে, মা। নে মা, ওর কথা ভেবে আমার হাতে চুমু খা।

: ওঁদের তিনজনের জন্যেই আমি চুমু খেলাম, বাবা। ওঁরা নিশ্চয়ই আমাকে চুমু খেতে দিতেন। আমি বলতাম, আমার বাবাও একজন কর্নেল—ওঁদের মতোই সাহসী। আর তাহলে নিশ্চয়ই ওঁরা আমাকে না বলতে পারতেন না। তুমি কী বল, বাবা?

: হ্যাঁ মা, প্রভু জানেন, নিশ্চয়ই তারা দিত।

: না মা, তুমি ওভাবে আর কেঁদো না। এই তো বাবা গল্পের ভালোর দিকে এসে পড়লেন। বল, বাবা।

: সবাই দুঃখিত হল ওদের জন্য। সামরিক আদালতেরও সবাই। তারপর তারা সবাই মিলে সেই মহান জেনারেলের কাছে গেল। জানাল, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে। তুই বুঝতে পারিস মা, এটাই তাদের কর্তব্য ছিল। আরো প্রার্থনা জানাল, ওদের যে-কোনো দুইজনকে মৃত্যু থেকে রেহাই দেয়া হোক। কারণ, সৈন্যবিভাগে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য একজনের মৃত্যুই যথেষ্ট, কিন্তু জেনারেল অতি কঠোর লোক। তিনি সামরিক আদালতের সদস্যদের তিরস্কার করলেন। কারণ, তারা তাদের কর্তব্য শেষ করার পর এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধি-মতে সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর তাঁর কর্তব্য সীমিত করার জন্য তাঁকে প্রভাবিত করতে চাইছে, যা তাঁর সৈনিকসুলভ মর্যাদার ওপর কলঙ্ক লেপন করবে। কিন্তু তারা জেনারেলকে জানাল যে, তারা তাঁর কাছ থেকে এমন বিশেষ কিছুই চাইছে না। কারণ, তারা যদি তাঁর জায়গায় থাকত এবং এই অসীম ক্ষমতা ও ক্ষমা করার অধিকারী হত, তাহলে তারা তা-ই করত। সব শুনে জেনারেল কী যেন ভাবলেন, স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ আর তাঁর চেহারার কাঠিন্য ক্রমশ কমে এল। তাদের অপেক্ষা করতে বলে জেনারেল তাঁর গোপন কক্ষে চলে গেলেন প্রার্থনার জন্য। তারপর ফিরে এসে বললেন, তাদের ভাগ্য তাঁদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে। এই ভাগ্য পরীক্ষাতেই সব স্থির হবে। এবং তাদের মধ্যে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেয়া হবে।

: তারা কী ঠিক করেছে, বাবা? কে, কে তাদের মধ্য থেকে মরবে?

: না, মা তারা অস্বীকার করেছে।

: তারা এটা করবে না, বাবা?

: না।

: কিন্তু কেন বাবা?

: কারণ, তাদের মধ্যে যে মারা যাবে তার মৃত্যু আত্মহত্যার শামিল হবে, মা। সত্যিকার খ্রিস্টান ধার্মিকের জন্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও মহাপাপ। তাই তারা ওটা প্রত্যাহার করেছে। সামরিক আদালতের আদেশই পালিত হোক। তারা সবাই মৃত্যুর জন্য তৈরি।

: এর অর্থ কী, বাবা!

: তাদের সবাইকে গুলি করে মারা হবে, মা।—বলতে বলতে ভারী শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ।

আবার অকস্মাৎ সেই শব্দ।

বাতাসের শব্দ? নয়। সেই পায়ের শব্দ সৈনিকদের ভারী পদশব্দ। ক্রমশ নিকটতর হল। তারপর একসময় দরজায় গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল।

: দরজা খুলুন।

: ওই দেখ বাবা, সৈন্যরা এসেছেন। আমি সৈন্যদের ভালোবাসি, বাবা, আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে দাও ওঁদের।

তারপর ছোট্ট মেয়ে অ্যাবি লাফিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর আনন্দে চিৎকার করে ওদেরকে ভেতরে আসতে বলল। সারি সারি সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করে দাঁড়াল। সামরিক অফিসারটি কর্নেলকে কুর্নিশ করল আর হতভাগ্য কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে অভিবাদন গ্রহণ করল। বেদনাহত কর্নেলের বিষণ্ন স্ত্রীও দাঁড়াল কর্নেলের পাশে। শঙ্কায় সাদা হয়ে গেছে ওর মুখমণ্ডল। শুধু ছোট্ট অ্যাবি আনন্দিত চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমস্ত দৃশ্যটার দিকে। মা, মেয়ে আর পিতার দীর্ঘ আলিঙ্গনের পর ভারী কণ্ঠের আওয়াজ আবার ধ্বনিত হল : 'দুর্গের দিকে'। আর সমস্ত সৈন্যের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে কর্নেল মেফেয়ার চললেন সেই দুর্গের দিকে। যে দুর্গের চূড়া দেখা যায় ওদের বাড়ি থেকে।

: মা, কী সুন্দর হল বল তো! আমি তোমাকে আগেই বলেছি না। ওই দেখ, ওরা দুর্গের দিকে যাচ্ছে। বাবা সেই কর্নেলদের দেখতে পাবে।

: আয়, মা। আমার কাছে আয়, আয়। বলে দু-হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ল কর্নেলের স্ত্রী অবরুদ্ধ কান্নায়।

দুই

পরদিন আর্ত মা আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। ডাক্তার আর নার্সেরা তার বিছানার পাশে বসে তার অসুস্থতা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন ফিসফিসিয়ে। অ্যাবিকে কিন্তু ঘরের ভেতরে আসতে দেয়া হল না। তাকে জানানো হল, মায়ের খুব অসুখ। কাজেই সে যেন ভেতরে না এসে বাইরে খেলাধুলা করে। ছোট্ট মেয়ে সেই শীতে গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে বাইরে পথে কিছুক্ষণ খেলে বেড়াল। তারপর একসময় অতি অদ্ভুতভাবে মনে হল অ্যাবির, মায়ের এই দুঃসহ অসুস্থতার সময় বাবা কেন কিছু না জেনে পড়ে আছেন সেই দুর্গের চূড়ায়। এটা সত্যি অন্যায়। এটা হতে দেয়া উচিত নয়। যে করেই হোক বাবাকে খবর দিতে হবে। সে নিজেই দেবে।

প্রায় একঘণ্টা পরে জেনারেল মহোদয় সামরিক আদালতে সপারিষদ প্রবেশ করলেন। টেবিলের পাশে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলো রেখে সমস্ত চেহারায় ভয়ানক গম্ভীরতা এনে দাঁড়ালেন তিনি। জানালেন, এবার তিনি ব্যাপারটা শুনতে রাজি আছেন। মুখপাত্রটি জানাল, আমরা ওদেরকে অনেক বুঝিয়েছি, আমাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে, অনেক আবেদন নিবেদন করেছি ওদের কাছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আত্মপ্রবঞ্চনার পক্ষপাতী নয় তারা। তারা মরবে, তবু ধর্মকে কলুষিত করবে না।

ত্রাণকর্তার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। কিন্তু তবু কিছু উচ্চারিত হল না তাঁর কণ্ঠ থেকে। কিছুক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'না, ওদের সবাইকে মরতে হবে না। তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে নেয়া হবে।' সমস্ত আদালতের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতার আভা উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। আবার বললেন জেনারেল, 'ওদেরকে ডেকে পাঠাও। দেয়ালের দিকে মুখ করে ওদেরকে পাশাপাশি দাঁড়াতে আদেশ দাও। আর তাদের হাতগুলো আড়াআড়ি ক্রস করে পেছন থেকে বেঁধে রাখ। সবশেষে আমাকে খবর দাও যাতে সে অবস্থায় ওদের আমি দেখতে পারি।'

সবাই যখন চলে গেল তখন জেনারেল বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরীকে ডেকে বললেন, 'যাও পথের ওপর যে শিশুকে প্রথম দেখবে তাকেই আমার কাছে নিয়ে এস।'

লোকটি কিন্তু বাইরে যেতে-না-যেতেই ফিরে এল। কুচিকুচি বরফের কণায় আচ্ছন্ন পোশাকে আবৃত ছোট্ট অ্যাবিকে এক হাতে ধরে নিয়ে। অ্যাবি সোজা চলে এল সেই রাষ্ট্রপতির কাছে যাঁর নাম শুনে দুনিয়ার জাঁদরেল ও ক্ষমতাবান লোকেরা ভয়ে কাঁপে। অ্যাবি সোজা তাঁর কোলে এসে বসল। বলল,

: আমি আপনাকে জানি। আপনি রাষ্ট্রপতি, জেনারেল। আমি কত দেখেছি আপনাকে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে। সবাই কিন্তু ভয় পায় আপনাকে দেখে। আমার কিন্তু একটুও ভয় করে না। কারণ আপনি আমার দিকে কোনোদিন সোজাসুজি তাকান নি। মনে পড়ে আপনার? আমার সেই লাল ফ্রকটা মনে পড়ে আপনার? ফ্রকটার নিচের দিকে নীল। একটুকরো নরম হাসি এবার রাষ্ট্রপতির মুখের কাঠিন্যকে কিছুটা কমিয়ে দিল। কিন্তু তবু তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই তার উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন,

: কেন, আমি তো ...

: আমাদের বাড়ির পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের বাড়ি, মনে পড়ে না?

: আমার সত্যি লজ্জিত হওয়া উচিত। তুমি বুঝতে পারছ না, মা...

: এবার ছোট্ট অ্যাবি মিষ্টি তিরস্কার করে জেনারেলকে বাধা দিল তাঁর কথায়।

: আচ্ছা, তাহলে আপনার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু আমি তো কিছুই ভুলে যাই নি।

: আমি সত্যি লজ্জিত, মা। আমি তোমাকে কথা দিলাম। এবার নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। আমাকে তোমার বন্ধু বলে নেবে আজকের জন্যে, চিরদিনের জন্যে।

: নিশ্চয়ই আমি ক্ষমা করব যদিও আমি বুঝতে পারি না, কী করে আপনি সব ভুলে গেলেন। আপনি নিশ্চয়ই খুব ভুলো-মন। আমারও কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলোমন হয়ে পড়ে। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ক্ষমা করতে পারব। কারণ, আপনি ভালো। আর দয়ালু। আপনি আমাকে আরো কাছে টেনে নিচ্ছেন না কেন? বাবা যেমনি নেয়। বাইরে এখন কী প্রচণ্ড শীত!

: মা লক্ষ্মী আমার, তোমাকে নিশ্চয়ই আমি আমার হৃদয়ের কাছে টেনে নেব। কিন্তু তুমি আমার ছোট্ট বন্ধু হবে তো, অনেক দিনের জন্য? জেনারেলের কণ্ঠ এবার কেমন ভারী হয়ে এল। অ্যাবিকে কাছে টেনে নিলেন আরো। বললেন, তোকে দেখে আমার নিজের ছোট্ট মেয়ের কথা মনে পড়ছে। অবশ্য এতদিনে সে আর ছোট্টটি থাকত না। কিন্তু সে তোর মতোই মিষ্টি, প্রিয় আর আদরের ছিল। তোর মতোই সুন্দরী ছিল। তোর মতো ছোট্ট পরীর রূপ। শত্রু-মিত্র সবার ওপর প্রভাবশালী বিশ্ববিজয়ী আকর্ষণ ছিল তার। সে আমার দু-হাতের ভেতর শুয়ে থাকত ঠিক তোর মতো নিবিড় হয়ে। আমার হৃদয়কে আনন্দে শান্তিতে আপ্লুত করে দিত, যেমন এখন তোকে পেয়ে আমার মন তেমনি এক আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেছে। আমরা বন্ধু ছিলাম, খেলার সাথি ছিলাম। কত আগেকার ছিল এসব! কত আগেকার ঘটনা। এখন কোথায়, কোন স্বর্গে সব হারিয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন পরে আবার তুই সব ফিরিয়ে এনেছিস, মা। আয় ছোট্ট মা, তুই আমার আশীর্বাদ নে।

: তুমি কি সত্যি তাকে খুব ভালোবাসতে? খুব, খুব বেশি?

: হ্যাঁ, মা তুই বুঝতে পারছিস না? সে আমাকে হুকুম দিত আর আমি মাথা পেতে নিতাম। পালন করতাম তার আদেশ।

: আশ্চর্য, তুমি কী সুন্দর! তুমি আমাকে চুমু খাবে না?

: নিশ্চয়ই। আনন্দের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোকে চুমু খাব, মা। এই নে, এটা তোর জন্যে। আর এটা ওর জন্যে। তুই আমাকে অনুরোধ করেছিস, মা। কেন তুই আমাকে হুকুম দিলি নে, আমার সেই মায়ের মতো। তাহলে আমি নিশ্চয়ই সে হুকুম পালন করতাম।

ছোট্ট মেয়ে অ্যাবি শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। একটু পরেই তার কানে ভেসে এল সৈন্যদের সমবেত পায়ের শব্দ।

: সৈন্য—সৈন্য! সৈন্যরা সব আসছে! আমি ওদেরকে দেখব!

: অবশ্যই দেখবি মা। কিন্তু একমুহূর্ত অপেক্ষা কর। আমি তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি, এটা তুই নে।

সহসা একজন অফিসার ঘরে প্রবেশ করল। ঈষৎ মাথা নত করে বলল, ধর্মাবতার, ওরা এসেছে। তারপর আবার মাথা একটু নত করে চলে গেল।

রাষ্ট্রপতি অ্যাবিকে ছোট্ট তিনটি সিল-করা বাক্স দিলেন। এর মধ্যে দুটো সাদা আর একটি টকটকে লাল। আর এ-লালটি কর্নেলদের মধ্যে যে পাবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

: আহা, কী সুন্দর টকটকে লাল! এগুলো কি আমার জন্য?

: না মা, এগুলো অন্যের জন্যে। ওই পর্দার কোণটা সরিয়ে ফেল, মা। পর্দার ওপারে একটা ছোট্ট দরজা আছে। দরজার ভেতরে চলে যা—দেখতে পাবি, তিনটি লোক দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত তাদের পেছন দিকে বাঁধা। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই একটি হাতের মুঠো

খোলা—ঠিক ছোট্ট পেয়ালার মতো। এগুলির একটি করে এক-এক হাতে ফেলে দিয়ে তুই আমার কাছে ফিরে চলে আয়, মা।

রাষ্ট্রপতিকে একা ফেলে মুহূর্তে অ্যাবি সেই পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তি-আনত স্বগতোক্তির মতো জেনারেল নিজে নিজেই এবার বলতে লাগলেন,

: চরম অনিশ্চয়তা আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে তাঁর গোপন চির-শুভ-ইচ্ছের মতো এই চিন্তা আমার মাথার মধ্যে এল তাদের জন্যে, যারা তাঁর ওপর আস্থাবান নয় কিন্তু তাঁর সাহায্য চায়। তিনি জানেন, কার মৃত্যু হবে এবং এজন্যই তাঁর ছোট্ট প্রতিনিধি, নিষ্পাপ দূতকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছে পূরণের জন্যে। অন্যের ভুল হতে পারে কিন্তু তাঁর ভুল হবে না। তাঁর ভুল হয় না। আশ্চর্য, অচিন্ত্যনীয় তাঁর পথ। সে-পথ জ্ঞানের। ধন্য হোক, তাঁর পবিত্র নাম।

ছোট্ট নিষ্পাপ পরীর মতো অ্যাবি পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। খুব সতর্ক হয়ে, অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে বন্দি সৈনিকদের স্থাণুর মতো শরীরগুলোর দিকে তাকাল। আর সহসা তার সমস্ত মুখমণ্ডল এক অপূর্ব আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে সে নিজের মনেই বলে উঠল, কী আশ্চর্য, এই তো ওদের মধ্যে বাবা রয়েছে! ওই তো ওঁর পিঠ। সবচে সুন্দর সেই পিঠ। আনন্দে সে এগিয়ে গেল বাবার দিকে। সিল-করা বাক্সগুলো খোলা হাতগুলোতে দিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল আর হাস্যোজ্জ্বল আনন্দে চিৎকার করে উঠল,

: বাবা, বাবা, দেখ তোমাকে কী দিয়েছি! এটা আমি তোমার জন্যে এনেছি।

কর্নেল এবার নিজের হাতের সেই ভয়াবহ ছোট্ট উপহারটির দিকে তাকালেন। তারপর তার ছোট্ট নিষ্পাপ হত্যাকারীকে টেনে আনলেন নিজের বুকের মধ্যে। ভালোবাসায়, শঙ্কায় আর সহানুভূতিতে তিনি কেঁপে উঠলেন। সমস্ত সৈনিক, অফিসার, মুক্ত কয়েদি—সবাই অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ এই করুণ মর্মান্তিক দৃশ্যের পরিব্যাপ্তি দেখে। তাদের হৃদয় এই সকরুণ পরিস্থিতিতে সহানুভূতিতে ভরে এল। অশ্রুভারাক্রান্ত হল তাদের চোখ। কাঁদল সবাই। কিছুক্ষণের জন্যে একটা গভীর অবিস্মরণীয় ভক্তিপ্লুত স্তব্ধতা নেমে এল সেখানে। তারপর প্রহরারত অফিসারটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল বন্দি কর্নেলের দিকে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল,

: শোক আমাকে আচ্ছন্ন করেছে সত্যি কিন্তু আমার কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। আমাকে যে আদেশ ...

: আদেশ! কীসের আদেশ? বলল ছোট্ট অ্যাবি।

: ওঁকে সরিয়ে নিতে হবে আমাকে। সত্যি আমি দুঃখিত।

: ওঁকে সরিয়ে নিতে হবে—কোথায়?

: হায় খোদা! ওকে সরাতে হবে...সরাতে হবে দুর্গের ওপাশে।

: না, না, সে তুমি পারবে না। এবার চিৎকার করে উঠল অ্যাবি। আমার মা অত্যন্ত পীড়িত—বাবাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব।

অ্যাবি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাবার পিঠের ওপর চড়ে বসে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বাবাকে নিবিড়ভাবে নিজের দিক টেনে বলল, আমি তৈরি, বাবা, চল এবার আমরা যাই।

: না মা, আমাকে যেতে দেবে না। আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

ছোট্ট অ্যাবি এবার বাবার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। নিজের চারদিকে তাকাল। তারপর দৌড়ে সেই অফিসারের সামনে গিয়ে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তার ছোট্ট তুলতুলে পা-দুটো মেঝেতে বারবার আঘাত করে চিৎকার করে বলে উঠল,

: তোমাকে আমি বলেছি, আমার মায়ের অসুখ। তোমার সেকথা শোনা উচিত। বাবাকে তোমার যেতে দিতেই হবে।

: আহা, ছোট্ট শিশু! হায় খোদা, যদি পারতাম! কিন্তু ওঁকে যে আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

তারপর অফিসার পাহারারত সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'অ্যাটেনশন'। বিদ্যুতের মতো অ্যাবি সেখান থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ফিরে এল মুহূর্তে। নিজের ছোট্ট হাত দিয়ে রাষ্ট্রপতি জেনারেলকে জোর করে টেনে নিয়ে এল সেখানে। আর এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে উপস্থিত সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। অফিসাররা জেনারেলকে অভিবাদন জানালেন আর সৈন্যেরা রাইফেল নামিয়ে কুর্নিশ করল। অ্যাবি এবার জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বলল,

: তুমি এদেরকে থামাও! আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। বাবাকে ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। আমি সেকথা ওদেরকে বলেছি, কিন্তু ওরা আমার কথা শুনছে না। ওরা বাবাকে নিয়ে যেতে চায়।

জেনারেল হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার বাবা! ওই কি তোমার বাবা?

: কেন? নিশ্চয়ই। দেখছ না, বাবা বলেই না সবচে সুন্দর লাল বাক্সটি আমি ওকে দিয়েছি।

একটা বেদনার্ত অনুভূতি জেনারেলের সমস্ত মুখমণ্ডলে রেখায়িত হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

: হা প্রভু! এ কী আমি করেছি! মানুষের দ্বারা ঘটতে পারে, এমন নিষ্ঠুরতম কাজ আমি করেছি। নিশ্চয়ই শয়তান আমাকে পরিচালিত করেছে। প্রভু, আমার কী হবে! আমি কী করব?

অ্যাবি এবার অধৈর্য হয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল : কেন, তুমি ওদেরকে বল না বাবাকে ছেড়ে দিতে। তারপরই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—

: বাবাকে ছেড়ে দিতে বল! তুমি না একটু আগে বলেছিলে, তোমাকে হুকুম দিতে? আর আমি এখন যা করতে বলছি, তা তুমি করছ না!

একটা নরম প্রীতির আলো সহসা সেই বৃদ্ধের বিক্ষত চেহারায় প্রথম ঊষার স্বর্ণাভার মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জেনারেল এবার ছোট অ্যাবির মাথার ওপর হাত রেখে বললেন, প্রভুকে ধন্যবাদ, এই আসন্ন দুর্ঘটনা থেকে—অচিন্ত্যনীয় প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে। আয় মা, তার ইচ্ছায় তুই আমাকে সব বলে দিয়েছিস। তুই অনন্যা, মা।

তারপর অফিসারদের বললেন, তোমরা এর আদেশ পালন কর। বন্দির অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। ওকে মুক্ত করে দাও!

সাগরের পানির রঙ কী?

সাগরের পানির রঙ কী? প্রশ্নটা শুনে নিশ্চয়ই ঝটপট উত্তর দেবে, কেন নীল। উত্তরটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হল না। আসলে সব সাগর-মহাসাগরের পানির রঙ কিন্তু একরকম নয়। কিছু উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জায়গায় অর্থাৎ সৌদি আরব ও ইয়েমেনের পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। এই সাগরের পানির রঙ কিন্তু নীল নয়, লাল। এর কারণ ছোট ছোট উদ্ভিদ আছে এই সাগরের জলে। সেগুলোর কারণেই এই সাগরের জলের রঙ এমন লাল। আগ্নেয়গিরির অব্যাহত অগ্ন্যুৎপাতের কারণেও সাগরের পানি লালরঙের হতে পারে। আবার চীনের পূর্বদিকে যেখানে হোয়াংহো নদী গিয়ে সাগরে মিশেছে সেখানকার সাগরে নদীর বয়ে আনা হলুদ মাটি ও পলি মিশে পানির রঙ হয়ে যায় হলুদ। সাগরটির নামও দাঁড়িয়েছে হলুদ বা পীত সাগর। আটলান্টিক মহাসাগরের কোনো কোনো এলাকায় সমুদ্রে মৃত উদ্ভিদের কারণে সাগরের রঙ সবুজ দেখা যায়। ভূমধ্য ও আটলান্টিক সাগর যেখানে মিশেছে সেখানকার পানির রঙ আলাদা আলাদা। ভূমধ্যসাগরের পানির রঙ নীল আর আটলান্টিকের পানির রঙ সবুজ।

তবে বেশির ভাগ জায়গায় গভীর সমুদ্রের পানির রঙ নীল। এর কারণ কী? এর কারণ জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে সূর্যের আলোর মধ্যে কী কী রঙ আছে। সূর্যের কাছ থেকে আমরা যে আলো পাই তাতে রঙ থাকে সাতটা। রঙগুলো হল বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। রঙগুলোর সামনের অক্ষরগুলো মিলে হয় বেনীআসহকলা। তো, সূর্যের আলো যখন সাগরজলে পড়ে তখন এই সব রঙই সাগরে পড়ে। আর সাগরের পানিতে যে কত কিছু আছে তা বলেই শেষ করা যাবে না। সাগরজলে মিশে থাকা নানা পদার্থ বিভিন্ন রঙকে নানামাত্রায় শোষণ করে নেয়। যা শোষণ করতে পারে না, তা বিকিরণ বা বিচ্ছুরণ করে। এই সাতটি রঙের মধ্যে নীলও একটি রঙ এবং এই রঙটি সাগরের পানি থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিকিরিত হয়। সাগরের পানির রঙ নীল হবার এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

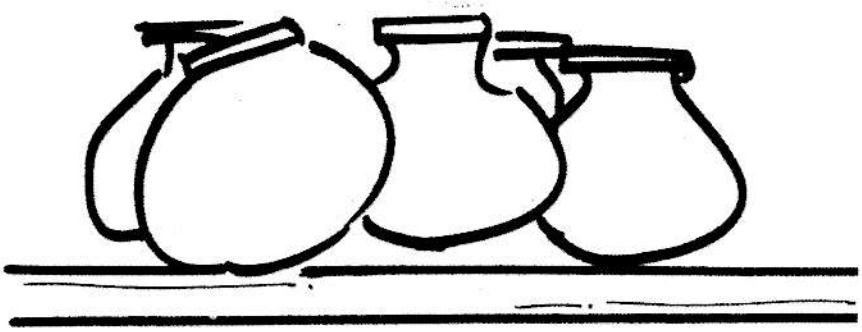

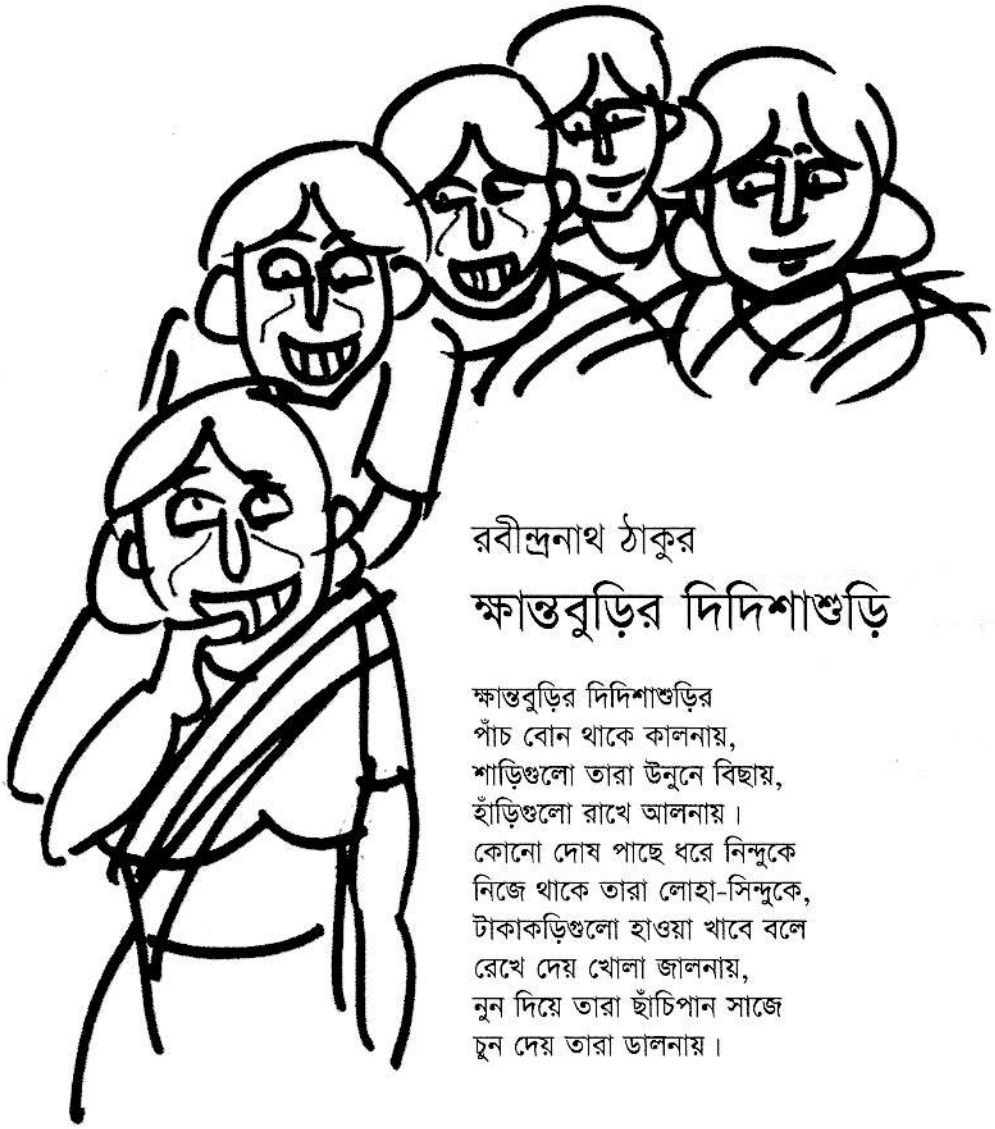

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ি

ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জালনায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে
চুন দেয় তারা ডালনায়।

শেষ পেশোয়ার অন্তিম

বাজীরাও

১৮১৮ সালে লর্ড হেস্টিংস যখন বড়লাট তখন দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পেশোয়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মারাঠা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি স্যার জন ম্যালকমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

স্যার জন ম্যালকম তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপরের মহলে বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি সরকারি দূত হয়ে দু'বার পারস্যদেশে গিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। ইতিহাসের দুটি বই লিখেছিলেন—একটি পারস্যের ইতিহাস আর একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস। দুটি বই-ই বিখ্যাত।

পেশোয়ার সঙ্গে কোম্পানির শর্ত হয়েছিল যে, তিনি আর দাক্ষিণাত্যে ফিরতে পারবেন না, উত্তর ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় বসবাস করতে হবে। কোথায় থাকবেন এই প্রশ্ন নিয়ে কিছুদিন আলোচনা চলেছিল। একবার কথা হয়েছিল যে, তিনি বারাণসী কিংবা মথুরায় থাকতে পারেন। বাজীরাও রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তীর্থস্থানে থাকলে তাঁকে দিনে দু'তিনবার স্নান করতে হবে। তাঁর যা শরীর, তাতে এতবার স্নান করে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

শেষপর্যন্ত বিঠুরে গিয়ে তিনি বাস করবেন ঠিক হল। বিঠুর কানপুর থেকে মাইল দশেক দূরে। সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে একটি জায়গির দেয়া হল। তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছিল। বাজীরাওয়ের ভাতা কী হবে? এই নিয়ে বহু আলোচনার পরে ঠিক হল : বার্ষিক আট লক্ষ টাকা।

কেউ কেউ বললেন, এ তো অনেক টাকা। এত টাকা দেবার কোনো মানে হয় না। স্যার জন ম্যালকম বললেন, তা হোক, হাজার হলেও একসময়কার পেশোয়া তো। আর তা ছাড়া আট লক্ষ টাকা শুনতে বেশি বটে, কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এ টাকা দেয়াই উচিত। তাঁর যা শরীরের অবস্থা, ক'দিনই বা বাঁচবেন।

বাজীরাও তাঁর বন্ধুবান্ধব, অনুচরদের নিয়ে বিঠুরে এসে বাসা বাঁধলেন। বিঠুরের পুরোনো নাম 'ব্রাহ্মবর্ত'। পণ্ডিতরা বলতেন যে, বিঠুরের সামনে গঙ্গানদী হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। এ-কথা ভালো করে বোঝবার জন্য বিঠুরের ঘাটের কাছে জলের মধ্যে একটি জায়গা লোহার তার দিয়ে ঘেরা আছে। পেশোয়া এবার নদীর স্নানে তাঁর আপত্তির কথা তোলেননি। পেশোয়ার সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পুরোনো দেওয়ান রামচন্দ্র পন্ত। তিনি নিজেই প্রভুর সঙ্গে নির্বাসন নিয়েছিলেন।

নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেশোয়ার খুব অসুবিধা হয়নি। উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও তাঁর আর ছিল না। দান-ধ্যান করে তাঁর সময় কাটত। চারদিকের ব্রাহ্মণরা জানতেন যে, তিনি পেশোয়া না-থাকলেও তাঁর টাকা-পয়সার অভাব নেই। ইচ্ছা থাকলেই অনেক টাকা দান করতে পারেন। ইংরেজরাও হয়তো চেয়েছিলেন যে, এইসব নিয়ে পেশোয়া তাঁর আগের জীবন ভুলে থাকতে পারবেন। ব্রাহ্মণদের অনেক টাকা দিতেন। নানারকম ধর্মীয় আচার পালন করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে পুণ্যবান মনে করা ঠিক না। আসলে বাইরের ধর্মাচরণে ত্রুটি না থাকলেও তাঁর নিজের চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। ধর্মীয় আচরণ কীরকম ছিল সে-সম্বন্ধে একটি গল্প বলি।

পেশোয়ার বৃত্তির টাকা কানপুর থেকে আসত। পেশোয়ার একটি সুন্দর পালকি ছিল, মখমল কিংখাব সব দিয়ে ভেতরটা সাজানো। টাকা আনবার সময় এই পালকি ব্যবহার করা হত। একবার টাকা ভর্তি এই পালকি একজন ছুঁয়ে দিয়েছিল। বাজীরাও বললেন : যদি নিচু হাতের ছোঁয়া লেগে থাকে তাহলে পালকি তো অপবিত্র হয়েছে। দোষ স্খলনের জন্য টাকাশুদ্ধ পালকিটিকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখা হল। তারপর যখন উপরে তোলা হল দেখা গেল পালকির সাজসজ্জা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তখনকার টাকা তো রুপোর, কাজেই টাকার কিছুই হয়নি। শুধু গঙ্গাজলে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছে।

পুজো আর্চা, দান-ধ্যান ছাড়া বাজীরাওয়ের আর কোনো কাজ ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন আলস্য ও আরামে শরীর ভালো থাকে না। কিন্তু বাজীরাও এইভাবে থাকতেই ভালোবাসতেন। পূর্বে দশহরার ঠিক পরে মারাঠি সৈন্যরা যুদ্ধ করতে বের হতেন। তখন বৃষ্টি থেমেছে, অশ্বারোহীর পথে অসুবিধা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ছত্রপতি শিবাজির সময় থেকে এই রীতি চলে আসছিল। এখনও যাঁরা ঐতিহ্য মেনে চলতে চান, তাঁরা দশহরার দিন বিকালে গ্রামের বাইরে হেঁটে যান। পুনের কাছে দেখেছি একরকম ছোট গাছ আছে, সেই গাছের পাতা ছিঁড়ে আনতে হয়। তার অর্থ : শত্রুর দেশ থেকে সোনা জয় করে আনা হল। বাজীরাও আস্তে আস্তে এই প্রথাও ছেড়ে দিলেন। এমনকি ঘোড়াও চড়তেন না। কোথাও যেতে হলে পালকি ব্যবহার করতেন।

বাজীরাওয়ের শরীর যখন ভেঙে পড়ছে, তখন কমিশনারের হুকুমে তাঁর জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করা হল। ঠিক হল, পেশোয়ার মৃত্যু হবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রাসাদের যে-অংশে ধনরত্ন রাখা হয়, সেই অংশ বন্ধ করে রাখতে হবে, সেই সঙ্গে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। তাঁর সম্পত্তি মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিতরণ করা হবে। এ তাঁর নিজের সম্পত্তি।

পরের বছর বাজীরাওয়ের পক্ষাঘাতের আক্রমণ হল, কিন্তু ক্রমে তিনি অনেকটা সেরে উঠলেন। ছ'বছর পরে, ১৮৪৭ সালে কমিশনার সরকারকে জানালেন, বাজীরাওয়ের বয়স এখন ৭৩ বছর, খুব দুর্বল, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তবু আরও প্রায় চার বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কানপুর থেকে দু'জন ইংরেজ ডাক্তার তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা পরীক্ষা করে বললেন, বাজীরাওয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তবে ঠিকমতো চিকিৎসায় তিনি এবারও বেঁচে যেতে পারেন। সেই রাত্রে মনে হল বাজীরাওয়ের অন্তিম সময় উপস্থিত। কানপুর থেকে কমিশনার এলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তখন বিপদের আশঙ্কা নেই। তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি। পরদিন ২৮ জানুয়ারি সকালে বাজীরাও শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

বিঠুরে শেষ পেশোয়ার জন্য যেসব ব্যবস্থা ছিল, তাড়াতাড়ি তা গুটিয়ে ফেলা হল। অল্পদিন পরেই বিঠুর খালি হতে আরম্ভ করল। বাজীরাওয়ের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তাই দুই দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন : ধন্দুপন্ত নানাসাহেব ও দাদাসাহেব। নানাসাহেব আশা করেছিলেন, তাঁকে সরকার কিছু ভাতা দিতে পারেন। সে আশা সফল হয়নি।

পেশোয়াকে যখন ভাতা দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তখন সবাই ভেবেছিলেন তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি আরও ৩৫ বছর বেঁচেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা ভাবতে শুরু করলেন, এত বেশি টাকা বৃত্তি দেওয়াই ভুল হয়েছিল। কিন্তু কেউ মনে করতে লাগলেন, তিনি যে এতদিন বেঁচে আছেন সে যেন স্যার জন ম্যালকমের দোষ। তাঁর কথাতেই এত টাকা দিতে হল। অনেকদিন না-বাঁচলে কোম্পানির এত টাকা খরচ হত না।

বাজীরাওয়ের খবরদারি করবার জন্য কমিশনার-পদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথম কমিশনার ছিলেন স্যার জন লো। মারাঠা যুদ্ধের সময় বাজীরাওয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। প্রথম কমিশনারের কাজ কঠিন ছিল। কিন্তু অনেকটা তাঁর জন্যই বাজীরাওকে বন্দিদশা মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়েছিল।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, এই কারণে স্যার জন লো ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন সেন্ট হেলেনা দ্বীপে, যেখানে কিছুকাল আগে নেপোলিয়নকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। সেখানে যিনি নেপোলিয়নের খবরদারি করতেন, তাঁর নামও ছিল লো। স্যার হাডসন লো। তাঁকে নেপোলিয়ন একদম পছন্দ করতেন না। তিনি এলেই তাঁকে বলে পাঠানো হত, "এখন দেখা হবে না, সম্রাট স্নানের ঘরে আছেন।" জন লো'র সঙ্গে পেশোয়ার সম্পর্ক অবশ্য সেরকম ছিল না।

জন লো ছুটি থেকে ফিরে এসে জয়পুরে রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। পরে আরও দু'জন কমিশনার আসেন। তারও পরে জেমস ম্যানসন বিঠুরের কাজের ভার নেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিঠুরের কমিশনার ছিলেন। ম্যানসনের মনে হয়েছিল, বাজীরাওয়ের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর দত্তকপুত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য হয়। ভাবখানা এই যে, অনেক দেয়া হয়েছে, আর নয়। তবে বিঠুরে তাঁর প্রাসাদের শুধু ধ্বংসাবশেষই এখন আছে। সিপাহি-যুদ্ধের সময় বিঠুরে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে নানাসাহেবের যুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যরা কামানের গোলায় বাজীরাওয়ের প্রাসাদ চূর্ণ করে দেয়।

কুড়ি-একুশ বছর আগে বিঠুরে গিয়ে দেখেছি, অনেকটা জায়গায় ভাঙা ইটের স্তূপ। সেখানে কিছু-কিছু জায়গায় চাষ হচ্ছে, বাকিটা জঙ্গল। এইরকম জায়গা সাপের খুব প্রিয়। সাপের জন্য গ্রামের লোক সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না। একটু দূরে রামচন্দ্র পন্তের বাড়ি। গ্রামের লোকেরা বলল, বাড়িটা ভুতুড়ে। আমি দেখলাম, বাড়ি তখন মেরামত হচ্ছে। সেখানে স্কুল বসবে। নদীর ধারে একসারি শিবমন্দির। দেখলে বাংলাদেশের মন্দির বলে মনে হয়। বাজীরাও কোথা থেকে লোক নিয়ে গিয়ে মন্দির বানিয়েছিলেন, জানি না। সব মন্দির পরিত্যক্ত। পূজা হয় না কোথাও, আলো জ্বলে না। গ্রাম থেকে দু-একজন লোক আমার সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, একটি মন্দিরেই শুধু পূজা হত। মন্দিরের পুরোহিত একটি সাপ পুষেছিল। তাকে দুধ খাওয়াত। একদিন সন্ধ্যায় সে দুধ খাওয়াতে এসে সাপকে দেখতে পায়নি, ভুল করে সাপের গায়ে পা লেগে গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সাপ তাকে কামড়ে দিল। বাঁচানো গেল না।

এই বলে লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব, তুমি কিন্তু কখনও সাপ পুষো না। যতই পোষ মানুক না কেন, একদিন সে তোমাকে কাটবেই।"

পানির মতো সহজ কী?

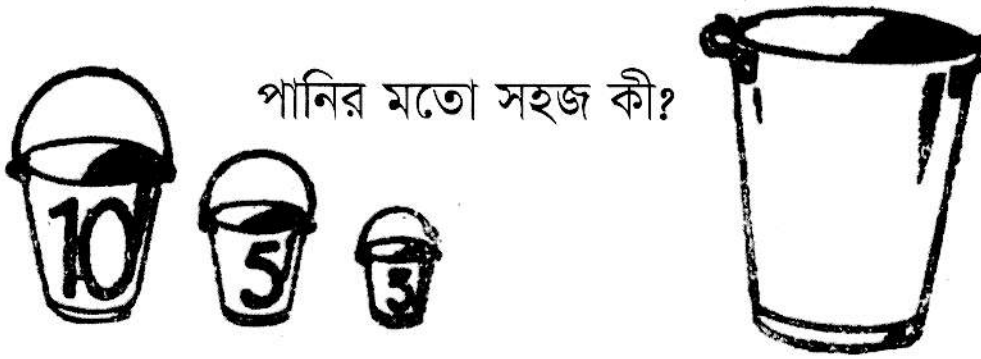

বড় বালতিটিতে ধরে প্রায় ত্রিশ লিটার দুধ। ছোট বালতিগুলোয় যথাক্রমে ১০ লি., ৫ লি. ও ৩ লি.। যদি বাইশ লিটার দুধ কিনে ঐ বড় বালতিটি নিতে হয় এবং যদি মাপার জন্য ছোট বালতি তিনটি ছাড়া কিছুই না থাকে, তবে কী উপায়ে তুমি বাইশ লিটার দুধ কিনতে পারবে?

দুঃসাহসী জেল পলাতক

লিয়ন কাউন্টি জেলখানা

জেলপলাতক আসামির কথা তো অনেক শুনেছি। এসব কুখ্যাত আসামিদের জেলে নিয়ে গেলেও কেমন করে তারা পালিয়ে আসে।

কিন্তু জেল থেকে পালানোর ব্যাপারে যে-লোকটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্ম দিয়েছে, সে হল যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস প্রদেশের ইম্পোরিয়া (Imporia) শহরের লিয়ন কাউন্টি (Lyon County) জেলের এক সিঁদকাটা দাগী চোর। তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। দাগী চোরটি যেমন ছিল ধুরন্ধর বুদ্ধিমান, তেমনি পাজির হদ্দ। জেলে ঢুকে অন্য কয়েদিদের মতো সে চুপ করে বসে থাকেনি। ফন্দি আঁটছিল কেমন করে ওখান থেকে পালানো যায়। অবশেষে অনেক ফন্দি-ফিকির করে সে এক কৌশল বের করে ফেলল। জেলে আসার সময় তার গায়ে ছিল ঘরে-বোনা একটি উলের জাম্পার। সে এই জাম্পার থেকে সুতো খুলে নিয়ে পাকিয়ে তৈরি করল চিকন রশি। সেই চিকন রশির গায় মাখাল সাবান। তারপর সাবান মাখানো উলের সুতোতে মেশাল বালু আর সিমেন্ট। এতে সুতোটির কিনার হল ধারালো এবং শক্ত।

এরপর গোপনে সে শুরু করল তার আসল কাজ। তাকে যে সেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তার তিন পাশে ছিল দেয়াল আর একপাশে ছিল রডের বেড়া। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন শুরু হত তার কাজ। চোরটি তার বালু আর সিমেন্ট-মাখানো উলের সুতো রডের সাথে জড়িয়ে টানতে শুরু করল। এতে সিমেন্টের ঘষায় রড ক্রমে ক্ষয় হতে লাগল। আসলে সে উলের সুতো দিয়ে লোহার রড কাটার চেষ্টা করছিল।

ব্যাপারটি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। সামান্য উলের সুতো দিয়ে লোহার মোটা রড কাটা কি চাট্টিখানি কথা! একেবারে যেন ব্লেড দিয়ে শালগাছ কাটার মতো ব্যাপার আর কী! কিন্তু লিয়ন কাউন্টি জেলের

দাগী চোরটি এই অসাধ্যই সাধন করেছিল। দিনের-পর-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে ক্রমাগত কেটে যাচ্ছিল লোহার রড।

তারপর আছে কত সাবধানতা, কেউ যদি দেখে ফেলে! পাহারায় যারা থাকে তাদের সকলের চোখ এড়িয়ে তাকে করতে হয়েছিল এই কাজ।

দীর্ঘ কয়েক মাস একটানা কাজ চালিয়ে অবশেষে সত্যি সত্যি সফল হল চোরটি। সে কেটে ফেলল দুটো লোহার মোটা রড।

তারপর কাটা রডকে বাঁকা করে সে জায়গা বের করে নিল পালাবার। এবং পালাল সত্যি সত্যি।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না। রড কেটে জেল থেকে পালানোর কয়েক মাসের মধ্যেই সে আবার ধরা পড়ে গেল। আবার তাকে ঢোকানো হল জেলে।

কিন্তু দাগী চোর দমল না। আবার শুরু হল তার পালাবার চেষ্টা। আবার গোপনে সে তৈরি করল উলের সুতো। আবার দিনের-পর-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে আবার কেটে ফেলল লোহার মোটা রড।

সে দ্বিতীয়বারও পালাতে সক্ষম হল জেল থেকে।

এবার আর সে ধরা পড়েনি। পালিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরের দেশে। শুধু মনের জোর আর অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়েই সে লাভ করেছিল মুক্তি।

তাই বলতে হয় : চেষ্টার অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

অল্পকথার গল্প

সন-ইয়াৎ-সেন

দু'জন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভীষণ ঝগড়া কচ্ছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়ে চীনের খ্যাত বিখ্যাত দেশপ্রেমিক সন-ইয়াৎ-সেন যাচ্ছিলেন কি এক কাজে। তাঁকে দেখেই ওরা দু'জন তাঁর কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে।

সান-ইয়াৎসেন তাদের মীমাংসার আগ্রহ দেখে খুশি হয়ে বলেন, 'বেশ, আমি তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তার পূর্বে আমার কাছে তোমাদের একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।' তাঁর কথায় তারা দু'জনেই উৎসাহিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি যা বলবেন তারা তাই করবে। তখন সান-ইয়াৎ-সেন বলেন, 'আমার কথা হচ্ছে যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরে পরস্পরকে বন্ধুভাবে নিতে পারবে, ততক্ষণ এ স্থান তোমরা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না।'

ফররুখ আহমদ

চোপড়ের কথা

কাপড় পরে সকল মানুষ, চোপড় পরে কোন্ প্রাণী
চোপড় কেন হয় না কাপড়, বাড়ায় শুধু হয়রানি,
'কাপড়-চোপড়' এই কথাটা তবু কেন রয় চালু
অনায়াসে যায় পেরিয়ে সকল সড়ক, বন ঢালু,
কাপড়-চোপড় একসাথে রয় কেন পুঁথি-পত্তরে
এ সব কথার জওয়াব মোটে হয় না দু'চার ছত্তরে।

চোপড় পরার ভাগ্য সবার হয় না জেনো সব কালে;
চোপড় পরে তারাই শুধু, নাচে যারা সব তালে।
নামটা গোপন করে আমি বলছি ছিলেন এক রাজা
হুজুগ-পাগল; সব হুজুগে মনটা ছিল তরতাজা,
চোপড় পরার খেয়াল হল কেউ জানে না তাঁর কেন;
রাজার খেয়াল,—পিঠে সবার চাপলো পাহাড় ভার যেন।

কোথায় চোপড়, কোথায় চোপড় পড়ল সাড়া সবখানে,
পেয়াদা, পাইক, বরকন্দাজ ছোটে চোপড় সন্ধানে,
কেউ বা ছোটে হাটের পথে, কেউ বা তাঁতির ঘর পানে;
তাঁতিরা কয় : আজব বটে, চোপড় কথার নাই মানে।
হোক না বুনোট যেমন তরো কাপড় হবে শেষটাতে;
কাজে কাজেই চোপড় পাওয়া গেল না আর দেশটাতে।

হঠাৎ এল এমন সময় অচিন দেশের দুই তাঁতি,
রাজা বলেন : বুনলে চোপড় ইনাম দিব দুই হাতি,
কিম্বা দুটো হাতির ওজন সোনা রুপা চাও যদি
দিতে পারি বুনলে চোপড়—কথা মেনে নাও যদি,
মুচকি হেসে দুই সেয়ানা তাঁতি বলে : তাই হবে।
দেশের মানুষ ভাবে : এরা শয়তানটার ভাই হবে।

সারাটা দিন, সারাটা রাত ঠক-ঠকাঠক তাঁত চলে,
কেউ বোঝে না কেমন করে দিনরাত্তির হাত চলে,
অচিন দেশের তাঁতির কথায় কড়া হুকুম দেন রাজা
পারবে না কেউ কাছে যেতে, গেলেই পাবে ঠিক সাজা,
মাস তিনেকের মেহনতে ভাই চোপড় শেষে হয় না বোনা;
বাক্সো বোঝাই চোপড় দিয়ে তাঁতিরা নেয় সব সোনা।

উজির, নাজির ডেকে তখন বলেন : দাও সব ঢেরা
দেখতে মানুষ আসুক এবার, পরব চোপড় সব সেরা,
দলে দলে আসে মানুষ দেখতে পোশাক আজগুবি;
পেঁটরা খুলে রাজা তখন করেন সজ্জা-সাজ খুব-ই,
হাতির উপর সোয়ার হয়ে চোপড় পরে যান তিনি,
মনের সুখে যাত্রাগানের দু'চার কলি গান তিনি।

চোপড়-পরা রাজা দেখে ওঠে সবার মন দুলে;
চোখ নামিয়ে নেয় যে সবাই, তাকায় না আর চোখ তুলে।
'কাঁচের কাপড় হতেও পারে'—ভাবছে যখন বিজ্ঞেরা,
ন্যাংটো রাজার কথা তখন ভাবে অনভিজ্ঞেরা।
বলার সাহস নাই মনে, তাই থাকে সবাই চুপ করে,
গোঁফের কাছে এলেও হাসি লুকায় পেটে ঝুপ করে।

এক যে ছিল দামাল ছেলে কাপড়ে তার সাত তালি
ন্যাংটো রাজা দেখতে পেয়ে দেয় সে জোরে হাত তালি,
তিন তিরিক্ষে মানে ন'বার ডিগবাজি সে খায় জোরে,
ন্যাংটো রাজার কাহিনীটা তারপরে সে গায় জোরে,
"দুয়ো দুয়ো ন্যাংটো রাজা" চেঁচিয়ে বলে দূর থেকে;
মনের কথা শোনে সবাই দামাল ছেলের সুর থেকে।

চমকে দেখেন মূর্খ রাজা নাই পরনে বস্ত্রটা,
রাগের চোটে চ্যাঁচান তিনি, চান ধারালো অস্ত্রটা,
এক লহমায় ফাঁস হয়ে যায় ধূর্ত তাঁতির ফন্দি যে,
ভাবেন রাজা : কয়েদখানায় করব এবার বন্দি যে,
কিন্তু কোথায় ধূর্ত তাঁতি—শোনেন রাজা দিনশেষে
অনেক আগেই পেরিয়ে পগার গেছে চলে ভিনদেশে।

কুমারেশ ঘোষ

আকবর বাদশার খাওয়া

আমরা তো সকলেই খাই। কেউ একবেলা, কেউ দু'বেলা, কেউ তিনবেলা বা চারবেলা, আবার কেউবা খায় হরদম। আবার চোখের খিদে বলেও একরকম খিদে আছে, খাবার কিছু চোখের সামনে পড়লেই চেখে দেখবার ইচ্ছে হয়, তা সে খিদে থাকুক আর না-থাকুক।

তাছাড়া নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়া! বাড়িতে তো রোজ আটপৌরে খাওয়া : ডাল, ভাত, ভাজা, তরকারি, মাছের ঝোল, ব্যস্। অবশ্য মাঝে মাঝে মাংস বা ডিম। তাও আবার জিনিসপত্রের দাম এত বেড়ে গেছে যে ঐসব আইটেম সবদিন হয় না। তবে হ্যাঁ, নেমন্তন্ন বাড়ির খাওয়াটাকে একটা খাওয়া বলা যেতে পারে—যাকে বলে পোশাকি খাওয়া। বেশ ফিটফাট পোশাক পরে খেতে যাওয়া। আর আইটেমও কম নাকি! ছ্যাঁচড়া, ভাজা, মুগডাল, ডালনা, লুচি, রাধাবল্লভী, পোলাও বা ফ্রাইড রাইস। তারপর ভেটকি মাছের ফ্রাই, মাছের চাপ, মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, মাংস, চাটনি, পাঁপর, দই, সন্দেশ, রাজভোগ, আর শেষে পান। উহ্, ভাবতেও ভালো লাগে!

কিন্তু ভাবতে পারো মোঘল বাদশা আকবরের খাওয়ার কথা! তিনি ছিলেন সারা ভারতের সম্রাট বা বাদশা। লোকে বলত, দিল্লিশ্বর বা জগদীশ্বর। মানে দিল্লিশ্বরই জগদীশ্বর। অতএব বুঝতেই

পারছ, তাঁর খাওয়ার বহরটা কেমন হবে। তোমরা ভাবছ বাদশা আকবর নিশ্চয়ই মহাভারতের সেই ভীমের মতন খেতেন, কিংবা নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার যুগের বারোমণী কৈলাসের মতোন খেতেন।

মোটেই নয়। আকবর বাদশা দিনরাতের মধ্যে মাত্র একবার খেতেন। ভাবছ, আমি কী করে জানলাম! আমি জেনেছি তখনকার ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবর' বই থেকে। বাদশা আকবরের বিষয়ে এবং তখনকার ভারতবর্ষের কথা, তাঁর রাজ্যশাসনের ব্যবস্থার কথা অনেককিছুই সেই বইতে লিখে গেছেন তিনি।

আকবর বাদশা দিনেরাত্রে মাত্র একবার খেতেন বটে, তবে সে খাওয়ার, রান্নার পরিবেশনের ঘটাঘটি ছিল দেখবার মতো।

বাদশার রাজপ্রাসাদের পাকশালায় প্রধান বাবুর্চির নাম ছিল মীর বেকাইওয়েল। তাঁর অধীনে অনেক বাবুর্চি, জোগানদার ছিল। ভাঁড়ার থাকত ভর্তি। থরে থরে সাজানো থাকত মাংস, ঘি, তেল, শাকসবজি, নানাদেশের নানারকমের ফল, নানারকমের গরমমসলা, আর বহুরকমের মিষ্টি। বছরে একবার করে ভাঁড়ারের বাড়তি মাল বিতরণ করে দেওয়া হত।

এখনকার মতো তখনকার দিনে সাধারণ মানুষও রেশনের পচা দুর্গন্ধ চালের কথা ভাবতেই পারত না। কাজেই বাদশার জন্যে যে চাল ব্যবহার করা হত তা উঁচুদরের। বহরঞ্চ নগর থেকে আনা হত সুখদোষ চাল, বাজোরি থেকে আসত খঞ্জন চাল। তাছাড়া ঘি আর তেল আসত হিসার থেকে, কাশ্মির থেকে আসত নানারকমের জলচর আর স্থলচর পাখি। ভেড়া, ছাগল, মুরগিগুলোকে বিশেষ উপায়ে মোটা, তাজা আর মেদবহুল করা হত। এদের পোলাও-এর আকনি জল বা মাংসের ক্বাথ খাওয়ানো হত। শাকসবজির জন্যে বাদশার আলাদা বাগানই ছিল। বাদশার খাবার বাসনকোসন ছিল সোনা, রুপা, শাদা মার্বেল পাথর ও দামি চীনামাটির তৈরি।

বাদশার খাবার জন্যে যখন বাবুর্চি আর বয়বেয়ারারা খাবার নিয়ে আসত, তখন রেশমের রুমালে তাদের নাক মুখ বাঁধা থাকত। কেন বুঝতেই পারছ। খাবারভর্তি দামি বাটিগুলোও রেশমের রুমালে সুন্দর করে মুখ-বাঁধা থাকত। পাছে ধুলোবালি পড়ে। শুধু তাই নয়, বাটিগুলোর মুখ বাঁধবার পর হেড-বাবুর্চি মীর বেকাইওয়েল নিজের হাতে প্রত্যেকটায় সিলমোহর করে দিতেন। আর খাবারগুলো মিছিল করে যখন বাদশার কাছে নিয়ে যাওয়া হত, তখন তার আগে পাছে, ডাইনে বাঁয়ে চলত চোপদার, দারোগা, আর তলোয়ার কাঁধে সৈন্যরা।

বাদশার সামনে সব খাবার সাজিয়ে রেখে তাঁর সামনেই সিলমোহর এক এক করে ভাঙতেন প্রধান বাবুর্চি সাহেব আর এক একটি খাবার চেখে চেখে দেখাতেন বাদশাকে। কারণ হচ্ছে, খাবারে যে বিষ মেশানো নেই, সেটা প্রমাণ করা। প্রধান বাবুর্চির সব চাখা শেষ হলে, বাদশা পাতে হাত দিতেন। একটু-একটু করে খেতে-খেতেই তাঁর পেট ভরে যেত। তখন তিনি বাবুর্চিদের ধন্যবাদ দিতেন। পরে যেসব খাবার পড়ে থাকত—আর বেশ অনেকটা করেই পড়ে থাকত, সেগুলোকে আবার ফেরত নিয়ে যাওয়া হত পাকশালায়। আর সেখানে সকলের যে কীরকম ভোজন-পর্ব চলত, তা বুঝতেই পারছ।

বাদশার জন্যে পাকশালায় সাধারণত তিন রকম রান্না হত। প্রথম, নিরামিষ, যাকে ফারসিতে বলা হত 'সুফিয়ানা'। দ্বিতীয়, পোলাও পলান্ন ইত্যাদি। তৃতীয়, মাংস, শাক-সবজি ইত্যাদি।

নিরামিষ যা যা রান্না হত তার মধ্যে কয়েকটির নাম বলি : জর্দ বিরিঞ্জ, খুস্কে, খিচুড়ি (এ বস্তু আমাদের জানা, তবে বাদশাহি-খিচুড়ি রান্না যা-তা ব্যাপার ছিল না), সের-বিরিঞ্জ, বদিঞ্জন, পাহেত (পায়েস নয়), হালুয়া (আমাদের জানা বটে, তবে তৈরি হত দশ সের সুজি, দশ সের মিছরি, দশ সের ঘি, দশ সের দুধ দিয়ে। আর তাতে দেওয়া হত কিশমিশ, পেস্তা বাদাম, বেদানার রস ইত্যাদি)।

পোলাও-পলান্নের কয়েকটা আইটেম হচ্ছে : কাবুলি, দে বজদ বেরিয়ান, কিমা-পোলাও, সওলা, বাখরা, কিমা সুরবা, হেরেসা, কেশেক, হালিম, নুতব ইত্যাদি। এর মধ্যে কিমা-পোলাওটা একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কাজেই বাদশাহি কিমা-পোলাও-এর পাকপ্রণালীটা বলি। বাড়িতে তৈরি করে মোগলাই খাবার একটা অন্তত খেয়ে মুখটা বদলানো যেতে পারে। লাগবে চাল আর মাংস দশ সের করে। মাংসে হাড় থাকলে চলবে না। চার সের ঘি, আড়াই সের ছাড়ানো নাখদ, দু সের পেঁয়াজ, একপোয়া কাঁচা আদা, তাছাড়া পরিমাণমতো গোলমরিচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি, কাবাবচিনি, জাফরান, বড় এলাচ ইত্যাদি। যদি শুকনো মনে হয়, তবে বেশখানিকটা আঙুরের রস দিলেই হবে।

এবার তৃতীয় নম্বরের রান্নার নামগুলো বলি : মানে, মাংস শাকসবজি তৈরি। বেরিয়ান দুরস্ত গোস্কুদ, ইয়েটনি, উলসে, কাবাব মেসেম্মান, দুনয়াজা, মেতেঞ্জেনা গোস্পান, দমপোক্ত, কালিয়া, মলঘোবা ইত্যাদি। এই মেসেম্মান এখন রেস্টুরেন্টে মোরগ-মসল্লাম হয়েছে। বাদশাহি মেসেম্মান তৈরির পদ্ধতিটা বলি : একটা বড় মুরগির হাড় তার গলা থেকে এমনভাবে বার করতে হবে যে তার দেহের মাংস যেখানে যেমন সেখানে তেমন থাকবে। তারপর তার পেটের মধ্যে পাঁচটা ডিম ভেঙে দিয়ে কিছু জাফরান দিয়ে পেট সেলাই করে দিতে হবে। পরে কিছু নুন, পেঁয়াজের রস, আদার রস মাখাতে হবে। আর 'উলসে'টি হচ্ছে পানীয়। একটি ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চাকে এমনভাবে গরম জলে সিদ্ধ করতে হবে যে তার গায়ের সব লোম উঠে যাবে। পরে নিংড়ে তার ক্বাথ বার করতে হবে। সেই ক্বাথে নানারকম মসলা মিশিয়ে এই উপাদেয় পানীয় তৈরি হয়।

তোমরা অনেকেই রেস্টুরেন্টে মোগলাই পরোটা খেয়েছ। মোগল বাদশা আকবর কিন্তু মোগলাই রুটি খেতেন। তাঁর জন্যে রোজ একখানা বড় রুটি তৈরি হত। তাতে লাগত দশ সের ময়দা, পাঁচ সের দুধ, দেড় সের ঘি, একপোয়া নুন। এর সঙ্গে পরিমাণমতো ছানার জল বা আঙুর কিংবা বেদানার রস মেশানো হত। আর মেশানো হত বাদাম পেস্তা কিশমিশ। এইসব মিশিয়ে মাখিয়ে রুটির

আকারে তৈরি করে তন্দুরে সিদ্ধ করা হত। এই বাদশাহি রুটি ছাড়া বাদশাহ মুখ বদলাতে মাঝে মাঝে লুচিও খেতেন।

বাদশার রান্নায় এত যে মাংসের ছড়াছড়ি, কিন্তু তিনি পরে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন; হয়েছিলেন পুরোপুরি নিরামিষভোজী। তিনি বললেন : আল্লাহ বা ঈশ্বর মানুষের জন্যে নানারকম খাওয়ার জিনিস সৃষ্টি করেছেন। সেসব থাকতেও মানুষ জীবজন্তুকে নিজের পেটের মধ্যে কবর দেয়। এ বড় অন্যায়। আমি নেহাত রাজা হয়ে জন্মেছি, তাই নানা অবস্থায় পড়ে আমাকে মাংস খেতে হয়েছে। তবে ক্রমে ক্রমে আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি।

তাই বাদশা প্রথমে মাসে একবার মাংস খেতেন না, পরে প্রত্যেক রবিবারে মাংস খেতেন না। শেষে অমাবস্যা পূর্ণিমাতেও মাংস ছুঁতেন না। শেষে নিজের জন্মমাসেও নিরামিষাশী হয়ে থাকতেন।

বাদশা ফল খেতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি পারস্য, তাতার, কাবুল, কান্দাহার থেকে ভালো ভালো ফলবাগানের মালি আনিয়ে এই ভারতবর্ষে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। তাছাড়া কাবুল কান্দাহার আর অন্যান্য দেশ থেকে আনাতেন ভালো জাতের নাশপাতি, বাবাসেতি, আশি-সেরী, দুধচেরাগ, আঙুর, বেদানা, পিচ, এপ্রিকট, চেরিফল ইত্যাদি। বাদশা চেরিফলের নাম রেখেছিলেন 'শা-আলু'।

ভিতু বীর সমাচার

হাজারো রকম মানুষ নিয়েই আমাদের এ সমাজ। এ সমাজে এমন মানুষও আছেন যুদ্ধমাঠে শত্রুসৈন্যদের হত্যা করতে যাঁদের বুক কাঁপে না, অথচ আঁতকে ওঠেন সামান্য একটি আরশোলা দেখে। কেন যে এমন হয় তা বোঝা না-গেলেও ব্যাপারটা যে খুবই রহস্যময় তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এমনই একটি ঘটনার নায়ক ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত বীর ফিল্ড মার্শাল নিকোলাস অগাস্টি দ্যা মন্ট্রিভেল (১৬৪৬-১৭১৬)।

প্রায় একশোটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে ফিল্ড মার্শাল অগাস্টি দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ফরাসিদের কাছে। একশোটি যুদ্ধের বীর সৈনিক–তাঁর মনোবল এবং দৈহিক ক্ষমতা সন্দেহাতীত। কিন্তু ভদ্রলোক সামান্য একটি লবণদানি পড়ার শব্দ শুনে এমনই চমকে উঠেছিলেন যে, সাথে সাথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি!

একদিন রাতে ফিল্ড মার্শাল অগাস্টি খেতে বসেছেন। তাঁর সাথে খেতে বসেছিলেন তাঁর এক বন্ধু। দু'জনে গল্প করছিলেন আর খেয়ে চলছিলেন একনাগাড়ে।

ফিল্ড মার্শালের বন্ধু লবণদানি থেকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে লবণ মিশিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর খাবারে। ফলে খুট্ খুট্ করে একটা শব্দ হয়।

ব্যাপারটা অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ওই খুট্ ধরনের শব্দটি শুনেই ভয়ংকরভাবে চমকে ওঠেন বীরযোদ্ধা ফিল্ড মার্শাল অগাস্টি। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠে ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে! আর তা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যান ফিল্ড মার্শালের অতিথি বন্ধু।

মিখাইল শলোখভ

অশ্বশাবক

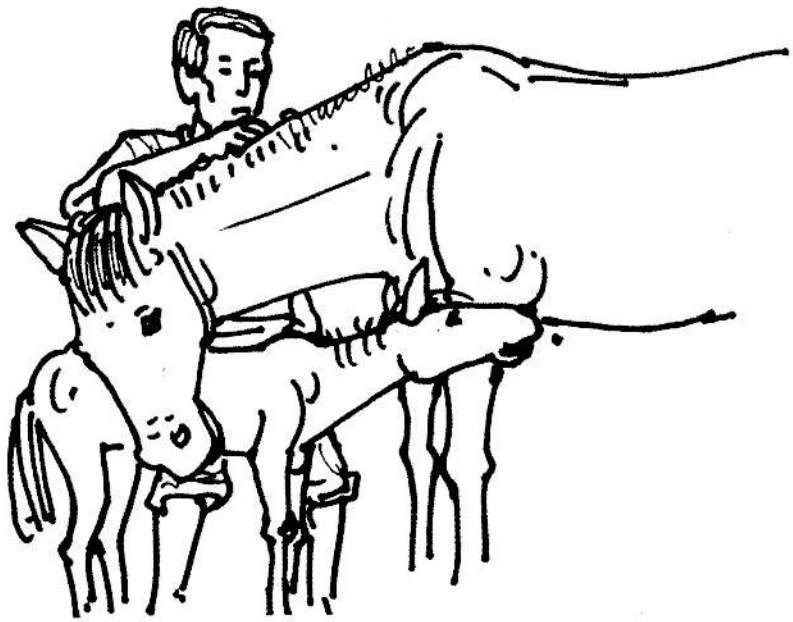

পৃথিবীতে সেদিন উজ্জ্বল দিনের আলো। গোবরের একটা স্তূপের ওপর একঝাঁক নীল মাছি ভন ভন শব্দে উড়ছে। ওই স্তূপের ঠিক পাশেই মাথা সামনে এবং পা পেছনের দিকে প্রসারিত করে ঘোড়ার বাচ্চাটি তার মায়ের শরীর থেকে বার হয়। দুনিয়ায় তার প্রথম অভিজ্ঞতা ভীতির। শূন্যে, মাথার ওপর মনোরম ও দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া নীলচে-ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে একটা শেল ফাটে আর তার প্রচণ্ড শব্দ চটচটে রসে ভেজা নবজাতককে তার মায়ের পায়ের ফাঁকে কাঁপিয়ে তোলে। আস্তাবলের টালির ছাদেও গোলাবৃষ্টি এসে লাগে। কিছু কিছু গোলা মাটিতেও পড়ে। বাচ্চাটির মা, ট্রফিমের বাদামি ঘোড়া, লাফ দিয়ে সামনের পায়ে ভর করে একটু উঠেই ক্ষীণ আর্তনাদ করে আবার পড়ে যায়। স্তূপীকৃত পাঁউষের আড়ালে বসে সে তার ঘামে ভেজা, খড়কুটো লেগে-থাকা শরীর স্তূপের গায়ে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে থাকে।

এরপর এক যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতার মধ্যে মাছির গুঞ্জরণ আরো বেড়ে যায়। একটা মোরগ বেড়ার ওপর উঠে গোলাগুলির মোকাবেলা করবার মতো সাহস না পেয়ে পাশেই অলডার ঝোপের আড়ালে দু-একবার পাখা ঝাপটায় এবং কিছুটা চাপা হলেও অপ্রতিরোধ্য এক ডাক আনতে সক্ষম হয়। একধারে ঘরের মধ্যে একজন আহত মেশিনগান চালক ঝগড়াটে স্বরে কাতরাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে কর্কশ উঁচুকণ্ঠে কার মুণ্ডুপাত করছিল। সামনের ছোট বাগানটায় মখমলের মতো লাল পপি ফুলের ওপর মৌমাছি গুঞ্জরণ তুলছিল। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ওধার থেকে মেশিনগানের একটানা শব্দ

আসছিল—ট্যাট ট্যাট ট্যাট। মাঝে মাঝে ফাটছিল শেল। শেল ফাটবার মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলির সুযোগ নিয়ে বাদামি ঘোড়াটি তার প্রথম সন্তানের শরীর খুব স্নেহের সঙ্গে ধীরে ধীরে চাটতে থাকে। বাচ্চাটিও তার মায়ের স্ফীত স্তন এবং ভালোবাসার অসীম সুখ জীবনের প্রথম প্রাণভরে পান করে।

শস্যমাড়াই উঠোনের পেছনে দ্বিতীয়বার বোম ফাটলে ট্রফিম সশব্দে দরজার কপাট ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে আসে; এবং সোজা রওনা হয় আস্তাবলের দিকে। পাঁউষের স্তূপ ঘুরে আস্তাবলের কাছে গিয়ে সূর্যকে আড়াল করবার জন্য একটা হাত চোখে দিতেই দেখতে পায় ঘোড়ার বাচ্চাটাকে—সমস্ত শরীর কম্পমান—তার মাদী ঘোড়ার বাঁট চুষছে। দেখে শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে পকেট হাতড়ায় সিগারেটের জন্য এবং কম্পিত আঙুলে একটা সিগারেট বার করে ধরায়।

'আচ্ছা, বৎস', এতক্ষণে ট্রফিমের কথা ফোটে, 'তুমি তাহলে বিয়োলেই? কিন্তু খাসা সময়ই বেছে নিয়েছ, যা হোক।'

তিক্ততায় ঝনঝন করে ওঠে তার স্বর।

ঘোড়াটাকে বিশ্রীরকম চিকন আর দুর্বল দেখাচ্ছিল। ঘাসের টুকরো, গোবর-চোনার ছিটে-ফোঁটা লেগেছিল চামড়ার সঙ্গে; এবং চোখজোড়া খুব ক্লান্ত হলেও গর্ব ও আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল। আর অন্তত ট্রফিমের কাছে মনে হয় যেন ঘোড়াটির সার্টিনের মতো ওপরের ঠোঁট মৃদু হাসিতে কুঁচকে গেছে। ঘোড়াটাকে সে আস্তাবলের ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর যখন শ্রীমতী মাথা ঝাঁকিয়ে খাবারের থলের ভিতর নাক ডুবিয়ে ঘড় ঘড় শব্দে খেতে থাকে, ট্রফিম দরজার খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে নীরবে বাচ্চাটার দিকে হিংসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'তাহলে এই তোমার যেখানে সেখানে ঘুরেফিরে বেড়াবার ফল, তাই না?'

ঘোড়াটা কোনো উত্তর দেয় না।

'কিন্তু তুই তো অন্তত ইগনাটের পালের ঘোড়াটার কাছ থেকেও এটা পেতে পারতিস। তা না কোত্থেকে, আল্লাই জানে, কী জুটিয়ে নিয়ে এলি! একরত্তি এই বাচ্চা নিয়ে এখন আমি করি কি, বল তো!'

আস্তাবলের ছায়া ছায়া থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে শস্য চিবানোর শব্দ আসতে থাকে। সূর্যের এক চিলতে আলো দরজার একটা ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে যেখানেই স্পর্শ করছিল, সোনা ছড়াচ্ছিল। ট্রফিমের বাঁ গাল পেরিয়ে তা তার গোঁফ এবং খোঁচা খোঁচা দাড়ির লালচে উজ্জ্বল তামাটে করে মুখের চারধারের কালো রেখাবলীকে স্পষ্ট করে তোলে। বাচ্চাটা ওদিকে লম্বা সরু পায়ে একটা কাঠের খেলনার মতো দাঁড়িয়েছিল।

'দেব নাকি শেষ করে?' ট্রফিম তামাকের কালশিটে পড়া বাঁকা তর্জনী তুলে বাচ্চাটার দিকে নির্দেশ করে। মাদী ঘোড়া তার রক্তবর্ণ চোখ তুলে পিটপিট করে তাকিয়ে প্রভুর দিকে একটা তিরস্কারের দৃষ্টি ছুড়ে মারে।

ওইদিন সন্ধ্যায় ট্রফিম তার স্কোয়াড্রন কম্যান্ডারের সঙ্গে আলাপ করে।

'কয়েকদিন থেকেই দেখতাম আমার মাদীটা সতর্কভাবে চলাফেরা করত। লাফ-ঝাঁপ দিত না কিংবা জোর কদমেও ছুটতে চাইত না। অল্পতেই হাঁপিয়ে পড়ত। তাই আমার সন্দেহ হয় এবং লক্ষ করতেই বুঝি পেটে বাচ্চা আছে। ওইজন্যই এত সতর্কতা। তা বাচ্চাটা হয়েছে বাদামি রঙের। বেশ, এই তো ব্যাপার।' ট্রফিম কথা শেষ করে।

আক্রমণের সময় স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার যেমন করে তলোয়ারের বাট চেপে ধরে এখন সে তেমনি তামার চায়ের পেয়ালা সজোরে চেপে ধরল। আলোর হলুদ শিখার চারধারে পতঙ্গরা মাতালের মতো

নাচছিল। জানালা খোলা পেয়ে বাইরের অন্ধকার থেকে অনেক কীটপতঙ্গ এসে জুটেছিল, কিছুক্ষণ নেচে তপ্ত কাঁচের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করবার জন্য। তারপর মৃতের স্থান দখল করতে আবার অন্যেরা আসছিল। সেইদিকে কম্যান্ডার তন্দ্রালু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

'বাদামি হোক, কালো হোক, তাতে কী এসে যায়?' অবশেষে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার মুখ খোলে, 'যেভাবেই হোক ওটাকে খতম করতে হবে। আমরা কি জিপসি নাকি? ঘোড়ার কাচ্চাবাচ্চা টেনে নিয়ে বেড়াব—অ্যাঁ? থাকগে যা বলছিলাম—আমরা কি জিপসি? মনে কর কম্যান্ডার সাহেব এলেন রেজিমেন্ট দেখতে—আর তোমার এই শ্রীমান বাচ্চাটা তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে সব শৃঙ্খলা পণ্ড করে ফেলল, তখন কী হবে? সমস্ত লালবাহিনীর সামনে আমরা হেয় হয়ে যাব! আমি বুঝতে পারছি না, ট্রফিম, কী করে তুমি এটা বরদাশত করলে? গৃহযুদ্ধের এই চরম সময়ে এরকম! ছি, ছি! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আস্তাবলের সহিসগুলো করে কী? ওদের ওপরও তো নির্দেশ ছিল পালের ঘোড়াগুলোকে যেন মাদীগুলোর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে না দেয়া হয়।'

পরদিন সকালে যখন ট্রফিম তার রাইফেল নিয়ে বার হয় তখনো সূর্য ওঠেনি কিন্তু ঘাসে ঘাসে শিশির-বিন্দু গোলাপি আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। পদাতিক বাহিনীর বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট এবং ট্রেঞ্চের আঁকাবাঁকা রেখায় পূর্ণ খোলা মাঠকে মনে হচ্ছে অশ্রুচিহ্নিত দুঃখ-রেখা আঁকা কোনো কিশোরীর মুখ। উঠানে বাবুর্চিরা নাস্তা তৈরি করছে। স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার তার ঘামে সেঁটে যাওয়া অন্তর্বাস নিয়ে চৌকাঠের ওপর বসে বসে সর তোলবার একটা বেতের যন্ত্র বানাচ্ছে। এককালের এইসব গৃহস্থালী কাজকর্মের চাইতে ইদানীং রিভলভারের বলদায়ক ঠাণ্ডা স্পর্শে তার হাত বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। সেইজন্য এখন এই কাজে হাতদুটি তার কেবলই আনাড়ির মতো নড়াচড়া করতে থাকে।

'কী বানাচ্ছেন? মাঠা তোলার চরকা?' যেতে যেতে ট্রফিম জিজ্ঞাসা করে।

'আহ, আর বল কেন বাপু; বৌ পেছনে লেগেই আছে', হাতলের চারধারে একটা বেত জড়াতে জড়াতে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার বিড়বিড় করে, 'একসময় এইসব কাজে বেশ হাত আসত, কিন্তু এখন আর সেই দক্ষতা নেই।'

'কৈ, আমার কাছে তো বিলকুল ঠিক লাগছে,' ট্রফিম উত্তর দেয়।

স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার কোলের ওপর থেকে অবশিষ্ট বেতগুলো ঝেড়ে ফেলে।

'বাচ্চাটাকে মারতে যাচ্ছ তো?' জানতে চায় সে।

ট্রফিম ঘাড় নেড়ে আস্তাবলের দিকে চলে যায়।

স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার মাথা গুঁজে বসে গুলির আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কোথায় কি! মিনিটের পর মিনিট চলে যায় কোনো শব্দ হয় না। কিছুক্ষণ পর ট্রফিম আস্তাবলের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে। ওকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল খুব।

'কী ব্যাপার?'

'পিনটা বোধ হয় আটকে গেছে, গুলি হচ্ছে না।'

'দেখি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ট্রফিম রাইফেলটা তার হাতে দেয়। স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার খিল খুলে ফেলে!

'আরে, এতে তো গুলিই ভরা হয়নি।'

'বলেন কি!' ট্রফিম অবাক হবার ভান করে।

'আমি বলছি একেবারে ফাঁকা।'

'তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। আমিই ওটা ফাঁকা করেছি। আস্তাবলের পেছনে।'

কম্যান্ডার ধীরে রাইফেলটা নামিয়ে রাখে। কিছুক্ষণ কিছুই বলে না, কেবল যন্ত্রের মতো সদ্য তৈরি বেতের বস্তুটির ওপর আঙুল চালাতে থাকে। টাটকা সতেজ কাঠিগুলো তখনো বেশ আঠাল। সেসব থেকে ফুলন্ত উইলোর ঘ্রাণের মতো সুগন্ধ উড়ে এসে তার নাসারন্ধ্র ভরিয়ে দেয়। আর সেই সঙ্গে ভেসে আসে নতুন চষা জমির গন্ধ। যুদ্ধের অগ্নিশিখায় বহুকাল এই ঘ্রাণ সে বিস্মৃত হয়ে ছিল।

'ধুত্তোর!' কম্যান্ডার বলে উঠে। 'বেঁচে থাক ওটা; কিছুদিন অন্তত থাক। একদিন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে ও হয়তো কারো জন্য হাল টানবে। আর কম্যান্ডার সাব—বেশ তো এলে দেখবে সমস্ত ব্যাপার, কারণ দুধের বাচ্চার দুধ খাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে; আমরাও সবাই তা করে এসেছি, এমনকি কম্যান্ডার সাব নিজেও। তাহলে তো ওই একই হল। বুঝলে ট্রফিম, বন্দুকে তোমার গড়বড় নেই।'

* * *

মাসখানেক পর উস্টখোপারস্কায়া গ্রামের কাছে ট্রফিমের স্কোয়াড্রন এক কোম্পানি কসাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ শুরু হয় শেষ বিকেলের দিকে এবং স্কোয়াড্রন যখন চার্জ করে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। ট্রফিম শীঘ্রই তার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। তার ঘোড়াটা ভয়ানক বাড়াবাড়ি করতে থাকে। লাগামের টানে নাক কেটে দড়ি বসে রক্তপাত হয়, কশাঘাত পড়তে থাকে অবিরাম, কিন্তু কিসের কি? কিছুই তাকে আক্রমণে অংশ নেওয়াতে পারে না যতক্ষণ না তার বাচ্চা লেজ উঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে কাছে আসে, ততক্ষণ সে পেছন দিকে মাথা ফিরিয়ে কর্কশ স্বরে হ্রেষা তুলে পা ঠুকতে ঠুকতে বিচলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাগে ট্রফিমের মুখ কুঁচকে যায়। তলোয়ার খাপে পুরে সে কাঁধ থেকে রাইফেল তুলে নেয়। মাঠের একপ্রান্তে স্কোয়াড্রনের ডান অংশ ইতোমধ্যেই শত্রুর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ঘোড়সওয়ারেরা সবাই একসঙ্গে এমনভাবে এক একবার এগোচ্ছিল আবার পিছিয়ে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন বাতাসের নাড়া পেয়ে সবাই দুলছে। কখনো আবার ঘোড়ার খুরের শব্দে ভেঙে পড়া থমথমে নিস্তব্ধতার

ভেতর হঠাৎ সবাই একসঙ্গে ছুটে যাচ্ছিল। যুদ্ধরত মানুষগুলোর দিকে ট্রফিম চকিতে একবার তাকিয়ে তারপর ফিরে ঘোড়ার বাচ্চাটার মসৃণ নিপুণ আকৃতির মাথার দিকে দ্রুত তাক করে। কিন্তু ট্রিগার টেপবার সময় নিশ্চয়ই তার হাত কেঁপে যায়, কিংবা হয়তো অন্যকিছুতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকবে, যার জন্য বাচ্চাটা খেলাচ্ছলে গুলিটাকে এড়িয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চিঁহি-হি করে ওঠে এবং ছোট ছোট ধূসর ধুলার কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে চরকির মতো ছুটতে থাকে। তারপর কিছুদূর গিয়ে থামে এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শয়তানটাকে লক্ষ্য করে ট্রফিম পুরো এক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে—লালমাথা ইস্পাতের গুলি—কার্তুজের থলেতে হাত দিয়ে প্রথমেই যেগুলো হাতে ঠেকেছিল। বুলেটগুলো কিন্তু বাচ্চাটার কোনো ক্ষতিই করে না। ক্রুদ্ধ রোষে গাল দিয়ে ট্রফিম আবার তার মাদী ঘোড়ায় চেপে যত দ্রুত সম্ভব স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার এবং তার তিনজন সহযোদ্ধার সাহায্যে এগিয়ে যায়। ওদিকটায় ওরা দাঁড়িঅলা লালমুখো প্রাচীনপন্থী কসাকদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

সেই রাতে স্তেপের মধ্যে একটা সংকীর্ণ খাতে ট্রফিমের স্কোয়াড্রন তাঁবু ফেলে। ধূমপান হয় না বললেই চলে; ঘোড়ার জিন যেমন ছিল তেমনি লাগান থাকে। নদীর ধারে চৌকিতে পাঠানো একদল সৈন্য এসে খবর দেয় যে নদী পার হবার জায়গায় শত্রুরা প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে।

নগ্ন পা ক্যাম্বিসের ভাঁজে ঢেকে ট্রফিম অর্ধতন্দ্রায় শুয়ে শুয়ে সারাদিনের ঘটনাবলি স্মরণ করছে। চোখের সামনে আবার সে দেখতে পায়—স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার খাড়া তীর ধরে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে, আর ব্রণ-বসন্তের দাগে ভরা প্রাচীনপন্থীরা দু'দিক থেকে ছুটে আসছে, রোগা কিশোর এক কসাক—কেউ তাকে দু'টুকরো করে ফেলেছে, কার একটা জিন জমাট রক্তে কালো হয়ে পড়ে আছে; হ্যাঁ, আর সেই অশ্বশাবক।...

ভোরের দিকে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার ট্রফিমের কাছে এসে বেশ জাঁকিয়ে বসে।

'ঘুমাচ্ছ, ট্রফিম?'

'ঝিম ধরে আছি।'

নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার বলে, 'তোমার ওই ঘোড়ার বাচ্চাটাকে মেরে ফেল। মনের জোর ঠিক রাখতে হলে ওর অস্তিত্ব খুবই ক্ষতিকর। ওকে দেখলেই আমি এমন হয়ে যাই, তলোয়ার আর হাতে ওঠে না। বুঝতেই পারছ ওটা খোদ ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর যুদ্ধক্ষেত্রে এই চিন্তাটা মোটেও কাম্য নয়, কী বল? অন্তরকে পাথর থেকে পানি বানিয়ে ফেলে। লক্ষ করছ, শয়তানটা তুমুল যুদ্ধের মধ্যেও বিলকুল ঠিক ছিল, গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি।'

স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার কিছুক্ষণের জন্য থামে, ঠোঁটে তার স্বপ্নালু হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু ট্রফিম তা দেখতে পায় না।

'ওর লেজ লক্ষ করছ, ট্রফিম, কীভাবে খাড়া হয়ে ওঠে, আর তা বাতাসে ভাসিয়ে কেমন লাফিয়ে চলে যায়? অবিকল শেয়ালের লেজের মতো। লেজেরও সৌন্দর্য আছে বটে।'

ট্রফিম কোনো উত্তর দেয় না। কোটটা সে মাথার ওপর টেনে দেয়, শিশিরের স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায় একটু কেঁপে ওঠে এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ে।

* * *

একটা প্রাচীন মাঠের বিপরীত দিকের ডান তীর থেকে বার হয়ে আসা পাহাড়ের একটি শাখা-নদীতীরকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। আর সেই সংকীর্ণ অঞ্চল দিয়ে ডন ছুটছে খরস্রোত ক্রোধে। বাঁকের কাছে পানি

টগবগ করে বুদ্বুদ সৃষ্টি করছে এবং সবুজ ঝুঁটিঅলা ঢেউ ধবধবে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে, পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় গত বর্ষার ভাঙনের চিহ্ন।

স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্য স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার কখনই মাঠের বিপরীত দিক থেকে নদী পার হবার হুকুম দিত না। কিন্তু যে জায়গায় নদী প্রশস্ততর, শান্ত এবং স্রোত মৃদু সেখানে কসাকেরা নদীতীর দখল করে বসেছে এবং পাহাড়কে রেখেছে তাদের আক্রমণের আওতায়।

দুপুরবেলায় নদী পার হওয়া শুরু হয়। একটা ভেলাকে নৌকা হিসাবে কাজে লাগান হয়েছিল, তাতে একটা মেশিনগানের গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট সৈন্যদল এবং তাদের অশ্বাদির জায়গা হয়। মাঝ-নদীতে গিয়ে স্রোতের মুখে ভেলাটা হঠাৎ দুলে উঠে একদিকে সামান্য কাত হয়ে যায়। বাঁদিকে বাঁধা ঘোড়াটা নদী-পারাপারের অভ্যাস না থাকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ওদিকে পার হবার জন্য পাহাড়ের আড়ালে সাজসজ্জা খুলে ফেলা স্কোয়াড্রন মাঝ-নদীর সেই আতঙ্কিত ঘোড়াটার অস্বস্তিকর ঘড়-ঘড় শব্দ এবং নৌকার পাটাতনে খুর ঠোকাবার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পায়।

'ওই ঘোড়াই শালা নৌকা ডোবাবে।' ট্রফিম বিষণ্নভাবে উচ্চারণ করে। মাদী ঘোড়ার ঘর্মাক্ত পিঠের ওপর সামান্য ঠেস দেওয়া কনুই সে নামিয়ে আনে। ওদিকে ভেলার ঘোড়াটা বিকট চিৎকারে হঠাৎ পিছিয়ে এসে পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে যায়।

'শুট!' স্কোয়াড্রন লিডার চ্যাঁচায়।

ট্রফিম দেখে মুহূর্তে একজন গোলন্দাজ জওয়ান লাফিয়ে ওই ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে উঠে দাঁড়িয়ে কানের ভেতর রিভলভার ঢুকিয়ে দিল। তীর থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায় খুব মৃদু, বাচ্চাদের খেলনা-বন্দুকের মতো। নৌকার অন্য ঘোড়া-দুটি পরস্পর আরো জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নৌকার ভারসাম্য রক্ষার জন্য গোলন্দাজ সৈন্যরা মৃত ঘোড়াটাকে ঠেলে নদীতে ফেলে দেয়। তার সামনের পা দুটো ধীরে ভাঁজ হয়ে মাথা পানির ভেতর ডুবে যায়।

মিনিট দশেক পর স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার তার বাদামি ঘোড়ায় চড়ে পানিতে নেমে পড়ে। পেছনে একশো আটজন অর্ধনগ্ন জওয়ান এবং সমসংখ্যক বিভিন্ন রঙের ঘোড়া প্রচণ্ড শব্দে জলে নেমে পড়ে। জিনগুলো তিনটি ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই করা হয়েছিল। এরই একটা ছিল ট্রফিমের নিয়ন্ত্রণে। ট্রুপলিডার নেচেপুরেঙ্কোর তত্ত্বাবধানে তার মাদী ঘোড়াকে রাখা হয়েছিল। অর্ধেকটা পথ গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখে অগ্রবর্তী ঘোড়াগুলো ইতিমধ্যেই হাঁটুজলে নেমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি খাবার জন্য মাথা নামিয়েছে। অর্ধস্ফুট স্বরে জওয়ানেরা তাদের ঘোড়াগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সৈন্যরা তাদের নিজ নিজ ঘোড়ার পাশে কেশর ধরে সাঁতরাচ্ছিল এবং একহাতে মাথার ওপর রাইফেল উঁচিয়ে ধরে রেখেছিল। রাইফেলের সঙ্গে বাঁধা ছিল তাদের কাপড়চোপড় এবং কার্তুজের থলে।

হাল ছেড়ে ট্রফিম নৌকার পাটাতনে উঠে দাঁড়ায়। চোখে রোদ লাগায় চোখ কুঁচকে সে তার বাদামি ঘোড়াকে এক নজর দেখবার জন্য সাঁতরে আসা প্রাণীগুলোর মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে। সমগ্র স্কোয়াড্রনটাকে মনে হয় যেন একঝাঁক বুনো হাঁস হঠাৎ গুলির শব্দে নীলাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্কোয়াড্রন লিডারের বাদামি ঘোড়াটা নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার চিকচিকে নিতম্বদেশ জলের বেশ ওপরে ওপরে ভেসে আসছিল। এই ঘোড়াটার লেজের ঠিক পেছনেই শ্বেতরূপালি দুটো চিহ্ন থেকে কমিসারের ঘোড়ার দুটি কান চেনা যায়। অবশিষ্ট ঘোড়াগুলো একটা প্রশস্ত কালো আকারে ওদের অনুসরণ করছিল। সবার শেষে ক্রমেই পিছিয়ে পড়া নেচেপুরেঙ্কোর রুক্ষ চুলের মাথা দেখা যায়। ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে সে সাঁতরাচ্ছিল। আর তার বাঁ-দিকেই দেখা যায় ট্রফিমের ঘোড়ার খাড়া কান। আরো পেছনে অনেক কষ্টে ট্রফিম সেই ঘোড়ার বাচ্চাটাকে খুঁজে

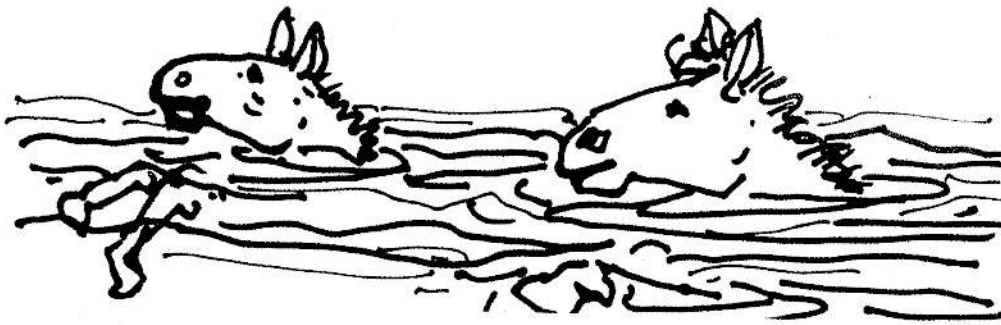

বার করে। আনাড়ির মতো সাঁতরাচ্ছিল—কখনো পানির ভেতর থেকে আধখানা উঠে, কখনো আবার একেবারে নাসারন্ধ্র পর্যন্ত ডুবিয়ে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ নদীর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে আসে তার ক্ষীণ, মাকড়সার জালের মতো ফিনফিনে আর্তস্বর, 'ইইই-উউউ'! তলোয়ারের মাথার মতো তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার সেই স্বর সোজা গিয়ে বেঁধে ট্রফিমের হৃৎপিণ্ডে। রীতিমতো আতঙ্কজনক এর প্রভাব। যুদ্ধের পুরো পাঁচটি বছর সে বেঁচে আছে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে বহুবার, কিন্তু এরকম আত্মসংযম কখনো হারায়নি। এখন খোঁচা খোঁচা লালচে দাড়ির নিচে তার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। দাঁড় তুলে নিয়ে স্রোতের মুখে যেখানে বাচ্চাটা হাবুডুবু খাচ্ছিল সেই ঘূর্ণাবর্তের দিকে নৌকা চালাতে থাকে। মাদী ঘোড়াটাও বিকট হ্রেষা তুলে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করার জন্য সেই দিকে সাঁতরাচ্ছিল। নেচেপুরেঙ্কো যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাকে রুখতে পারে না।

'বেকুবি করো না, ট্রফিম,' ট্রফিমের বন্ধু স্টেসকা ইয়েফরেমোভ নৌকার একগাদা জিনের ওপর বসে থেকে চিৎকার করে বলে, 'তীরের দিকে চালাও। কসাকদের দেখা যাচ্ছে!'

'চোপরও!' রাইফেল তুলে নিতে নিতে ট্রফিম জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে।

ঘোড়ার বাচ্চাটা এখন ভাটির টানে আরো দূরে গিয়ে একটা ছোটখাটো আবর্তে পড়েছে। সবুজ আঁচড়ানো ঢেউ দিয়ে ঘূর্ণাবর্ত তার শরীর চাটতে চাটতে তাকে অনায়াসে চক্রাকারে ঘোরাচ্ছিল। ট্রফিম বাইতে থাকে, একদিক থেকে আর একদিকে নৌকা কাত করে পাগলের মতো নৌকা বায় সে। নদীর ডান তীরে কসাকেরা পাহাড়ের আড়াল থেকে বার হয়ে আসে। সেই সঙ্গে একটা শক্তিশালী মেশিনগানও তোতলাতে শুরু করে। নদীর জলে বুলেট শিস দেয়। ছেঁড়া ক্যাম্বিসের শার্ট পরা একজন অফিসার তার রিভলভার নাচিয়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলে।

এখন ঘোড়ার বাচ্চাটার চিৎকার আরো দুর্বল, আরো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর আতঙ্কজনকভাবে মনে হচ্ছে যেন তা অবিকল মানুষের বাচ্চার কান্না। নেচেপুরেঙ্কো মাদী ঘোড়াটাকে ছেড়ে দ্রুত বাঁ-তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকে। এদিকে ট্রফিম কাঁপতে কাঁপতে তার বন্দুক তুলে ঘূর্ণিপাকের মধ্যে বাচ্চাটার মাথার সামান্য নিচে তাক করে গুলি করে। তারপর অস্ফুট, বিষণ্ন খেদোক্তি করে জুতো-জোড়া খুলে ফেলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ডানদিকের তীরে ক্যাম্বিস জামাপরা অফিসার চেঁচায়, 'ফায়ার বন্ধ!'

ইতিমধ্যে ট্রফিম বাচ্চাটার কাছে পৌঁছে গেছে এবং তার ঠাণ্ডা পেটের নিচে বাঁ-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মুখ থেকে পানি ছিটিয়ে সে বাম তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকে। শত্রুপক্ষ থেকে একটিও গুলির আওয়াজ শোনা যায় না।

আকাশ অরণ্য, নদীর বালুতীর—সবকিছুই সবুজ, ছায়া ছায়া। শেষপর্যন্ত প্রায় এক অতিমানবিক চেষ্টায় ট্রফিম তীরে পৌঁছে গা থেকে পানি চুঁইয়ে পড়া বাচ্চাটাকে টেনে তোলে পাড়ে। কিছুক্ষণ সে ওইখানেই শুয়ে শুয়ে বালিতে আঁচড় কাটতে এবং নদীর সবুজ পানি যা গিলছিল—উদগীরণ করতে থাকে। বনের মধ্যে কমরেডদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং বহুদূর বাঁকের ওপারে কোথা থেকে ভেসে আসে কামানের গর্জন। ইতিমধ্যে বাদামি মাদী ঘোড়াটাও উঠে এসে ট্রফিমের পাশে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বাচ্চাটার গা চাটতে থাকে। চকচকে জলের ফোঁটা নরম লেজের ডগা থেকে গড়িয়ে পড়ে বালির ওপর।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় ট্রফিম; তারপর বালির ওপর দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে। কিন্তু দু-এক পা গেছে কিনা অমনি সে হঠাৎ দুলে উঠে পড়ে যায়। উত্তপ্ত কিছু তার বুক ভেদ করে চলে গেছে। পড়তে পড়তে শোনে গুলির শব্দ। ডান তীর থেকে সোজাসুজি পিঠে একটা গুলি। আর ডান দিকের সেই জায়গায় ছেঁড়া ক্যাম্বিস শার্ট-পরা অফিসারটি তার বন্দুক থেকে শান্তভাবে একটা ধোঁয়া ওঠা কার্তুজ বার করে ফেলে। মুমূর্ষু ট্রফিম ঘোড়ার বাচ্চাটার মাত্র দু-এক পা দূরেই পড়ে থাকে। তার চেপে থাকা নীল ঠোঁটে একগুচ্ছ রক্তফেনা জমে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলে মৃদু হাসির সাদৃশ্য।

দীর্ঘ পাঁচটি বছর এই ঠোঁটদুটি দেশে তার বাচ্চাদের চুমো খায়নি।

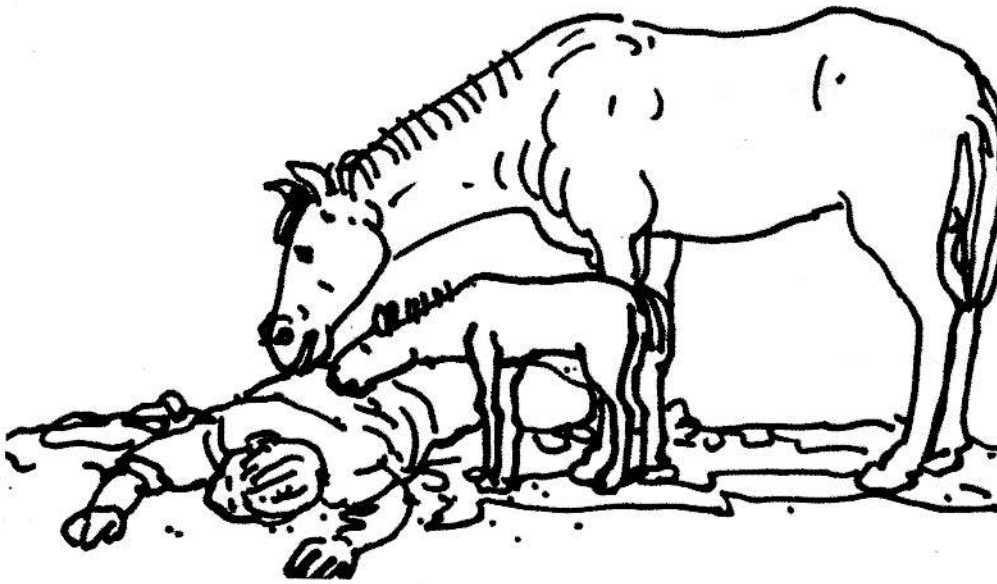

স্বপ্নরাজ্য

টমাস মুর

বর্তমানকে নিয়ে আমরা কোনোদিনই তৃপ্ত হতে পারি না। আজকের দুঃখ-কষ্ট এবং জীবনের অপূর্ণতা মনকে নিরন্তর পীড়া দেয়। যে-সময়কে দেখছি অবিচার ও বেদনায় তার রূপ কলঙ্কিত। তাই কল্পনা করি, অতীতের দিনগুলি এর চেয়ে ভালো ছিল। স্বপ্ন দেখি, ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন কারো মুখ থেকে কোনো অভিযোগ শোনা যাবে না। পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এমনি এক আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছেন সভ্যতা বিকাশের সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার ধারা এই আদর্শে পৌঁছুবার জন্য ক্রমাগত বয়ে চলেছে। অনাগত ভবিষ্যৎকালে অপরিস্ফুট আদর্শকে কেন্দ্র করে অনেক কবি-কল্পনা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া গেছে। আবার যুক্তি ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনারও অভাব নেই। গান্ধীজীর ফিনিক্স আশ্রম, টলস্টয় ফার্‌ম্ ইত্যাদি অসংখ্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র পরিসরে আদর্শ সমাজকে রূপ দেয়া। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবিরোধ আদর্শে পৌঁছুবার পথ নিয়ে, উদ্দেশ্য সকলেরই এক। সবাই বলছেন, এই পথে গেলে আদর্শ সমাজকে পাওয়া যাবে।

এই আদর্শ সমাজ গঠনের কতকগুলি পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবার আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শ হিসেবে এরা সুন্দর। অমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে বাস করবার লোভ মন উন্মুখ করে তোলে। স্যার টমাস মুর 'ইউটোপিয়া' নামক গ্রন্থে এমনি একটি রাষ্ট্রের ছবি এঁকেছেন। এ-বই এত বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল যে, বইয়ের নাম থেকে ইংরেজি ভাষায় একটি শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইউটোপিয়া এখন এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে শুধুই আদর্শ চরিত্রের নাগরিকেরা বাস করে। সেখানে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা নেই; অবিচার, অভাব ইত্যাদি নেই। সমস্যাক্লিষ্ট সমাজের বাস্তব অবস্থা কী হতে পারে তা দেখানো উদ্দেশ্য নয়, লেখক যা হওয়া উচিত মনে করেন তারই ছবি আঁকেন। এ-ছাড়া যেসব পরিকল্পনা কাল্পনিক এবং বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত—তাদেরকেও আমরা ইউটোপিয়ান বলি।

হিন্দু ইউটোপিয়ান স্বপ্ন সত্যযুগে সফল হয়েছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগ অতীত হয়ে গেছে। আমাদের কালবিবর্তন হয় ধাপে-ধাপে; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে। প্রত্যেক ধাপেই আমরা আদর্শ সমাজ বা সত্যযুগ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাই। সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছিল

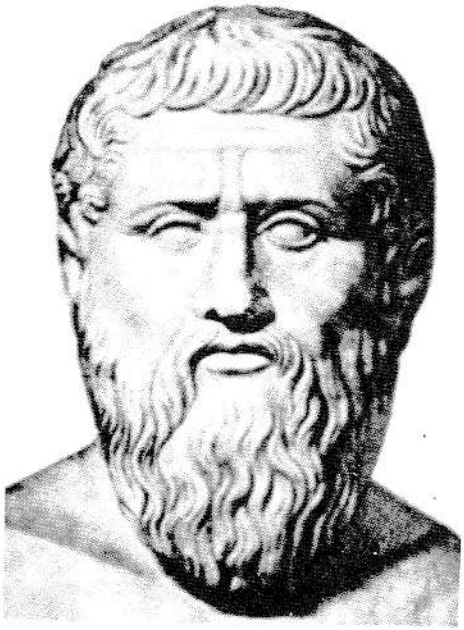

প্লেটো

বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথির রবিবারে। এ-যুগে পাপ নেই, সকলেই পুণ্যকর্মী। সত্যযুগের মানুষেরা লম্বায় একুশ হাত; ব্যাধিতে তাদের মৃত্যু হয় না; সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু। খাবার খায় সোনার থালায়। তখন সকলেই ছিল ধর্মপরায়ণ, তীর্থসেবী এবং সত্যবাদী। প্রত্যেকটি বীজ অঙ্কুরিত হতো, একটিও ব্যর্থ হত না। সকল ঋতুতে সমান শস্য পাওয়া যেত, কারো দুঃখ ছিল না, সকলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল। আজকের সমস্যাপীড়িত মানুষকে হরিবংশ আশার কথা শুনিয়েছেন। সত্যযুগ অতীতেই শেষ হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতে আবার সত্যযুগ আসবে। কলিকাল হল ঘুমিয়ে থাকা, ঘুম ভাঙলে হল দ্বাপর, বিছানা ছেড়ে উঠলে হল ত্রেতা এবং সামনে এগিয়ে চলা হল সত্যযুগ। সুতরাং এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো। চরৈবতি, চরৈবতি।

এই সত্যযুগ তো আমাদের হাতের মুঠোয়। এগিয়ে চলার মন্ত্রকে গ্রহণ করলেই পেতে পারি।

ইউরোপের আদর্শ রাষ্ট্র বা সত্যযুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাকে প্লেটো রূপ দিয়েছেন তাঁর 'রিপাবলিক'-এ। প্লেটোর রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক থাকবে। শাসকশ্রেণীতে থাকবে দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, তাদের কাজ হবে শাসনকার্য পরিচালনা করা; দ্বিতীয় বা ক্ষত্রিয়শ্রেণীর প্রধান গুণ হবে সাহসিকতা এবং এদের ওপর দায়িত্ব থাকবে দেশরক্ষার; তৃতীয় শ্রেণীতে থাকবে সাধারণ নাগরিক, যারা প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে কাজ করে যাবে। প্রথম শ্রেণীর থাকবে যুক্তিবাদী মন; সংস্কার বা ভাবাবেগ তাদের প্রভাবান্বিত করবে না। প্রত্যেক শ্রেণী নিজের কর্তব্য করে যাবে, অপরের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে যেসব নাগরিক শ্রেষ্ঠ তাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকলে প্রত্যেক নাগরিক পরোক্ষে শাসনযন্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে। প্লেটোর এই রাষ্ট্র-পরিকল্পনা পরবর্তীকালে মানুষের চিন্তাধারার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইউটোপিয়া কিংবা স্বর্ণরাজ্যের পরিকল্পনা সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার যুগে দেখা দেয়। এথেন্সের ইতিহাসের এক সংকটক্ষণে 'রিপাবলিক' লেখা হয়েছিল। অন্যান্য প্রায় সকল ইউটোপিয়া লেখা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের মধ্যে। মধ্যযুগে ইউরোপে ইউটোপিয়া রচনার সুযোগ ছিল না। কারণ তখন জীবন ছিল ধর্মের ছকে বাঁধা। চার্চের নির্দেশ ও সমর্থনের অতিরিক্ত কিছু থাকতে পারে এমন কথা কল্পনা করা ছিল পাপ। চার্চ যেভাবে জীবন ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সন্তুষ্টচিত্তে তাকে গ্রহণ করে নেয়া ছিল রীতি। মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেলে মানুষের মনে জাগল জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন। এল চিন্তার স্বাধীনতা। বর্তমান পরিবেশের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায় আর রইল না বাধা।

কাম্পানেল্লা

ফ্রান্সিস বেকন

স্যার টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' (১৫১৬ খ্রি.) এই জাতীয় স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনার মধ্যে সর্বপ্রথম। মুর তাঁর 'ইউটোপিয়া'র প্রথম-খণ্ডে তদানীন্তন ইংলন্ডের শোচনীয় সামাজিক অবস্থার ছবি এঁকেছেন। ইংলন্ডে তখন ধীরে-ধীরে শিল্পবিপ্লবের প্রথম লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। অর্থগৃধ্নু হাঙরেরা ভেসে উঠতে আরম্ভ করেছে সমাজের ওপরতলায়। দ্বিতীয়-খণ্ডে মুর তাঁর আদর্শ-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা দিয়েছেন। এখানে প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করতে হবে। কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি ছাড়া এমন কেউ থাকতে পারবে না যে বসে-বসে খাবে। প্রত্যেকে দৈনিক ছ'ঘণ্টা করে রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করবে। যুদ্ধ ও সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জনের নীতি রাষ্ট্র পালন করবে কঠোরভাবে। রাজা নির্বাচিত হবেন নাগরিকদের দ্বারা এবং রাজার জীবনযাত্রা হবে ঠিক সাধারণ লোকের মতো। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজা শাসন করবেন না; তাঁর লক্ষ্য হবে সকলের সুখ ও শান্তি। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শ্রমিক প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে মুরের মতামত আধুনিকতাপন্থী।

মুর এসব কথা লিখলেও নিজে তাকে কার্যকরি করবার চেষ্টা করেননি। তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। কিন্তু রাজরোষে পড়ে আবার প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

এরপর উল্লেখযোগ্য কাম্পানেল্লার City of the Sun বা সূর্যনগর। ১৫৬৮ সালে কাম্পানেল্লা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্পবয়সে যোগ দেন ডোমিনিকান সন্ন্যাসীদের দলে। রাজদ্রোহের মিথ্যে অভিযোগে তাঁকে দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাবাস করতে হয়েছে। কাম্পানেল্লার স্বর্ণরাজ্য একটি প্রাচীরঘেরা সুপরিকল্পিত নগর। এখানে তিনি যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছবি দিয়েছেন তা খ্রিস্টীয় আশ্রমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে।

কিন্তু প্রশাসন, সামাজিক সম্পর্ক, শিল্প নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাম্পানেল্লার মতামত চিরকালই আগ্রহের সঙ্গে পড়া হবে। এই রাষ্ট্রের নাগরিকরা সমষ্টিগতভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে;

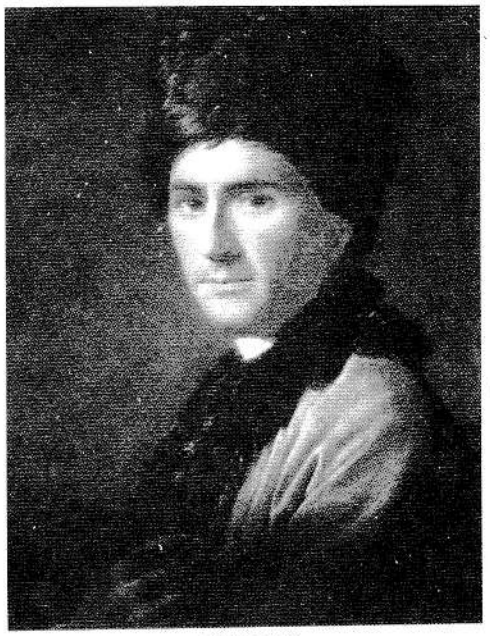

জ্যাক রুশো

কিন্তু দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে নিজেকে একা সাধনা করতে হবে সেকথা ভুললে চলবে না। বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির ওপরেই গভর্নমেন্টের ভার থাকবে। সকল কাজের মূল লক্ষ্য হবে সাম্য; সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, রাষ্ট্র কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, কায়িক পরিশ্রমের প্রতি সম্মান এবং শিল্পী ও লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা।

বেকনের Novus Atlantis (১৬২৭) কাম্পানেল্লার মতো সাম্যবাদে পূর্ণ নয়। এখানে বেকন বিজ্ঞানী সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, বিজ্ঞানের জন্য রাষ্ট্রের কী করা কর্তব্য। বেকনের পরিকল্পনায় সলোমনন্ হাউস নামে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র প্রাধান্য লাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যেসব নতুন তথ্য ও জিনিস আবিষ্কৃত হবে তারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে। বেকন কোন কোন বিষয়ে গবেষণা করতে হবে তার একটা তালিকাও প্রস্তুত করেছেন এবং ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার সম্বন্ধে এমন কতকগুলি ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, যা আজ সফল হয়েছে। বিজ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে বেকনের স্বপ্ন অনেকটা সফল হলেও তাতে মানুষের দুঃখ লাঘব হয়েছে কতটুকু?

স্বর্ণরাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রুশোর Social Contract (১৭৬২) বা সামাজিক চুক্তি। রুশো পূর্ববর্তীদের ইউটোপিয়ার অনুসরণে অচেনা দ্বীপ, সূর্যনগর কিংবা সুদূর অ্যাটলান্টিসের মতো কোনো জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতবাদ নিছক কল্পনা নয়, বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। পাঠকের মনে হবে তাঁরও এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। রুশোর মতবাদের পেছনে একটা যুক্তির কাঠামো অনুভব করা যায় বলে শ্রদ্ধা জাগে। রুশো বলছেন : পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে আমরা জন্মেছি। প্রকৃতির কাছ থেকে যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তাতে আমাদের স্বাভাবিক অধিকার। নিজেদের সুবিধার জন্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে আমরা সমাজ গড়েছি। এই সমাজ বা রাষ্ট্রের ওপরে বসিয়েছি রাজাকে, তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেছি সু-শাসনের। কু-শাসন হলে রাজাকে পদচ্যুত করবার অধিকার রয়েছে জনসাধারণের। ক্ষমতা আমাদের, রাজার নয়। মানুষ পৃথিবীতে আসবার পরে এমনি আদর্শ-রাষ্ট্র ছিল, যেখানকার নাগরিকরা প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। সেই স্বাধীনতা এখন সকলের হাত থেকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে গেছে বলেই এত দুঃখ। আমরাই বে-দখলকারীদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারি। আমাদের প্রচেষ্টার পেছনে থাকবে নৈতিক অধিকারের জোর।

রুশোর এই মতবাদ ইউরোপের বহু দেশে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁর নিজের দেশে সাহায্য করেছিল বিপ্লবকে দ্রুততর করতে।

আলোকিত মানুষ চাই

বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার

গ্রামীণফোন

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841803 10X507